রাজকীয় প্রেমকথা

চিত্রা দেব

সান্যাল প্রকাশন ।। কলিকাতা-৯

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬৩।

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

তোমাকে

লেখিকার অন্যান্য বই

আবরণে আভরণে ভারতীয় নারী

রূপমতীর মালা

অন্তঃপুরের আত্মকথা

আপন খেয়ালে চলেন রাজা

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল

বিবাহ-বাসরের কাব্যকথা

মহিলা ডাক্তার ঃ ভিন গ্রহের বাসিন্দা

ইতিহাসের সাল তারিখ কণ্টকিত ঘটনার মধ্যে প্রেমের স্থান একেবারেই নেই অথচ ইতিহাসের কয়েকটি চরিত্র তাঁদের প্রণয় কাহিনীর জন্য কিংবদন্তির নায়ক বা নায়িকা হয়ে উঠেছেন। কেউ অতি পরিচিত আবার কেউ স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে ইতিহাসকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে, গল্প থেমে থাকেনি। ইতিহাসের পাতা থেকে রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সতেরোটি কাহিনী প্রথম পর্যায়ে শোনাচ্ছি। সময় দিয়ে প্রেমকথাকে ধরা যায় না বলে কয়েকটি অতি পরিচিতের সঙ্গে কয়েকটি প্রায় অপরিচিত গল্প এই খণ্ডে পরিবেশন করা হল।

গল্পের সন্ধানে অনেকের সাহায্য পেয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের হিন্দি বিভাগের কথা প্রথমেই উল্লেখ করছি। বই দিয়ে সাহায্য করেছেন, আবদুর রউফ, কমলেন্দু সরকার, বিনয়ভূষণ রায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য, মীরা ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

চিত্রা দেব

সূচিপত্র

ইন্দ্রজিৎ সিংহ ও প্রবীণ রায়

বুন্দেলখণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই কবে। ইতিহাসের পাতায় ওরছা নরেশ ইন্দ্রজিৎ সিংহকে খুঁজে পাওয়াই কষ্টকর। প্রবীণ রায়ের তো কথাই নেই। কিন্তু ওরছার মানুষ কি তাঁকে ভুলেছে? তিনি বেঁচে আছেন লোকশ্রুতিতে, রাই পরবিন মহলের ঝরোকার আলোছায়ার আড়ালে, সমসাময়িক কবি কেশবদাসের রচনায়।

বিন্ধ্য পর্বতের ঘন অরণ্য ঘেরা বুন্দেলারাজ্যের রাজধানী ওরছা। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী বেতোয়া নদী। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ওরছা বিশিষ্টতা অর্জন করতে শুরু করেছে। যদিও সামন্তরাজাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস সঠিক পাওয়া যায় না তবু মধুকর শাহ এসময়ে ওরছাকে গড়ছিলেন তার পাথুরে প্রমাণ ছড়ানো আছে। বিশাল রাজমহল, রামমন্দির, ছত্রি—অনেক কিছুই তৈরি করেছিলেন তিনি। বুন্দেলা চিত্রকলায় সাজাতে শুরু করেছিলেন রাজমহল। নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র, কাব্য ওরছাধিপতির আশ্রয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট আকবর। একের পর এক বুন্দেলা দুর্গের পতন হচ্ছে তাঁর হাতে। এমনই একটা সময়।

মধুকর শাহের আট পুত্র, দুজনের নাম জানি। দ্বিতীয় পুত্র বীর সিংহ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছেন জাহাঙ্গীরের বন্ধু হিসেবে, ওরছার শ্রেষ্ঠ রাজা তিনি। আর মধুকর শাহের চতুর্থ পুত্র ইন্দ্রজিৎ সিংহ ওরছাবাসীর হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন চিরকালের মতো। সুপুরুষ, সুধীর স্বভাব, কাব্যানুরাগী, সঙ্গীতপ্রিয়, শিল্পমনস্ক। মধুকর শাহের পরে সিংহাসনে বসেন ইন্দ্রজিৎ, কেন? কি বৃত্তান্ত? সে খোঁজে কি কাজ বলে পাশ কাটানো ছাড়া গতি নেই। হয়ত তিনি শুধু রাজপুত্রই ছিলেন। সেই দিনটিতে ফিরে যাই। যেদিন ওরছার কথা ভেবেই ইন্দ্রজিৎ ছুটে এলেন কেশবদাসের বাড়িতে। কেশবদাস বয়সে তাঁর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ। কখন যে ইন্দ্রজিৎ সেই নির্লোভ মানুষটিকে সখা থেকে গুরুর আসনে বসিয়ে ফেলেছেন, নিজেও জানেন না। শুধু জানেন কেশবদাসকে ছাড়া তাঁর চলে না। রঙিন মনের মানুষ তিনি। রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি পাবার জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে কেশবদাসের সান্নিধ্যে এসে। তাছাড়া কেশবদাসকে ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করার ইচ্ছেও ছিল। নিজেই এসে দাঁড়ালেন কেশবদাসের দরজায়।

পরিপাটি করে সাজানো না হলেও বাড়িটি ছবির মতো সুন্দর। বেতোয়া নদীর তীরে ছিমছাম ছায়াচ্ছন্ন শান্তির নীড়। বিদ্যাচর্চা, কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চার জন্য তাঁর ঘরের

দ্বার সবার জন্য খোলা। শিষ্যরা আসে, আসে গায়িকারা। ছোট উদ্যান পেরিয়ে ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়ান কেশবদাসের ঘরে। কেশব বলে ডাকতে গিয়েই প্রবল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। কেশবদাসের শূন্য আসনের সামনে নতজানু এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। ইন্দ্রজিতের আকস্মিক আবির্ভাবে সেও চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার মৃণাল বাহু ও পদ্মকোরকের মতো অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি কেঁপে ওঠায় আসনের সামনে ছড়িয়ে পড়ে একরাশ ফুল। অপলক কয়েকটি মুহূর্ত। আর পরক্ষণেই দ্রুত হাতে ঘোমটা টেনে মেয়েটির চকিত অন্তর্ধান এক আশ্চর্য মায়ামোহ রচনা করল ইন্দ্রজিতের মনে। কী দেখলেন তিনি? তার নিবিড় কালো চোখে গহন রহস্যের ছায়া? না, কৃষ্ণ কুটিল সাপের মতো দীর্ঘ বেণী কিংবা তার অনুপম দেহসৌন্দর্যের কমনীয় লাবণ্য? কিছুই ইন্দ্রজিতের মনে পড়বে না। স্বপ্নই ভাবতেন যদি না ঘরে ছড়িয়ে থাকত তার অঙ্গের সুরভি আর এক আঁজলা শুভ্র সুগন্ধী ফুল।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে যে কে জানে, হয়ত বেশিক্ষণ নয়। কেশবদাস ফিরেছেন বেতোয়ার তীর থেকে, স্নান সেরে। ইন্দ্ররজিৎকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আজ আমার পরম সৌভাগ্য রাজার চরণধূলি পড়ল দীনের কুটিরে।'

'কেশব', আহত স্বরে বললেন ইন্দ্রজিৎ, 'তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?'

কেশবদাস তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তা করলামই বা। রাজা হয়েছ বলে কি এত দূরের মানুষ হয়ে গিয়েছ যে ঠাট্টাটুকুও করা যাবে না।'

'আমি তোমার কাছে একটি বিশেষ কাজে এসেছি।'

'কি কাজ?'

কাজের কথা বলার আগে ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'তোমার এই ঘরে এক অপরূপ রূপসী নারী এসেছিলেন। কে তিনি?'

কেশবদাস হেসে বললেন, 'এই তোমার বিশেষ কথা?'

'না। কিন্তু বল না কাকে দেখেছি আমি?'

'তুমি ভুল দেখেছ।'

'না ভুল নয়। ওই দেখ তাঁর হাত থেকে ছড়িয়ে পড়া ফুলগুলো এখনও পড়ে আছে।'

কেশবদাস দেখলেন। বুঝলেন কিন্তু কিছু বললেন না। উদাসীন হয়ে বললেন, 'হয়ত কোন কবিযশঃপ্রার্থিনী কিংবা গায়িকা।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও ইন্দ্রজিৎ আর সে প্রসঙ্গ না তুলে বললেন, 'কেশব, তোমাকে আমার মন্ত্রী হতে হবে।'

'ওই কাজটি আমার দ্বারা হবে না। তুমি তো জান আমি শুধু কবি।'

'সেইসঙ্গে বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানও। সেইজন্যই তোমাকে আমার পাশে চাই।'

'সে তো আছিই। তবে মন্ত্রণা দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর বুদ্ধির কথা বলছ, সত্যি যদি চালাক-চতুর হতাম তাহলে কি বলতাম বল তো?'

'কি বলতে?'

'মহারাজ, আপনি আজ যাকে দীনের কুটিরে দেখেছেন, তাকে পাঠিয়ে দেব

আপনার শিসমহলের সান্ধ্য আসরে।' কেশবদাস স্তাবকের মতো নকল করে বলেন।

ইন্দ্রজিৎ মনে মনে অত্যন্ত আহত হন। তিনি রাজা, কামুক নন। কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হয়নি, তাবলে কেশবদাস তাঁকে এত বিঁধলেন, বললেন, 'আমি ভদ্রভাবে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম কেন না, অনেক রূপসী আমি দেখেছি কিন্তু এমন দেবীপ্রতিমার মতো মহিয়সী আগে কখনও দেখিনি তাই।'

কেশবদাস বুঝলেন, ইন্দ্রজিতের অভিমান। হেসে বললেন, 'দেখছ তো মন্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার নেই।'

'ও কথা বল না। তুমি আমার গুরু, পরামর্শদাতা সব কিছু। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার পরামর্শ যেন পাই।'

'আমি যতদিন বাঁচব।' মৃদু হেসে বললেন কেশবদাস, 'প্রয়োজনে নিশ্চয় পরামর্শ দেব। আপাতত আমার পরামর্শ এই, আজ যাকে আমার কুটিরে দেখেছ, তাকে একবার দেখ তোমার রঙমহলের ইন্দ্রসভায়। তারপর মন দিয়ে রাজকার্য কর।'

'তার মানে?'

'রাজাকে নারীবিলাসী করে তোলা মন্ত্রীর কাজ নয়। তাই সুপরামর্শ দিচ্ছি। তুমি যাকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ, সে এক কাঞ্চনীপুত্রী, কোন দুর্লভা পুরস্ত্রী নন।'

'কাঞ্চনীপুত্রী?' বিস্ময় ঝরে পড়ে ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। কিন্তু সামান্যা নয়, গুণী শিল্পী। তার গুণের সঙ্গে পরিচয় হোক আর আংশিক দর্শনের মোহও দূর হোক।' মৃদু হেসে বললেন কেশবদাস।

ইন্দ্রজিৎ তবু বিস্ময়াহত, 'কাঞ্চনীপুত্রী? কিন্তু তাকে দেখে তো সামান্যা গায়িকা বা নর্তকীকুলের মেয়ে বলে মনে হল না। সে যে নন্দনবনের পারিজাত।'

কেশবদাসের মুখে সামান্য মেঘের ছায়া দেখা দিল। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি তো জানতাম আমিই কবি কিন্তু সাবিত্রীকে দেখে তুমিও কবি হয়ে উঠলে? কাঞ্চনীপুত্রী হলেও সাবিত্রী নিজেও কবি। আমার কাছে আসে কাব্যচর্চার জন্য।'

'তোমার শিষ্যা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তাকে আমার রঙমহলে পাঠাতে চাইছ কেন?'

'তুমিই তার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছ।'

'কোথায় থাকে সে?'

'ব্যাসপুরা মহল্লায়।'

কৌতূহল মরে আসে। হতাশ হন ইন্দ্রজিৎ। ব্যাসপুরায় পেশাদার নর্তকী ও গায়িকারা বাস করে। উঁচুদরের নৃত্য-গীত তাদের কাছে আশা করা যায় না। তাঁর রঙমহল ইন্দ্রসভাকেও লজ্জা দেয়। সেখানকার সেরা নর্তকীদের পাশে নিশ্চয় কেশবদাসের শিষ্যা ম্লান হয়ে যাবে তার চেয়ে বরং থাক। সেই অনিন্দ্যসুন্দরী থাকুক ইন্দ্রজিতের স্বপ্নে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও তো কম নয়। বললেন, 'পরে শুনব একদিন তার কবিতা।'

কেশবদাস বললেন, 'সাবিত্রী শুধু কবি নয়, অসাধারণ শিল্পী। ব্যাসপুরার বাসিন্দা শুনে তাকে সামান্য মেয়ে ভেবো না। ওর মা-দিদিমা গোয়ালিয়র ঘরানার নামী শিল্পী, এও জানি, এখানে তারা নতুন এসেছে।'

সঙ্গীতবিলাসী রাজা আবার উৎসাহ ফিরে পেলেন। বললেন, 'বেশ, আমার হয়ে তাকে বোলো, আমার রঙমহলে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আদেশ নয়, আমন্ত্রণ। স্বেচ্ছায় যদি আসে তবেই।'

কেশবদাস হেসে ফেলেন, 'কবিত্রীকে দেখে তুমিও কবি হয়ে উঠছ দেখছি।'

ইন্দ্রজিতের মন লঘু মেঘের মতো হয়ে উঠল, 'অভয় দাও তো বলি, আমি তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছি কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমিও তার গুণমুগ্ধ ভক্ত।'

কেশবদাস মনে মনে বিব্রত হলেন কি না বোঝার চেষ্টা না করেই উঠে পড়লেন রাজা, ফিরে গেলেন রাজমহলে। এখন শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। কবে আসবে সেই বরবর্ণিনী অপরূপা কবিত্রী তাঁকে তার কবিতা শোনাতে। সে আসবে, সে আসবেই। নিজের মনে তার বার্তা শুনতে পান ইন্দ্রজিৎ। এমন করে আর কাউকে কখনও তিনি কামনা করেননি। এরই নাম কি প্রেম?

সেই সন্ধ্যাতেই কেশবদাস সাবিত্রীকে জানালেন ইন্দ্রজিতের কথা। রাজা তাঁর কবিতা শুনতে চেয়েছেন শুনে এক অসহ্য আবেগে উছলে উঠল তাঁর বুক। সকালে ক্ষণিকের জন্য দেখা সেই বিস্ময়াপ্লুত যুবককে মনে পড়ে তাঁর। তিনি রাজা? তিনি শুনবেন সাবিত্রীর গান? সঙ্গীতানুরাগী হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। পারবে তো সাবিত্রী তাঁর মন জয় করতে? মনের কথা মুখে ছায়া ফেলল না। স্মিত মুখে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'তাই হবে গুরুদেব। কিন্তু ইন্দ্রসভার উর্বশীদের মাঝখানে আমি কি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব?'

'ইন্দ্রসভার কোন শিল্পীই তোমার মতো দক্ষ নয়। ইন্দ্রজিৎ নিজেও হিরে ও কাচের তফাত বোঝে। তবে তোমার নিজের ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা তোমার আছে। রঙমহলে তুমি আমন্ত্রিত। যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা।'

'আমি যাব।'

ইন্দ্রজিৎ সিংহের রঙমহল ইন্দ্রসভাকেও হার মানায়। মধুকর শাহের সময় থেকেই অপরূপা নর্তকীরা ওরছার নৃত্যশালাকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। ইন্দ্রজিতের নৃত্যসভায় সেরা নর্তকীর শিরোপা পেয়েছে রঙ্গ রায়, তারপরে এসেছে নবরঙ্গ রায়। নাম দুটি তাদের নাম নয়, রাজদত্ত উপাধি। এমনই আরও দুটি উপাধি তানতরঙ্গ ও বিচিত্রনয়না। আরও কত ঈপ্সিতা নারীর ভিড় সেখানে। কেশবদাসের পাঠানো খবর পেয়ে সেদিন রাজা রঙমহল সাজাবার আদেশ দিলেন। রঙ্গ রায় ও নবরঙ্গ রায় জানতে চাইলেন রাজার মনের কথা। কী দেখবেন তিনি? কী শুনবেন তিনি? কোন রাগিণী ধরবেন তানতরঙ্গ, বীণায় কোন সুর তুলবেন বিচিত্রনয়না? রাজা কিছুই বললেন না। শামাদানের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'আজ আমার রঙমহলে একজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

রূপসীদের বিলোল কটাক্ষে বিস্ময় ঝরে পড়ল। নতুন কারও আগমন সংবাদ তারা তো পায়নি। প্রশ্ন গুমরে উঠল, 'আদেশ নয়, আমন্ত্রণ?'

'হ্যাঁ। আমার আমন্ত্রণেই তিনি আসবেন তাঁর কবিতা শোনাতে।'

প্রতীক্ষার রজনী গভীর হয়। শামাদানের বাতির শিখা ম্লান হয়ে এলে অপরূপ সুন্দর দুটি পা স্পর্শ করল রঙমহলের নরম গালিচা। শুভ্র পোশাক, দীর্ঘ অবগুণ্ঠন, মৃণাল বাহু তুলে সামান্য নত হয়ে অভিবাদন জানায় সেই কেশবদাসের কুটিরে দেখা তরুণী। রাজার বুকে অনেকখানি উচ্ছ্বাস উথলে উঠতে চায়। ধীরভাবে অভিবাদন গ্রহণ করে বলেন, 'শুনেছি আপনি স্বয়ং কবিতা রচনা করেন। অনুগ্রহ করে আমাদের কবিতা শোনাবেন কি?'

সাবিত্রী বসলেন ইন্দ্রজিতের সামনে। হালকা অবগুণ্ঠনের আড়াল আবছা করে রাখল তাঁকে। তারপর শোনালেন তাঁর কবিতা, অশ্রুতপূর্ব সুমধুর কণ্ঠে। সেই কবিতায় সুরারোপ করে বীণাসহযোগে শোনালেন গান, শেষে সেই আবেদন ফুটিয়ে তুললেন নৃত্যভঙ্গিমায়। শুধু ইন্দ্রজিৎ কেন, যাঁরা সেখানে ছিলেন—রাজসুহৃদ, সভাসদ, নর্তকী, গায়িকা, বাদ্যকর সকলেরই মনে হল, এমন নাচ আগে তাঁরা দেখেননি, এমন গান আগে তাঁরা শোনেননি। সাবিত্রীর বেশভূষা মহার্ঘ নয়। শুভ্র চান্দেরি মসলিনের লহরে অস্পষ্ট তাঁর মুখ কিন্তু অতি কোমল পা দুটি যেন ভূমি স্পর্শ না করেই হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। নাচ যখন থামল, শেষ রাতের আকাশে তখন উজ্জ্বল শুকতারা, রাজা দেখলেন ঘোমটা খোলা সাবিত্রীর চোখদুটিতেও সেই তারার আলো।

মুগ্ধতার ঘোর কাটলে অভিভূত কণ্ঠে ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'অপূর্ব। আজ থেকে তোমার নাম হল প্রবীণ রায়। সর্বকলায় তুমি পারঙ্গম। আমার সভায় তোমার তুল্য শিল্পী কেউ নেই তুমি যা চাও তাই দেব। তুমি রাজনর্তকীর পদটি গ্রহণ কর।'

সাবিত্রী আবার তাঁকে প্রণাম করলেন। সেদিন থেকে মুছে গেল তাঁর আপন পরিচয়। বললেন, 'আপনার সন্তুষ্টিই আমার পুরস্কার। আর কিছু চাই না। যদি অনুমতি দেন আমি ফিরে যাই। দাসীকে রঙমহলের প্রমোদকাননে বাস করতে বলবেন না প্রভু।'

ইন্দ্রজিৎ চমৎকৃত হলেন। রাজবৈভব, বিলাসিতায় লোভ নেই যার, সে কেমন মেয়ে? আবার মনে হল, নির্লোভ বলেই এমন শিল্পী ওরছার প্রাঙ্গণে, বাদশাহের নৃত্যসভাতেও এ বেমানান নয়। বললেন, 'তোমার যা অভিরুচি। প্রতিদিন যেন তোমার দেখা পাই।'

'আপনি আদেশ করলেই আমি উপস্থিত হব।'

ইন্দ্রজিৎ বুঝলেন, কেশবদাসের শিষ্যা সত্যিই অসামান্যা কিন্তু তিনি মোহমুক্ত হতে পারবেন কি? কামনা-বাসনার পাকে পাকে পিষ্ট হচ্ছেন না ঠিকই, নবজাগ্রত প্রেম ক্রমেই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এই মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই চাই। কি করবেন তিনি? কিচ্ছু জানেন না, রাজার হৃদয় উজাড় করে দিয়ে শুধু ভিখারি হবেন!

পরদিন। কেশবদাস শুনলেন প্রবীণ রায়ের কথা। প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি রাজনর্তকীর পদ গ্রহণ করেছ সাবিত্রী?'

'তিনি আমায় নতুন নাম দিয়েছেন গুরুদেব। প্রবীণ রায়। জানি না আমি তার যোগ্য কি না।'

'অবশ্যই যোগ্য। তোমার মতো নারীর জীবনে এই তো কাঙ্ক্ষিত সম্মান।' কিছু শুষ্ক শোনাল কি তাঁর স্বর, 'কিন্তু...কিন্তু...তুমি শুধু কবিত্রী হিসাবে পরিচিত হলেই বোধহয় ভালো হত। কালোত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল তোমার কবিতায়।'

মৃদু হাসলেন প্রবীণ রায়। রাজার মতো এক অজানা পুলকে তাঁর হৃদয়ও শিহরিত। বললেন, 'কবিতাই আমি লিখব। প্রবীণ রায় হয়ে। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'রঙমহলে থেকে কবিতা লেখা যায় না।'

'আমি ব্যাসপুরাতেই থাকব। সে কথাই বলে এসেছি। কিন্তু যেখানেই থাকি তাঁর দাসী হয়েই থাকব। আজ থেকে আমি আর সাবিত্রী নই, আমি প্রবীণ রায়।'

কেশবদাসের মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। শুধু বললেন, 'সেই ভালো।'

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রত্যহ প্রবীণ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। কবিতা শুনতে শুনতে রাত্রি গভীর হয়। তবু প্রবীণ রায় চোখের আড়াল হলেই রাজা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি রাজা, ব্যাসপুরা মহল্লায় তো ছুটে আসতে পারেন না, রঙমহলে স্বেচ্ছাবন্দি হতে চাননি প্রবীণ রায় নিজেই। ধরা দিয়েও অধরা থেকে গিয়েছেন তিনি। ইন্দ্রজিৎ বোঝেন প্রবীণ রায়কে না পেলে তাঁর জীবন ভরবে না। এক সন্ধ্যায় বলেন, 'প্রিয়ে, অনুমতি দাও তো মনের কথা বলি।'

'আদেশ করুন প্রভু।'

'তোমাকে আদেশ করা যায় না, সে কথা তুমি জানো। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই প্রবীণ, ওরছার পাটরানির আসনও তোমার যোগ্য নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় সম্মান দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।'

ঝাড়লণ্ঠনের হাজার বাতি কি হঠাৎ চমকে উঠল? নাকি প্রবীণ রায় নিজে? শিউরে উঠলেন তিনি। ভয়ে না আনন্দে? যে সুখ-সৌভাগ্যের স্বপ্ন কাঞ্চনপুত্রীরা দেখার সাহস পায় না, সেই প্রস্তাব তিনি স্বকর্ণে শুনছেন। শোনাচ্ছেন তাঁরই প্রিয়তম। সমস্ত কথা হারিয়ে যায়।

রাজা বলেন, 'বল প্রবীণ, চুপ করে থেকো না।'

তবু প্রবীণ রায় চুপ করেই থাকেন। তারপর অনেক অশ্রুর সমুদ্র পেরিয়ে বললেন, 'তা হবার নয় প্রভু।'

রাজা চমকে উঠলেন, 'আমি কি তোমার যোগ্য নই প্রবীণ?'

'আমিই আপনার যোগ্য নই প্রিয়তম। আমি সামান্যা কাঞ্চনীপুত্রী। কাঞ্চনমূল্যে আমার মতো নারীকে কেনা যায়। বিয়ে করা যায় না। লোকে আপনারই নিন্দে করবে।

'অব মারি তুন কহঁ দেহি/হম কহি কহা দুলহরাম জু।
কহ্ বাপ প্রিয় পরদার সুনিয়ত/করি বহহু কুনাম জু।
কো গণে কিতনে পুরুষ কিনহে/কহত সব সংসার জু।
সুনি কুঁওর চিত হ্যায় বরণি/তাকো কহিয়ে সব ব্যবহার জু।।'

ইন্দ্রজিৎ সিংহ অবাক হয়ে যান। তাঁর কলঙ্ক রটবে বলে প্রবীণ রায় রানির সম্মান চান না, নর্মসহচরী হয়েই কাটাতে চান? অথচ তিনি তো জানেন, কাঞ্চনীপুত্রী হলেও বহুপুরুষগামিনী হওয়া দূরে থাকুক, প্রবীণ রায় গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র।

...পাবন প্রকট দুতী দ্বিজন কে দেখিয়ত।
দীপত দীপতি অতি শ্রুতি সুখদায়ী হ্যায়।
শোভা শুভসামী পরমারথ নিধানী দীহ—
কলুষ কৃপানি মানি সব জগ জানি হ্যায়।
পুরব কে পুরে পুণ্য শুনিয়ে প্রবীণ রায়
তেরি বাণী মেরি রানি গঙ্গা কি সোঁ পানি হ্যায়।

ইন্দ্রজিৎ সিংহের লেখা কবিতা নয় কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের চারণকবিরা ওরছার আকাশ-বাতাস ভরে দিয়েছিলেন প্রবীণ রায়ের প্রশস্তিতে। কলুষনাশিনী পবিত্র গঙ্গার সঙ্গে প্রবীণের তুলনা করে লেখা এই গানটি হয়ত আরও পরে লেখা। যেমন প্রবীণ রায়ের নিজের পদে রাজাকে 'কুমার' সম্বোধন দেখে মনে হতেই পারে, ইন্দ্রজিৎ আসলে রাজকুমারই ছিলেন, ইতিহাসে সেজন্য তাঁকে খুঁজে পাই না। কিন্তু কেশবদাসের 'কবিপ্রিয়া'য় তিনি রাজা। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে প্রবীণ রায়ের জীবন অবলম্বনে উপন্যাস লিখতে গিয়েও ইকবাল বাহাদুর দেবসার ইন্দ্রজিৎকে রাজা বলেছেন। মধুকর শাহ ও বীরসিংহের মধ্যবর্তী কয়েক বছরের জন্য রাজা হয়েছিলেন।

প্রবীণ রায়ের প্রশস্তি গঙ্গার সঙ্গে তুলনাতেই শেষ নয়। কেউ তাঁকে বললেন লক্ষ্মী, কেউ বললেন পার্বতী, আবার কেউ সরাসরি তাঁকে বলে বসলেন সরস্বতী। হয়ত একই কবিতার খণ্ড খণ্ড রূপ পাচ্ছি আজও, ছত্তিশগড়ী ভাষায় :

...বৃষভবাহিনী অঙ্গ উর বাসুকি নাসত নবীন।
শিব সঙ্গ সোহে সর্বদা শিওয়া কি রায় প্রবীণ।।
...রত্নাকর লালিত সদা পরমানন্দহি লীন।
অমল কমল কমনীয় কর রমা কি রায় প্রবীণ।।
...রায় প্রবীণ কি শারদা শুচি রুচি রঞ্জিত অঙ্গ।
বীণা পুস্তকধারিণী, রাজহংস সুত সঙ্গ।।

এভাবেই প্রবীণ-প্রশস্তি খণ্ড খণ্ড হয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু এক বারাঙ্গনাকে ওরছার মানুষ দেবীদের সঙ্গে তুলনা করলেন কেন? রূপসী গুণবতীর ভিড় তো কম ছিল না। সমাজও ছিল না অন্যরকম। হলে প্রবীণ রায় রানির পদটি সসম্মানে ফিরিয়ে দিতেন না। কি হল কে জানে শুধু ওরছার আকাশ ছুঁয়ে প্রবীণ রায়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরে-দূরান্তরে। শুনতে পেলেন দিল্লির মসনদে বসে শাহানশাহ আকবরও। বুন্দেলখণ্ডকে তিনি আগেই জয় করেছেন। মধুকর শাহের সঙ্গেও তাঁর বিবাদের কথা শোনা গিয়েছে। ওরছা অবশ্য পুরোপুরি পদানত বা করদ রাজ্যে পরিণত হয়নি। প্রবীণ রায়ের প্রশস্তি শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনিও। এমন একটি রত্নকে হস্তগত করতে কার না অভিলাষ হয়? তাঁরও হল। বাদশাহী কেতা অনুযায়ী তিনি ইচ্ছা প্রকাশ্ করলেন, প্রবীণ রায়কে তিনি আপন সম্পত্তি হিসাবে দেখতে চান। বলে রাখা ভালো, বাদশাহের ইচ্ছার মর্যাদা রাজা-উজির সকলেই দিতেন। তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁরা নিজের বাগানের ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতেন শাহী রঙমহল। সেটাই দস্তুর।

বিশেষ করে বাদশাহের নজর যদি পড়ে কোন নর্তকী বা গায়িকার প্রতি। যথানিয়মে ওরছায় খবরটি পৌঁছল।

চমকে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ সিংহ। তাঁর প্রিয়তমাকে কামনা করছেন বাদশাহ। সুহৃদ কেশবদাসকে বললেন, 'বন্ধু, এই বিপদের মধ্যে তোমার পরামর্শই সবচেয়ে মূল্যবান। প্রবীণ রায় যে শুধু নর্তকী নয়, সে কথা তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

জনরব কেশবদাসও শুনেছিলেন কিন্তু রাজাকে কীভাবে রক্ষা করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। প্রবীণ রায় যদি রানি হত আর তাকে বাদশাহ কামনা করতেন তাহলে কর্তব্য ঠিক করা কঠিন হত না। সে হত জাতির অপমান। কাঞ্চনমূল্যে যাদের কেনা যায় তাদের জন্য সকলের স্বার্থ উপেক্ষা করে বাদশাহের ক্রোধের কারণ হওয়া কি উচিত? আবার ইন্দ্রজিৎ যে কিছুতেই প্রবীণকে বাদশাহের হাতে তুলে দেবেন না তাও তাঁর অজানা নয়। দিলে তিনিই কি দেখবেন বন্ধুর মুখ? তিনি শুধু বললেন, 'ঘটনাটি এখনও জনশ্রুতির আকারেই রয়েছে। আমরাও বরং মহেশদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করি।'

মহেশদাস হচ্ছেন আকবরের পরম সুহৃদ তথা মন্ত্রী বীরবল। তিনি বুন্দেলখণ্ডেরই সন্তান। সম্প্রতি আকবর তাঁকে উপহার দিয়েছেন কালিঞ্জর দুর্গ। সেও ওরছার কাছেই। তিনি নিশ্চয় সাহায্য করতে পারেন। বীরবল সব শুনলেন মন দিয়ে। আকবরের একগুঁয়ে মনোভাবের কথা তিনি জানেন। রূপের চেয়েও গুণ তাঁকে টানে। প্রবীণ রায়ের কবিখ্যাতি, নৃত্যগীত-কুশলতা তাঁকে যদি টেনে থাকে তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন। সত্যিই বিপদ। কেশবদাসকে বললেন, 'আমি আপনাদের আগেই খবর পাঠাব। আপাতত তাঁর ওরছা আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করব। কিন্তু প্রবীণ রায়ের খ্যাতির কারণ কি?'

কেশবদাস বললেন, 'প্রবীণ রায় অসামান্য শিল্পী তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, সে কবি। সত্যিকারের কবি।'

বীরবর বললেন, 'তাহলে চিন্তা নেই। তিনি যদি প্রকৃত কবি হন তাহলে নিজেকে রক্ষা করবার উপায় তিনি নিজেই খুঁজে নেবেন। আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। বরং আপনারা ওরছার কথা চিন্তা করুন।'

ফিরে এলেন কেশবদাস। রাজাকে জানালেন সব কথা। রাজার চিন্তান্বিত মুখের রেখা একটুও বদলায় না। শূন্য দৃষ্টিতে বারে বারে তাকান প্রায় শেষ হয়ে আসা নতুন ভবনটির দিকে। প্রবীণ রায় রাজি হননি রঙমহলের নর্তকী হিসাবে পরিচিত হতে, তাই রঙ্গ রায়, নবরঙ্গ রায়দের সঙ্গে না থেকে রয়ে গিয়েছেন পুরনো ব্যাসপুরায়। যেদিন তিনি রানির পদটিও অস্বীকার করলেন, সেদিন থেকেই ইন্দ্রজিৎ নির্মাণ শুরু করেছেন নতুন ভবনটি, প্রবীণের জন্যই বিশেষভাবে গড়ছেন তিনি। তার সংলগ্ন আনন্দমহল। প্রবীণ ঠিকই করেছেন। রঙমহল তাঁর উপযুক্ত নয়। আনন্দমহলে তিনি শোনাবেন তাঁর কবিতা। তিনি রাজার আনন্দসঙ্গিনী। সেই মহলে কি পা রাখতে পারবেন প্রবীণ রায়?

রাজার জীবিতকালে? না, তিনি বেঁচে থাকতে প্রবীণকে ছাড়বেন না, তাঁর মৃত্যুর পরে যা হয় হোক।

আকারে ইঙ্গিতে যখন ওরছার দিক থেকে কোন উপহার এল না তখন সরাসরি শাহী ফরমান এল, ওরছার রাজনর্তকী প্রবীণ রায়কে পাঠানো হোক দিল্লির রঙমহলে, খোদ বাদশাহের দরবারে। হুকুম অমান্য করলে ওরছাকে জরিমানা দিতে হবে এক কোটি টাকা। বীরবল যথারীতি গোপনে খবর পাঠালেন। সাধ্যমত চেষ্টা করলেন বাদশাহের আদেশকে বিলম্বিত করবার কিন্তু বিপদকে ঠেকাতে পারলেন না।

এতদিন রাজা প্রবীণ রায়কে কিছুই জানাননি। প্রবীণ এখনও ব্যাসপুরায় থাকেন। রাজার নবনির্মিত ভবনে তিনি কবে আসবেন কে জানে? ব্যাসপুরায় প্রতিদিন তিনি দেখতে পান মানব-জীবনের দুঃখ-কষ্ট, লোভ-মোহ, ত্যাগ-উদারতার অসংখ্য ছবি। বিরহ-মিলনের সঙ্গে কামনা-বাসনার যোগ, ভালোবাসার সঙ্গে পবিত্রতার অদৃশ্য বন্ধন, মুক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রণয়, বেদনার জমাট অশ্রু—রাজমহলের জীবনে এই বৈচিত্র্য কোথায়?

প্রতিদিনের সন্ধ্যার মতো নয় এই সন্ধ্যাটি। রাজা ধীরে ধীরে শোনালেন আসন্ন বিপদের চরম সংবাদ। স্তব্ধ হয়ে বসে প্রবীণ সবই শুনলেন। বিদুষী কবি তিনি। জনরব যে তাঁর কানে আগে পৌঁছয়নি তা তো নয়। হয়তো ভাবতে লাগলেন, এতদিন তাঁর প্রিয়তম কথাটি তাঁকে বলেননি কেন? প্রবীণ রায়কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে রাজা কাতর হয়ে বললেন, 'সর্বস্ব দিয়েও আমি তোমায় ধরে রাখতে চাই। কিন্তু...' বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ প্রবীণের মনের তল খুঁজে পেতে চাইলেন, ওরছা থেকে দিল্লি অনেক বড়, শাহানশাহ আকবর গুণীর সমাদর করতে জানেন, প্রবীণ কি ...!

প্রবীণকে নীরব দেখে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেন, 'তুমি কি ভাবছ?'

প্রবীণ একটা গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন, 'নারীর বিচার আর পুরুষের বিচার এক রকম হয় না প্রিয়তম।'

'ভাবছ কেন? জরিমানা হলে আমার হবে। যুদ্ধে যেতে হলে আমি যাব। তোমার কি?'

'এইজন্যেই বলি নারী আর পুরুষের ভাবনা এক রকম নয়।'

ইন্দ্রজিতের মনে হল, প্রবীণ সেই প্রথম রাতটির মতোই অজানা রয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে গেলেন যে যার জায়গায়।

এর পরেই বীরবলের গোপন বার্তাবহ এল কেশবদাসের কাছে। খবর আরও খারাপ, সম্রাট এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন ওরছায়। প্রবীণ রায়কে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য। সসম্মানে। আসলে প্রবীণ রায় সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে এ অবস্থায় পৌঁছেছে। সামান্য ওরছার পক্ষে সে আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব, বরং কবিত্রীর বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস করাই সঙ্গত।

সেই রাত্রেই বিশাল ফৌজ পৌঁছল ব্যাসপুরা মহল্লায়। কেশবদাস রাজাকে বা সেনাপতিকে খবর দেবার আগেই। মুঘল সেনাপতি কয়েকজন বাছা বাছা লোক নিয়ে সেখানে এলেন, আসল ফৌজ লুকিয়ে রইল ওরছার বাইরে জঙ্গলে, প্রয়োজনে

আত্মপ্রকাশ করবে। অকারণ যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করা বা শত্রু বাড়ানো আকবরের রীতিবিরুদ্ধ।

প্রবীণ রায় প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কেশবদাস খবর পাঠিয়েছিলেন কিংবা তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা খবর এনেছিল। মুঘল সেনাপতি এলেন। সম্ভ্রমের সুরেই বললেন, 'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি বাদশাহের হুকুমে। বন্দি করে নিয়ে যেতে চাই না। সসম্মানে চলুন। সঙ্গে কিছু নিতে বা কাউকে নিতে চাইলে আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ।' বলে প্রবীণ সঙ্গে নিলেন দাসী মঞ্জরীকে আর কিছু বইপত্র আর বীণাটিকে। অন্য দাসীকে বললেন 'লেখার সরঞ্জাম নিয়ে এস।'

এল কালি-কলম আর তুলট কাগজ। প্রবীণ রায় তাতে লিখলেন মাত্র দুটি ছত্র :

বপু পরবশ হ্যায় কি চলোঁ মন ছাড়য়ে প্রভু পাস।
তাহি জতন কর রাখিও কবুহ মিলন কী আশ।।
(দেহ পরবশ তাই চলেছি মন রইল প্রভুর পাশে।
যতনে রেখো তাকে কোন একদিন মিলনের প্রত্যাশে।।)

রাজাকে লেখা প্রবীণের পদ। ছত্তিশগড়ি ভাষায় লেখা বুন্দেলা কবিত্রীর কবিতা মুঘল সেনাপতির বোধগম্য হল না। তিনি জানলেন, তাঁর অভিযান আশাতীতভাবে সফল, রাই পরবিন নিজেই যেতে রাজি, কোন জোরাজুরি করতে হল না। কোলের সখী বীণার সঙ্গে পদটি রাজার কাছে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন প্রবীণ রায়। যাবার জন্য প্রস্তুত। সেনাপতি বললেন, 'আর কোন যদি বাসনা থাকে আপনার, তাহলে বলুন।'

প্রবীণ রায় হাসলেন, ক্ষীণ করুণ হাসি। বললেন, 'আমার একটাই বাসনা, যাবার আগে ওরছা-নরেশকে একবার দেখতে চাই।'

সেনাপতি মাথা নত করে বললেন, 'তিনি যদি আসেন আমি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আর তো আমাদের অপেক্ষা করবার উপায় নেই।'

কোন কথা না বলে প্রবীণ রায় তাঞ্জামে ওঠেন। ব্যাসপুরার অধিবাসিনীরা মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। প্রবীণকে সকলেই ভালোবাসে।

সেনাসহ তাঞ্জাম দৃষ্টির আড়ালে যেতেই দাসী খবর নিয়ে ছুটে গেল কেশবদাসের বাড়িতে। রাজার কাছেও খবর পৌঁছল, প্রবীণ রায়ের বীণার সঙ্গে দুছত্র পদ লেখা সেই কাগজটি। পড়ে উন্মাদের মতো ছুটে এলেন ইন্দ্রজিৎ। প্রবীণের শূন্য কক্ষ দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মুঘল সেনার ফিরতি পথ ধরে। ভাবলেনও না কোন রাজার পক্ষে একা অরক্ষিত অবস্থায় শত্রুসৈন্যের মাঝখানে গিয়ে পড়া আত্মহত্যার শামিল।

মুঘল সেনাপতি অবশ্য ইন্দ্রজিৎকে বন্দি করলেন না বা বাধা দিলেন না। প্রেমিক যুগলের প্রতি করুণা অনুভব করলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেখা করতে দিলেন প্রবীণ রায়ের সঙ্গে। প্রবীণ তাঁকে দেখেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'তুমি এখানে এলে কেন?'

'আমি যুদ্ধ করব...'

প্রবীণ রায়ের অশ্রু বাধা মানে না। বললেন, 'তার আগে বল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?'

'করি।'

'তাহলে জেনে রাখ, তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তোমার কাছেই রইলাম।'

এর পরের ঘটনাটুকুই ইতিহাস। রাজবিদ্রোহে ওরছা কতটা ফুঁসেছিল, কেমন করে প্রতিশোধ নিয়েছিল অপমানের। সে প্রসঙ্গে না গিয়ে যদি বাদশাহের অন্দরমহলে উপস্থিত হওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, সম্রাটের হারেমে দামি ও দুর্লভ নারীর সংখ্যা গুনে শেষ করা যেত না। সেই শাহী রঙমহলেও প্রবীণ রায়ের মতো কেউ ছিল না। ইচ্ছে করলে প্রবীণ রায় অনায়াসে মধ্যমণির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন। সম্রাটের আদেশে তাঁর জন্য এল অতি মহার্ঘ পোশাক ও রত্নালঙ্কার। এত দামি জিনিস প্রবীণ রায় কখনও দেখেননি। ইন্দ্রজিৎ সিংহের সাধ্য ছিল না এত হিরেমোতির অলঙ্কার দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে তোলার। প্রবীণ রায় কিন্তু সেসব ছুঁয়েও দেখলেন না। রঙমহলের দাসীরা অনেক সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে সাজাতে পারল না। মঞ্জরী এসে তাঁর মুখের ওপর টেনে দিল চান্দেরি মসলিনের শ্বেতশুভ্র ঘোমটা। বলল, 'রাহু-দৃষ্টি যেন না পড়ে চাঁদমুখে।'

রঙমহলে আকবর পদার্পণ করলেন। শামাদানের বাতি ঝলসে উঠছিল দেয়ালের নকশা করা কাচে, মুঘলরা ঐশ্বর্য ভালোবাসে, চারদিকে জাঁকজমকের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সেখানেই বাদশাহ হুকুম দিলেন প্রবীণ রায়কে নিয়ে আসার। তিনি দেখতে চান তাঁকে।

প্রবীণ রায় এলেন। উজ্জ্বল আলো যেন চমকে উঠল তাঁর অনুজ্জ্বল শুভ্র পোশাকের ওপরে। বাদশাহকে তসলিম জানিয়ে স্থির হয়ে বসলেন প্রবীণ, যেন একটি স্তব্ধ দীপশিখা। আকবর অনুভব করলেন তাঁর নীরব ব্যক্তিত্ব। বললেন, 'শুনেছি আপনি কবি। স্বরচিত কবিতা শুনতে চাই।'

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তারপর পরিষ্কার কণ্ঠে বীণার তানতরঙ্গ তুলে প্রবীণ রায় বললেন, 'বিনতি রায় প্রবীণ কি শুনিয়ে শাহ সুজান।
জুঠি পতরি ভখত হ্যায় বারী বায়স স্বান।।'

মাত্র দুটি ছত্রের একটি পদ বা পদ্য। অতি সাদামাঠা ধরনের, গ্রাম্য লোককাহিনীর মতো। কী বলতে চাইলেন প্রবীণ? আকবর নিষ্পন্দ হয়ে বসে রইলেন, স্থিরভাবে চেয়ে আবছা-আড়াল কবিত্রীর দিকে। মধ্যভারতে মহিলা কবিকে সম্মান করে বলা হয় কবিত্রী। অন্যরাও চুপ করে রইলেন। ভয়ে-ভাবনায় বাদশাহের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কবিতার মর্মার্থ অনুভব করতে পারলেন কি না বোঝা গেল না। আকবর কিন্তু পেরেছিলেন।

কী বললেন তাঁকে প্রবীণ রায়? হে সম্রাট শুনুন, উচ্ছিষ্টভোজী হল তিনজন, বারী (যারা পাতার থালা কুড়োয় বা হতদরিদ্রের জীবন যাপন করে), বায়স ও কুকুর। অন্তর্নিহিত অর্থ, সম্রাট আপনি কোন পর্যায়ভুক্ত হবেন? কারণ আপনি ওরছা নরেশ ইন্দ্রজিৎ সিংহের উচ্ছিষ্ট নারীকে উপভোগ করতে উদ্যত হয়েছেন, উচ্ছিষ্টভোজী ভিখারি, বায়স ও কুকুরের সমতুল্য বলেই কি!

আকবর প্রবীণ রায়ের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিলেন। কেন না তাঁকে এত কঠিন

ভর্ৎসনা ইতিপূর্বে কেউ করবার সাহস পায়নি। প্রবীণের সাহসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মধ্যে দেখলেন, ওরছা নরেশের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ। ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের শক্তিহীন রাজার জন্য দিল্লিশ্বরকে অপমান করতেও তিনি পেছপা নন। এই অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হতে পারে। তবু আপন প্রভুর প্রতি তাঁর আনুগত্যে কোন দ্বিধা নেই। হয়ত আরও শঙ্কা হল, এই নারী মুখে মুখে অজস্র পদ রচনা করে মানুষের চোখে তাঁকে অপরাধী করে রেখে যাবে। মনে তাঁর যাই হোক না কেন, আকবর তা প্রকাশ করেননি। যে কোন মহৎ ব্যক্তি দেখলে আকবর খুশি হন। উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করেন। এখানেও মনে মনে প্রবীণের প্রশংসা না করে পারলেন না। লজ্জা পেলেন কিংবা ধিক্কার দিলেন নিজেকে মনে মনে। বললেন, 'ওরছা নরেশের প্রতি আপনার তীব্র অনুরাগ দেখে সুখী হলাম। আপনাকে সসম্মানে ওরছায় ফেরত পাঠানো হবে।'

প্রবীণ তাঁকে নত হয়ে সেলাম জানান। আকবর সেই সেনাপতিকেই প্রবীণ রায়কে সসম্মানে ওরছা পৌঁছে দেবার আদেশ দিয়ে রঙমহল ত্যাগ করেন।

ওদিকে ইন্দ্রজিৎ সিংহ যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন। সংবাদ এল, রায় প্রবীণ ফিরে আসছেন দিল্লিশ্বরকে জয় করে। সমস্ত ওরছা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল। প্রবীণ রায় ফিরে এসেছেন, ফিরিয়ে এনেছেন দেশের সম্মান। রাজপথে পথ অবরোধ করলেন রাজা। প্রবীণ তাঁকে প্রণাম করলেন, বললেন, 'আমার গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দাও আমার কায়ায়। যাবার সময় আমি আমার মনকে রেখে গিয়েছিলাম তোমার কাছে।'

রাজা বললেন, 'প্রহরীর তো পারিশ্রমিক আছে। আজ থেকে তুমি বন্দি হয়ে থাক আনন্দমহল সংলগ্ন রায় প্রবীণ মহলে।'

প্রবীণ রায় মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক।'

বিমনা হলেন হয়ত কেশবদাস, কালোত্তীর্ণ হবার আগেই বুঝি কবিত্রী হারিয়ে গেল। 'কবিপ্রিয়া' কাব্যে তাই ইন্দ্রজিৎ আর রায় প্রবীণের বাকি জীবনের কথা নেই। কিন্তু প্রেম কখনো হারায় না। বেতোয়া নদী এখনও রাজা ও রায় প্রবীণের প্রেমকথা শুনিয়ে আসছে।

সেলিম ও আনারকলি

যে একেবারেই নেই, কোন কালে ছিল না, লোকপরম্পরায় সে কি স্মৃতি হয়ে উঠতে পারে? ঐতিহাসিকের কাছে আনারকলি কবিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। লাহোরের আনারকলিবাগের মধ্যে কালের কপোলতলে একবিন্দু নিটোল অশ্রুর মতো বিষণ্ণ মর্মর স্মৃতিসৌধটি ঘিরেও কত রহস্য। প্রতি মুহূর্তে এক ফুঁয়ে তাকে উড়িয়ে দেবার কত না চেষ্টা। তবু আনারকলি বেঁচে আছে।

ইতিহাস বলে আকবর তাঁর জীবনের অনেকগুলো বছর লাহোরে বা তার আশেপাশে কাটিয়েছিলেন। এর কারণ হয়ত ওই অঞ্চলের ক্রমাগত বিদ্রোহ দমন কিংবা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। মুঘল সম্রাটেরা অনবরত নতুন রাজ্যজয়ের চেষ্টা করতেন। আকবরের সাম্রাজ্য যেমন বিশাল তেমনই সুরক্ষিত। তবু কাবুল অভিযানের প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। অবশ্য যুদ্ধযাত্রার উৎকণ্ঠা তাঁর ছিল না। বেশ ধীরে সুস্থে যাত্রা করলেন সম্রাট। সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত-লোক-লস্কর-হাতি-ঘোড়া-শিবির-হারেম-বিবি-বাঁদি সমেত পুরো একটা ছাউনি এবং সপরিবারে সেলিম। অল্প কিছুদিন আগে তাঁর দুটি বিবাহ হয়েছে। বেগমরাও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই চলমান বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি চলমান বাজার। সেটি অবশ্য লাহোর থেকে সরাসরি আসছে না, পথে বদলে যাচ্ছে তাদের আনাগোনা। মুঘল সেনাবাহিনীতে যেমন নানা ভাষাভাষি লোক থাকত তেমনই পণ্য নিয়ে আসত নানা ভাষাভাষি মানুষ। চলমান বাজারে কেনাবেচার সময়ে যে মিশ্র ভাষাটির উদ্ভব হয় পরে তারই নাম হয়েছে উর্দু। তুর্কি ভাষায় উর্দু শব্দের মানে হল বাজার। জল নিয়ে আকবরের চিন্তা ছিল বেশি সেজন্য আবদারখানার কর্মচারীরা জল সংগ্রহ করে রাখতেন এবং সঞ্চিত জল নিয়ে তাঁরাও হতেন অভিযানের শরিক। এমনই বিরাট লটবহর নিয়ে আকবর যখন আফগানিস্তানে পৌঁছলেন তখন সেখানকার আফগান সর্দার কিভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন ভেবেই পেলেন না। কিন্তু আপ্যায়ন তো করতেই হবে। চাকচিক্যে না যদি হয় তো নতুন কোন সুন্দরীর নাচে-গানে বাদশাহকে মাতিয়ে তুলতেই হবে। সর্দার হুকুম দিলেন রংমহল সাজাবার। ডেকে পাঠালেন নর্তকীদের। মনে পড়ে যায় নাদিরাকে। তাজা ফুলের মতো মেয়ে। বাঁদি হলেও অতি সুন্দরী। আর নাচে গানে? ওর মতো কেউ নেই। বললেন, 'আজ রংমহলে নাদিরা নাচবে। শাহানশাহ আকবর দেখবেন। ভালো হলে ঠিক আছে, মন্দ হলে গর্দান যাবে।' হাসিমুখে নাদিরা সেলাম জানায়। তার

মনে যেন ভয়-ডর নেই। আফগান মেয়েরা সাহসী, কিন্তু এ যেন লাগামছাড়া ধরনের সাহসী। রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলেন সর্দার নিজেও। বাঁদিবাজার থেকে কেনা অতি সাধারণ মেয়ে হলেও নাচের তালিম দিতে পাঠিয়ে তিনি ভুল করেননি। একদিন নাদিরা তাঁর দরবারের সেরা নাচনি হয়ে উঠবে।

আফগান সর্দার আপ্যায়নের ত্রুটি করলেন না। উষর মরুর বুকে এক টুকরো মরূদ্যানের মতো সাজল তাঁর রংমহল। সম্রাট ও সম্রাটপুত্রের সম্মানে সেখানে নৈশভোজের আসর বসবে। নাচবে একটি বসরাই গোলাপ। খুশি হলেন আকবর। তারও বেশি। মুগ্ধ। এতদিন ধরে শেখা যাবতীয় নৃত্যকৌশল পেলব অঙ্গভঙ্গিতে ফুটিয়ে, সুমধুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কাকলিতে, হাস্যে লাস্যে একটি কিশোরী মাতিয়ে রাখল সান্ধ্য আসরটিকে। সারা জীবনে সম্রাট কম রূপসী দেখেননি। এই মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, গুণবতীও। এমন নৃত্যও তিনি দেখেননি। এ যেন অকারণ পুলকে ঝরনার আপনি বয়ে যাওয়া। খোলা গলায় তারিফ করলেন, 'শাবাশ।' নর্তকী আভূমি নত হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল। সেও যেন নাচেরই একটি ভঙ্গি।

মোহিত সম্রাট বললেন, 'কি নাম তোমার?'

বসরাই গোলাপ হেসে উঠল যেন, 'বাঁদির নাম নাদিরা।'

আকবর হেসে উঠলেন। এখনও কিশোরী কিন্তু কি নিখুঁত তার সহবত শিক্ষা। এমন মেয়ে তিনি আগে কখনও দেখেননি। বললেন, 'ও নাম তোমায় মানায় না। আমি তোমার নাম দিলাম আনারকলি।'

খুশিতে মেয়েটির গাল দুটি সত্যিই ডালিমফুলের মতো লাল হয়ে উঠল আর তা দেখে হেসে উঠলেন সকলেই। মেয়েটিও যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বারবার কুর্নিশ জানাতে লাগল।

সেলিম এ আসরে ছিলেন নীরব দর্শকের মতো। নবীনা নর্তকী তাঁর মনে ঝড় তুলল কতখানি বোঝা গেল না। শুধু সম্রাটের লুব্ধ, মুগ্ধ চোখদুটি দেখে আফগান সর্দার আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, তিনি বাদশাহকে তাঁর পছন্দমতো একটি উপহার দিতে পারবেন। ক্রীতদাসী তো মানুষ নয় যে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সে কাবুল থেকে শাহী হারেমে যেতে চায় কি না। তার মনের কথা জানতে চাওয়ার রেওয়াজ নেই। বাঁদির জীবনই তো প্রভুকে খুশি করার জন্য। কাজেই কাবুল থেকে ফেরার আগে দামি দামি উপহারের ডালির সঙ্গে এল সেই আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটি, যে তখনও কৈশোর অতিক্রম করেনি। যার মরুদ্যানের মতো স্বপ্নভরা চোখদুটিতে দুর্নিবার আবেগের ঝিলিক। উপহার হিসাবে আনারকলিকে পেয়ে আকবর যেমন অবাক হলেন তেমনই খুশিও হলেন। মেয়েটি বড় গুণবতী আর কে না জানে তিনি গুণীদের ভালোবাসেন।

সদলবলে আকবর ফিরে এলেন লাহোরে। পথে শিবিরেই ঘটে গেল অভাবনীয় কিছু। সেলিমের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়ে গেল আনারকলির। আকবরের শিবির ছিল চলমান রাজধানীর মতো। সম্রাটের নিজস্ব তাঁবুর চারদিকে তিনশ ষাট গজ খোলা জায়গা থাকত। কোন প্রহরীও সেখানে যেতে পারত না। সম্রাটের তাঁবুর সামান্য বাঁদিকে একশ গজের ভিতরে থাকত বেগমদের তাঁবু, সম্রাটের ছোট ছেলে দানিয়েলের

তাঁবু। আকবরের দরবার বসত পেশখানা বা সাদা তাঁবুতে। যুবরাজ সেলিমের তাঁবু থাকত তার সামান্য ডান দিকে, সঙ্গে তাঁর কর্মচারীদের তাঁবু। সামান্য বাঁদিকে থাকত দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের তাঁবু। যদিও বাদশাহ যে সপরিবারে একসঙ্গে সর্বদা ঘুরতেন তা নয়। তবু নিয়ম নিষ্ঠার জন্য আকবর প্রতিটি স্তরকে এভাবে সাজাতেন। প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব তোষাখানা, ভাঁড়ার, হারেম, লোকজন, কর্মচারী, এমনকি দোকানপাট পর্যন্ত। সম্রাটের তাঁবুটি ছিল দোতলা। সারিবদ্ধ অশ্বারোহী সবসময় একভাবে ঘিরে রাখত ছাউনিগুলো।

হারেমেও কিছু নিজস্ব নিয়ম ছিল। সেখানে থাকতেন বহু নারী। বিচিত্র তাঁদের পরিচয়। কেউ বেগম, কেউ পরসতার, কেউ পরিচারিকা, কেউ দাসী, কেউ নর্তকী, গায়িকা, সহচরী, বাঁদি, ক্রীতদাসী। পরিচয় যাই হোক না কেন, বেগম ছাড়া সকলেরই একটিমাত্র কাজ, প্রভুকে প্রসন্ন রাখা। তারপর তাঁর প্রসন্নতার ধাপে ধাপে নিজের উন্নতির সোপান তৈরি করে ওপরতলায় ওঠার চেষ্টা করা। হারেমের দেখাশোনার ভার থাকত প্রধানা বেগম বা বাদশাহের বোনের হাতে। সকলেই যে সব সময় চোখে চোখে বন্দি হয়ে থাকতেন তা নয়। নর্তকী-গায়িকা-দাসী-বাঁদিরা হারেমের বাইরে যেতে পারত। ধরে নিই, শাহী হারেমে প্রবেশ করল নতুন একটি ফুল, আনারকলি। তার রূপ দেখে চোখ টাটাল হারেমকন্যাদের, ওপর মহলে কোন সাড়া জাগল না। হাজার হাজার মেয়ে আসে, আফগান মেয়েটিও পেল সামান্য একটু জায়গা। নিয়ম কানুনের বাঁধাবাঁধি বিশেষ রইল না। রূপসী হোক বা আর যাই হোক আসলে তো সে বাঁদি ছাড়া কিছু নয়। অবজ্ঞা মিশেই রইল। আনারকলির কিছুই এল গেল না। সে মনের আনন্দে বাজার দেখে বেড়াতে লাগল। কেউ ডাকল, 'বিবি, কি নেবে বল?' কেউ বলল, 'বিবি, হাত দেখাবে?' কেউ বলল, 'মেওয়া নাও।' কেউ বলল, 'আঙুর'। আনারকলির কিছুই প্রয়োজন নেই। সবার সঙ্গে মিষ্টি হাসি বিনিময় করে সে এগিয়ে যায়। একজন বলে, 'বিবি, আনার নাও। মস্কটের আনার। দারুণ মিষ্টি।'

সদ্য নতুন নাম পাওয়া নাদিরা থমকে দাঁড়ায়, 'খুব মিষ্টি?'

পশারি উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে একটি গভীর কণ্ঠ বলে উঠল, 'তোমার চেয়ে নয়।'

'কে?' বলেই মুখ ফেরায় আনারকলি। অত্যন্ত রূপবান এক রাজপুরুষ। যুবক। যেন শাহজাদা। কিশোরী মন অকারণেই ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলে, 'তুমি জান আমি কে?'

যুবকটি ছদ্ম বিনয়ে বলে, 'আজ্ঞে না বিবিজান। আমি মুসাফির। এই কাবিলার সঙ্গে সঙ্গে লাহোরে ফিরছি। তা তোমার নামটি কি?'

'আমার অনেক নাম।' কিশোরী অকপটে বলে, 'প্রথমে আমার নাম ছিল শরিফুন্নিসা। তারপর হল নাদিরা। এখন আমার নাম আনারকলি।'

'বান্দার একটাই নাম সেলিম।'

আনারকলি তাঁকে চিনতে পারল না, 'আমি কি তোমাকে আগে দেখেছি?'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'কোথায় বল তো?'
'এই উর্দুতেই। নানাজনের ভিড়ের মধ্যে।'
'তুমি আমায় খুঁজে পাবে?'
'তোমাকে আমি খুঁজে বার করবই।'
'কী করে?'
'তোমার সুন্দর মুখটি দেখবার জন্য আমি আসমান-জমিন এক করে ফেলব।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখের নকাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে আনারকলি। হারেম-ললনারা ঝরোখার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু বাঁদির জন্য সামান্য রুমালের নকাবই যথেষ্ট। সেও বুঝি খুলে গিয়েছে কখন আনমনে। মুখ ঢেকে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, 'আর কাউকে বোলো না। কেউ জানতে পারলে তোমার গর্দান যাবে।' ছদ্ম ভয়ে গলায় হাত বুলিয়ে সেলিম বললেন, 'না, না, গর্দানের ওপর শিরটা না থাকলে তোমাকে দেখব কি করে? আমি কাউকে কিছু বলব না। তুমিও কাউকে কিছু বোলো না।'

এমন করেই একদিন দুটি মানুষের পরিচয় হয়েছিল। প্রায় কিশোরী আনারকলি বুঝতেই পারেনি নবাগত ব্যক্তিটি মুসাফির নয়, স্বয়ং শাহজাদা সেলিম। আর সেলিম? যুবক কবির চোখে এক অনাবিষ্কৃত তারকা। তার বেশি কিছু নয়। অনেক রূপসীর ভিড় মুঘল হারেমে। অনেক ছলাকলা। আনারকলির সারল্য মুগ্ধ করল তাঁকে। স্থির করলেন আবার দেখা করবেন তার সঙ্গে। ছদ্মবেশে। হারেমে নয়, উর্দুতে। প্রেমের একটা নিজস্ব গতি আছে বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি চলার পথের যোগ থাকে। কাবুল থেকে লাহোর পৌঁছবার পথই সেলিম ও আনারকলিকে অনেকটা কাছাকাছি এনে দিল।

অন্যদিকে সম্রাটের জীবনেও আনারকলি যেন দ্বিতীয় যৌবন। পথের ক্লান্তি অপনোদনে আনারকলিই ভরসা। সে সবে কৈশোর অতিক্রম করেছে কিন্তু নাচে-গানে তার জুড়ি মেলা ভার। দেহের ছন্দে বিদ্যুৎ, কণ্ঠে বুলবুল লজ্জা পায়। অন্যান্য হারেমললনার কথা মনেও পড়ে না। আকবরের মনও আনারকলির দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হল। আর আনারকলি? সে এক আশ্চর্য নারী। সে জানত, আমি বাদশাহের খাদিমা, কেনা দাসী। হাস্যে লাস্যে তাঁর মন ভোলানোই আমার কাজ। নিজের কাজ সে নিখুঁতভাবেই করত। কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি খুঁজে পায়নি কেউ। কিন্তু মন? কেনা বাঁদির আবার মন, খাদিমার মনে কোন দুঃখ থাকতে নেই। দুঃখিত হবার অধিকারও নেই। আনারকলি বোধহয় দিল্লির হারেমের এই নিয়মকে মেনে নেয়নি।

কেউই সহজে মেনে নেয় না। ষড়যন্ত্র, ঘৃণা আর গুপ্তশত্রুতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সহজাত অনুভূতিগুলিকে হারিয়ে ক্ষমতা, অর্থ প্রতিপত্তির দিকে ঝোঁকে। অতি স্বাভাবিক সেই চেষ্টা। আনারকলি এসব কিছুই চায়নি। সহজ সরল কিশোরীটি হারেম ষড়যন্ত্র বা ক্ষমতার লড়াই কোনটিরই শরিক হয়নি কখনও। নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারেনি। সে ভালোবেসেছিল। শাহানশাহ আকবরকে নয়, তাঁর পুত্র শাহজাদা সেলিমকে। মুঘল হারেমের নিয়ম অনুযায়ী এটি অমার্জনীয় অপরাধ। অনেক সময় মনে হয়, রাজা বা রাজপুত্র যা খুশি তাই করতে পারেন কিন্তু নিয়ম ভাঙতে রাজা পারলেও রাজপুত্ররা পারে না। পিতার প্রিয় পুত্র সেলিমও সেই নিয়মের নিগড়ে বন্দি ছিলেন

কিন্তু তিনিও আনারকলির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এড়াতে পারলেন না। পথের মধ্যে যে খেলা শুরু হয়েছিল লাহোরে পৌঁছেও তা শেষ হল না। ইতিমধ্যে আনারকলি জেনে গিয়েছে তাঁর আসল পরিচয়। সেলিম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছেন তাতে আনারকলি ভয়ে-বিস্ময়ে চমকে ওঠেনি। অতিরিক্ত গর্বে উছলে ওঠেনি। সৃষ্টিছাড়া মেয়েটির প্রতি তীব্র টান অনুভব করতে থাকেন তিনি।

সেদিনও উর্দুর মধ্যে দেখা। সেলিম বললেন, 'আমাকে তুমি ভুলে যাবে না তো?'

আনারকলিও শিখেছেন কেতা কানুন, জেনেছেন লাহোরেই থাকবেন বাদশাহ। বেশ কিছুদিন ধরেই লাহোর তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। মিষ্টি হেসে বলল, 'জাঁহাপনা তো লাহোরেই থাকবেন। তাই বাঁদিও সেখানেই থাকবে। শাহজাদা কোথায় যাবেন আমি তো জানি না। তবে তিনি চাইলে দেখা হবেই।'

'কী রকম?'

'তিনি তো আর বান্দা নন, তিনি শাহজাদা। যখন আপনার ইচ্ছে হবে তখনই আমাকে দেখতে পাবেন। ইচ্ছের মুখে তো আর কেউ লাগাম পরাতে পারে না।'

সেলিম দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মেয়েটি জানে না মুঘল আইন-কানুন। রাজার ছেলেও সাধারণ মানুষের মতো কিংবা তার চেয়েও বেশি অসহায়। অন্যের হারেমকন্যার দিকে নজর দেবার অধিকার তাদের নেই। ইচ্ছের মুখে তাঁদের লাগাম পরাতেই হয়।

আনারকলি বলে, 'শাহজাদা কি এত ভাবছেন? সকলেই তো সহি সলামত আছেন শুনেছি।'

'আমি তোমার কথা ভাবছি।'

'আমার কথা', আনারকলি উছলে ওঠে, 'আমার কথা কেউ ভাবে না। আমি যে বাঁদি।'

'স্বপ্ন দেখ না কখনও? বেগম হবার?'

'বেগম হয়ে আমি কি করব? হারেমের মধ্যে চার দেয়ালের আড়ালে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তার চেয়ে রংমহল ভালো। হারেমে থাকলে কি আমি আপনাকে পেতাম। আমার পথই ভালো। তবে...'

'কি?'

'আপনার হারেমে আমি যদি সবচেয়ে নিচুতলার বাঁদিও হতাম...'

'আমি তাহলে তোমাকে বেগম করতাম।'

'বেগম হতে আমি চাই না শাহজাদা, আমি শুধু আমার সেলিমকে চাই।'

'পাওনি?'

'পেয়েছি শাহজাদা। হয়ত বেগমদের চেয়েও বেশি করেই পেয়েছি। আমার সৌভাগ্য আমি তোমার ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু তুমি যদি সাধারণ মানুষ হতে, হতে শুধু আমার ভালোবাসার সেলিম। তাহলে আমি বেশি খুশি হতাম।'

আনারকলিকে আরও বেশি ভালো লাগে সেলিমের। যে যত বড়ই হোক না, সবাই চায় তার ব্যক্তি আমিটিকে ভালোবাসুক তার প্রেমিকা। শাহজাদা হলেও সেলিমও তাই চান হয়ত সম্রাট আকবরও তাই চান।

কাবুল থেকে লাহোর দুর্গ বেশিদিনের পথ নয়। তবে সম্রাট কিছুটা সময় নিয়েই পথটুকু অতিক্রম করলেন। ১৫৮৩ সালে লাহোরে দরবার তুলে নিয়ে এসেছেন। দুর্ধর্ষ আফগানদের পদানত করতে। মাঝে মাঝে তাঁকে এবং সেলিমকে যুদ্ধে যেতে হয়। বিশেষ করে পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ছোটখাট বিদ্রোহ দমন করতে। এখানে এসে সেলিম পিতা হয়েছেন। একরকম অবাধ্যতা করেই জোর করে বিবাহ করেছেন সাহিব-ই-জামালকে। আকবরের খুব ভালো লাগেনি, কারণ কোথাও আভিজাত্যের খামতি ছিল সাহিব-ই-জামালের কিন্তু রূপ ছিল তাঁর। এসবই অবশ্য এখন অতীত। প্রিয় সন্তানের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেন কি পিতা? একসময় লাহোরে ফিরে এলেন সবাই। বাদশাহ ডুবে গেলেন তাঁর রাজকাজে। সিন্ধু প্রদেশেও বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তারই মধ্যে মারা গেছেন রাজা টোডরমল বা তোডলমল্ল। জয়পুরের রাজা ভগবানদাসের মৃত্যুসংবাদও পেলেন আকবর, এবং সব কিছুই তাঁকে ব্যস্ত রাখল বেশ কিছুদিন।

দুর্গের মধ্যেও সেলিম ও আনারকলি তখন খুঁজে নিয়েছেন কোন নিভৃত কক্ষ। লাহোর দুর্গ খুব বড়। বাড়ি, বারান্দা, উঠোন, জলাশয়, বাগান, ফোয়ারা, হারেম, হামাম, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস কি না ছিল সেখানে। সম্রাট থাকতেন তাম্বিখানায়। ছবি, গালিচা, পরদায় চোখ ধাঁধিয়ে যেত আনারকলির। বাগানের প্রতি কোণে যে আটকোনা ঘরগুলো ছিল মিনারের লাগোয়া আনারকলির পছন্দ ছিল সেই ইমারতগুলোই। বাগানের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝেই আসেন সেলিম। টুকরো হাসির ফুলকি ছড়িয়ে ছুটে আসে আনারকলি। কখনও তসলিম জানায়, কখনও ভুলে যায়। সেলিম বলেন, 'আদব কায়দাগুলো ভুলতেই তো তোমার কাছে আসি। আমাকে শাহজাদা বলে খাতির করতে হবে না। তোমার কাছে আমি শুধু সেলিম। অনেক ভালোবাসার সেলিম।'

আনন্দে, উচ্ছ্বাসে আনারকলির ডালিমরাঙা গাল আরও রঙিন হয়, 'শুধু সেলিম? আমার প্রিয়তম সেলিম। আমার হৃদয়ের বাদশা। আমার দুনিয়া।'

সেলিম বলেন, 'তোমার নাচগানের খবর কি? তালিম চলছে তো? একদিন তুমি সেরা নর্তকী হয়ে উঠবে।'

'বাদশাহের অনেক কৃপা এই বাঁদির ওপর। আমার কোন অভাব নেই। তালিম নিই। রেওয়াজ করি। বাদশাহকে খুশি করতে পেরেছি। আমার জীবন ধন্য।'

সহজ-সরল মেয়েটি সত্যিই মুগ্ধ করতে পেরেছিল আকবরকে। চাইতে পারত যা খুশি ধন-দৌলত, জমি-জিরেত, বাড়ি-ঘর, গয়নাগাটি, হিরে-জহরত কোন দুর্বলতম মুহূর্তে হয়ত বা ক্রীতদাসীত্বের মুক্তি। আকবর দিতেন। অনেককেই দিয়েছিলেন। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বধ্যভূমি থেকে ফিরে এসেছিল এক চোর। সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে শুধু মুক্তিই পায়নি। আকবর তাকে কিছু অর্থও দিয়েছিলেন। কেন? না, বধ্যভূমিতে যাবার সময় লোকটা চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমার একটা গুণ আছে।' আকবর তাকে থামিয়ে বলেছিলেন, 'কি গুণ?' লোকটা বলেছিল, 'আমি ভালো গান জানি।' 'শোনাও।' লোকটা ধরা গলায় গাইতে চেষ্টা করে পারল না। সবাই হেসে উঠলে বলল, 'ভয়ে

আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ হয়ে আছে। কি করে গাইব।' আসলে সে গান জানত না। আকবর বুঝতে পেরেও খুশি হলেন তার বুদ্ধি দেখে। গান না জানুক, উপস্থিত বুদ্ধি তো আছে।

আবার উল্টো দিকটাও ছিল। আকবরের আমলে ছিল নিয়মের কড়াকড়ি। তিনি নিজেও বহু আইন তৈরি করেছিলেন। নিয়মলঙঘনকারীর শাস্তি ছিল কড়া। এই লাহোরে আসার সময়েই তো একজন পরিদর্শককে পাঠিয়েছিলেন নদীর জল কত গভীর জানার জন্য। তাঁর হাতি-ঘোড়া সেখান থেকে পার হতে পারবে কি না সেটা জানতে। তাঁর নিজের মনে হয়েছিল জল খুব গভীর নয়। সেই লোকটির কি দুর্মতি হয়েছিল কে জানে, সে কিছুদূর গিয়ে ঘুরে এসে জানায়, জল গভীর, এখানে পার হওয়া যাবে না। অথচ আকবরের কাছে খবর ছিল নদীর অনেকটা উজানে এক জায়গায় জলের গভীরতা কম। তিনি লোকটিকে, ধরে নেওয়া যাক, বলেছিলেন পনের ক্রোশ রাস্তা দেখে আসতে। লোকটি দেখে এসেছিল যেশুইট পাদ্রীর হিসেবমতো, পঁচিশ মাইল বা সাড়ে বার ক্রোশ। আকবর স্বয়ং লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাকে যতদূর যেতে বলেছিলেন সে ততদূর কি গিয়েছিল? লোকটি তাঁকে মিথ্যা বলতে পারল না। সত্যি কথাই বলল। আকবর হুকুম দিলেন, তাকে হাওয়া ভর্তি মশকের সঙ্গে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হোক। লোকটি প্রাণভয়ে কাকুতি মিনতি করতে করতে ভেসে গেল নদীর মাঝ বরাবর। তখন আকবর আদেশ দিলেন তাকে তুলে আনতে। আনার পরে তাকে সরকারি খাতায় জল থেকে তুলে আনা ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হল। মুঘল আমলে জল থেকে পাওয়া, লুঠ করে পাওয়া, বন্দি শত্রু সম্রাটের নিজস্ব সম্পত্তি রূপে পরিচিত। সব দেশেই সেকালে এই নিয়ম ছিল। এই লোকটিকে পরে দাস হিসাবে সীমান্ত শহরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমৃত্যু তাকে ক্রীতদাস হিসাবেই জীবন কাটাতে হবে। যদি না তার প্রভু তাকে মুক্তি দেয়। সংখ্যায় কম হলেও সে রকম প্রভুও যে ছিল না তা নয়। বন্দি শত্রুকে আকবর সম্মানও দেখিয়েছেন। গুণী মালোয়াধিপতি বাজবাহাদুর যুদ্ধবন্দি হলেও তাঁর সভাগায়ক, আট হাজারি মনসবদার হয়েছিলেন। কাজেই কঠোরে-কোমলে মেশা আকবরের কাছে আনারকলি তাক বুঝে চাইতে জানলে আদায় করতে পারতেন না কি নিজের মুক্তি?

কিন্তু নিজের জন্যে কিছু চাইবার কথা কখনও আনারকলি ভাবেইনি। সে বুঁদ হয়ে ছিল আপন মনের মাধুরী দিয়ে গড়া সেলিমের স্বপ্ন নিয়ে। হারেম ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল না বলেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেও শেখেনি। হারেমের দারোগারা যে আনারকলিকে নিয়ে প্রথমেই মাথা ঘামায়নি তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাহলে অনেক আগেই সে ধরা পড়ত। কিন্তু অতি সামান্য বাঁদি সে। হারেমে কত কী ঘটে। সব দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখলে কি চলে? আকবরের রাজত্বে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল সবচেয়ে কড়া। অবশ্য তার সংজ্ঞা সম্রাটের কাছে কি ছিল জানা যায়নি। শাহজাদার সিংহাসন নিরাপদ রাখতে তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন শাহী রাজবংশের বাইরে শাহজাদিদের বিয়ে হবে না। সেই নিয়মের তলায় চাপা পড়ে গিয়ে শাহজাদিরা যদি সুস্থ জীবনের স্বপ্নও দেখতেন তা পৌঁছত ব্যভিচারের পর্যায়ে। এছাড়াও হারেমে অগুনতি নারী—

তাদের কথাও কি কখনও ভেবেছিলেন আকবর? অথচ হারেমকন্যারা ব্যভিচারিণী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি পেত। রাজকর্মচারীরাও অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলে, সে যত বড় পদেই আসীন হোন না কেন, শাস্তি ছিল সরাসরি মৃত্যুদণ্ড। কাজেই ছোটখাট প্রণয়োপখ্যান, যা নিজস্ব নিয়মে আপনি বেড়ে ওঠে, সেগুলো দারোগারা না দেখারই ভান করত। প্রহরী বা রক্ষীদের মনেও এমনই একটা উদারভাব যে ছিল না তা নয়। নানাভাবে সোনারুপোর সিক্কা-মোহরও তাদের হাতে আসত।

সেলিমের মনের কথাও যে কেউ জানতে পারেনি মনে হয় না। অন্তত শেখ ফরিদ, দেড় হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি বা বক্শি জেনেছিলেন কিছুটা। সেলিমের কাছের মানুষ তিনি। সাহায্যকারী, শত্রু নন। তবু অসংখ্য চোখের আড়ালে থাকা ঘটনাটি একটু একটু করে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল। বিশেষ করে আনারকলির প্রেমিক যখন সেলিম তখন ঈর্ষার আগুন জ্বললেও অবাক হবার কিছু নেই। বাদশাহের কেনা বাঁদি, সে কি না শাহজাদার মাশুকা? পিতা-পুত্র দুজনেই এই নাগিনীটার হাতের মুঠোয়। কী সর্বনাশ! এ যে ভয়ানক অপরাধ। বাদশাহের কানে যদি ওঠে? কিন্তু তুলবে কে? অভিযোগের আঙুল তুলতে হবে যে শাহজাদার দিকে। তারপর?

গুঞ্জন একবার উঠলে থামতে চায় না। পরদার অন্তরাল ভেদ করে একদিন পৌঁছল সম্রাটের কাছে। চমকে উঠলেন যেন প্রৌঢ় সম্রাট। যেন অতি প্রিয়জন অতি নিকটে এসে অতর্কিতে তাঁর পিঠে তীক্ষ্ণ ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। প্রায় কিশোরী আনারকলি পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে এখনও যেন সে আফগানিস্তানের বুনো ফুল। হাস্যে লাস্যে অপূর্ব মোহময়ী নারী। সেই কাবুল থেকে আসার সময় দু-দুবার তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। একবার হায়েনা শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে। আর একবার একটা মাদি হাতির পিঠ থেকে উঁচু পাট হাতির পিঠের ওপর বসতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁকে সুস্থ করবার জন্য আনারকলির সেই শুশ্রূষার কথা মনে পড়ল। সেই সেবা সেই আন্তরিকতা, যদিও খাদিমার সেটা কর্তব্য, সে কি মিথ্যা হতে পারে? সেইসব কষ্টের দিনগুলোয় আরামের প্রলেপের মতো আনারকলির উপস্থিতি। আনারকলি যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল, যৌবনের সোনার দিনগুলো তিনি চিরকালের মতো ফেলে এসেছেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

দাক্ষিণাত্যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। বাদশাহকে ফিরতে হবে আগ্রায়। সঙ্গে ফিরবে আহল-ই-মহল বা হারেমবাসিনীরা। আগে পরে ফিরবেন সকলেই। ক্লান্ত শাহানশাহ নিজেও। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য আনারকলিকে ডেকে পাঠাতে গিয়েই তাঁর আবার মনে পড়ল হারেম দারোগার দেওয়া সংবাদ। হয়ত সত্যি, হয়ত নয়, আকবর শেষ জানতে চান সবকিছুর। ঘোষণা করলেন্ন রংমহলে বসবে নাচের আসর। দীর্ঘ যাত্রার পূর্বে এমন অনুষ্ঠান আগেও হয়েছে। তাছাড়া দিওয়ান-ই-আম আর কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগার পর তো রঙিন মেহফিলের আসর জমেইনি। এখন সেসব বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মহল সাজানো হয়েছে রঙবেরঙের ছবি দিয়ে। উৎসব তো হতেই

পারে। আজ সে আসরে উপস্থিত থাকবেন শাহজাদারাও। আনারকলিকে নাচতে হবে সে আসরে।

প্রেমের বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে প্রকাশ করা। আলোর মতো প্রকাশিত হওয়া। আনারকলির বেলায়ও তাই হল। রংমহলে শাহজাদা সেলিমকে দেখে সে নিজের খুশি গোপন করতে পারল না। আসলে গোপন করতে চাইল না। সেলিম তার প্রিয়তম সেলিম আজ দেখবেন তার নাচ। এই আনন্দেই সেদিন সে তার জীবনের সেরা নাচ নাচল। শামাদানের প্রতিটি কাচে ঝলসে উঠল তার আত্মনিবেদনের আর্তি। সে আবেদন অতি স্পষ্ট। আকবর লক্ষ করলেন সেলিমের বিভোর মুখেও আত্মবিস্মৃত স্মিত হাসি। আনারকলি যেন ভুলে গিয়েছে বাদশাহের উপস্থিতি। আনারকলির দুঃসহ স্পর্ধায় আকবর জ্বলে উঠলেন ক্রোধে। একমাত্র তিনিই বুঝতে পারলেন দীপশিখার মতো উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আনারকলি কাকে দেখছে। কুশাঙ্কুরের মতো একটি অনুভূতি যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঈর্ষা। প্রেম কি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারে? এ যে তাঁর পরাজয়!

আনারকলির অপরাধ সামান্য নয়। সে ক্রীতদাসী, উপঢৌকন হিসেবে এসেছে। কি করে সে তার প্রভুকে প্রতারণা করল? আকবর তো শুধু দুনিয়ার মালিক নন, আনারকলিরও মালিক। তার দেহমনের ওপর একমাত্র তাঁর অধিকার। অথচ সে মন দিয়েছে সেলিমকে। এ যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। রঙমহলের শামাদানের বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলিতা আনারকলিকে কয়েদখানায় ছুঁড়ে ফেলা হল বাদশাহের গোপন আদেশে। কেউ জানল না কিছু। সমসাময়িক বিবরণে ছায়া পড়ল না আনারকলির বিচারের।

বিচার তাহলে হয়েছিল? হয়েছিল বইকি। ন্যায়পরায়ণতার গর্ব ছিল বাদশাহের। প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ রূপসী তরুণীটিকে নিয়ে আসা হল সর্বশক্তিমান বাদশাহের সামনে। 'অপরাধ স্বীকার কর পাপীয়সী।' হারেমের দারোগার কথায় গর্জে উঠল আনারকলি, 'আমি তো কোন অপরাধ করিনি।'

'চুপ কর হতভাগী। ক্ষমা চাও শাহানশাহের কাছে।'

আফগান নারীর উষ্ণ রক্তে টগবগ করে উঠল তেজ। মাথা উঁচু করেই বলল, 'আমি কোন অপরাধ করিনি. ক্ষমা চাইব কেন?'

'তোমার অপরাধ কি জান না? তোমার মালিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করনি?'

'না।'

'ভালোবাসনি শাহজাদাকে?'

'বেসেছি।'

'তুমি না শাহী হারেমের খাদ্দিমা।'

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেছিল আনারকলির মুখে, 'হ্যাঁ। আমি খাদিমা। আমার মালিকের প্রতি সব কর্তব্য আমি পালন করেছি। কিন্তু দেহের মালিক তো মনের মালিক নন। মন আমার নিজের। সে মন আমি যাকে খুশি দিতে পারি। ভালোবাসা অপরাধ নয়।'

বিচারের প্রহসনে আনারকলির শাস্তি ঘোষণা করলেন আকবর, ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যু। নিষ্ঠুর মৃত্যু। জীবন্ত কবর দেওয়া হবে আনারকলিকে। ক্ষমা চাইলে, কান্নাকাটি করলে শাস্তি হয়ত কিছুটা অন্যরকম হত। জীবন্ত কবরের বদলে বিষপানে মৃত্যু বা সেই রকম কিছু। আনারকলি সে চেষ্টা করেনি। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় সেও আকবরকে চিনতে পেরেছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আনারকলির বিচার হল নিভৃতে। জেনানা কয়েদখানা থেকেই গোপনে সে পৌঁছল তার বধ্যভূমিতে। সাধারণত এ জাতীয় অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হত লোকসমক্ষে। এমন ব্যতিক্রম কেন হল সেও এক রহস্য। পুরনো শহরের দক্ষিণে দুর্গের পশ্চিমদিকে ইরাবতীর তীরে রাতের অন্ধকারে খোঁড়া হল একটি কবর। কঠিন পাথরের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হারিয়ে গেল একটি অম্লান কুসুম। আকবর লাহোর ছেড়ে চলে যান ১৮৯৮ সালের ছয় নভেম্বর। লাহোরে আর তিনি ফিরে আসেননি। লক্ষ করবার বিষয় হল, এবার তাঁর সঙ্গী হিসাবে তিনি নিলেন না তাঁর বড় আদরের শেখুবাবা অর্থাৎ সেলিমকে।

আনারকলিকে যখন কবর দিয়ে হত্যা করা হল তখন তিনি কি সেলিম লাহোরেই ছিলেন? হয়ত ছিলেন। হয়ত ছিলেন না। যুবক শাহজাদার জীবন তো সুরা, নারী, পুত্র-কন্যা, শিকার, কবিতা নিয়ে টইটুম্বুর। পিতার হারেমে গোপনে কি ঘটছে তখনই তা জানা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার ছোটখাট ঝামেলা সামলাতে তাঁকে যেমন বারবার পঞ্জাব থেকে কাশ্মীরে যেতে হত, এসময়ও হয়ত তিনি কোথাও গিয়েছিলেন। দিন কয়েক পরে ফিরে আনারকলির খোঁজ পেতে পেতেই কেটে গিয়েছে আরও কটা দিন। শেষে খবর পেলেন যখন, ধরে নিই শেখ ফরিদের সংবাদদাতার সাহায্যে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তবু ছুটে এলেন সেই নির্জন প্রান্তরে। শাহজাদার চোখের জল ঝরে পড়ে রুক্ষ শ্রীহীন পাথরে।

শেখ ফরিদ এসে তাঁকে নীরবে সেলাম জানালে সেলিম তাঁকে বললেন, 'এমন অসুন্দর পরিবেশে তাকে ফেলে যেতে পারি না। এখানকার সমস্ত জমিতে একটা বাগান করবার আদেশ দিলাম।'

শেখ ফরিদ বললেন, 'আপনার হুকুম তামিল হতে সময় লাগবে না।'

'আর এই কবরের ওপর তৈরি করবে এক ইমারত।'

শেখ ফরিদ সতর্ক হয়ে বলেন, 'মাফ করবেন শাহজাদা। যদি বাদশাহ হঠাৎ জানতে চান...'

বিষণ্ণ সেলিম সেই মুহূর্তে ইমারত গড়ার কথা ভাবার অসুবিধেটুকু বুঝতে পারেন। বলেন, 'বেশ। ইমারতের কাজ পরে হবে আগে এখানে বসাও কালো পাথরের স্মৃতিফলক।' কালো মর্মর পাথরের স্মৃতিফলকে রইল খোদার ৯৯ নাম ও আরবি ভাষায় লেখা এক প্রেমিকের কাতর আর্তি :

আর একবার যদি প্রিয়তমার মুখখানি দেখতে পেতাম, তাহলে, হে আমার সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকতাম।

তার নীচে লেখা হল, 'অনেক ভালোবাসার সেলিম, আকবরের পুত্র।' বলা বাহুল্য

কবিতাটি জাহাঙ্গিরেরই লেখা, না তখনও তিনি সম্রাট হননি। চতুষ্কোণ বাগানটিতে শেখ ফরিদ একটি সুন্দর মসজিদ করে দিয়েছিলেন নিজের উদ্যোগে।

ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে এই সময় থেকে কোন অজ্ঞাত কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছিল। কি এমন ঘটেছিল? যে পুত্রের জন্মোপলক্ষে আকবর আগ্রা থেকে আজমির পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, সেই পুত্রের প্রতি 'সম্রাট পিতার সেই সুমহান আবেগ, অনুরাগ পুরোপুরি তিক্ততায় পর্যবসিত হয়।' এ উক্তি স্বয়ং জাহাঙ্গিরের। সেলিম নিজেও সুপুত্রের কাজ করেননি। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেনা সাজিয়ে আগ্রা দখল করতে চেষ্টা করেছিলেন। দুর্গদ্বার বন্ধ করে দেওয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন এলাহাবাদে। ওরছার বীরসিংহের সাহায্যে হত্যা করিয়েছিলেন পিতার পরম সুহৃদ আবুল ফজলকে। প্রবাদ, আবুল ফজলকে হত্যা করা হয়েছিল জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে। এই পৈশাচিক হত্যা যেন আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেবার মতোই অমানবিক। সেলিম জানতেন আবুল ফজলই তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটের মন বিষিয়ে তুলেছেন। এর আড়ালে যা ছিল, পরম সুহৃদকে হত্যা করে তিনি সর্বশক্তিমান পিতাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, প্রিয় বিচ্ছেদের বেতনা কত তীব্র।

আকবর শেষ পর্যন্ত কি জেনেছিলেন, কে তাঁর মিত্রহন্তা? জানা যায়নি। তবে সেলিমকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন। সর্বান্তকরণে। পিতা-পুত্রের মিলনও হয়েছিল। সম্রাট হবার বছর দশেক পরে, আনারকলিবাগে, লোকের মুখে মুখে তখন বাগানটা পরিচিত হয়ে উঠেছে, জাহাঙ্গির আদেশ দেন সমাধির ওপরে আট কোনা একটি মর্মরসৌধ নির্মাণের। আজও লাহোরে গেলে সেক্রেটারিয়েট ভবনের প্রাঙ্গণে চোখে পড়বে এই সমাধিসৌধটি। অপূর্ব তার গড়ন। বিষণ্ণ বেদনা যেন তার সর্বাঙ্গে জড়ানো। জাহাঙ্গিরের আদেশে লাহোর দুর্গেরও সংস্কার হয়েছিল। মাসুদ খান তৈরি করেছিলেন কয়েকটি বাড়ি ও বাগান। সিংহাসনে বসেই জাহাঙ্গির পুরস্কৃত করেছিলেন শেখ ফরিদকে পাঁচ হাজারি মনসব আর সাহিব-উস-সইফ-ওয়াল-কালাম উপাধি দিয়ে।

অনেকেই পরে আনারকলির অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কারণ সমাধিতে আনারকলির নাম নেই, নাম নেই জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরিতে। ঘটনার বিবরণ নেই কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের রচনায়। বিশেষ করে জাহাঙ্গিরের স্ত্রী সাহিব-ই-জামালের সঙ্গেও এক করে দেখতে চেয়েছেন আনারকলিকে, এমন ঐতিহাসিক বিরল নয়। সাহিব-ই-জামালের মৃত্যুও হয় কাছাকাছি সময়ে, ১৫৯৯ সালে। কিন্তু তাঁর সমাধি হলে কি প্রস্তর ফলকে থাকত না তাঁর নাম? হতে পারে, ইংরেজ বণিক উইলিয়াম ফিঞ্চ আনারকলির মৃত্যুর এক যুগ পরে এসে কিছু সত্যি কিছু মিথ্যা মেশানো গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু কিছু সত্য তো ছিল। বাগানটির নাম যে আনারকলিবাগ সে তো দারাশিকো যখন লাহোরে এসেছিলেন, তিনিও শুনেছিলেন। সমাধির কথাও তিনি লিখেছিলেন, যদিও সমাধি যে কার স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা তাঁর জানা ছিল না।

এক একবার মনে হয়, কেন জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে আনারকলির কথা লিখলেন না? বিংশ শতাব্দীতে পাঁচ ফুট মাটির নীচে যখন পাওয়া গেল আসল

সমাধিটির প্রস্তরলিপি; সেখানেও 'অনেক ভালোবাসার সেলিম' কেন লিখলেন না প্রিয়তমার নামটি? প্রশ্ন জাগে, তিনি কি জানতেন সেই মেয়েরটির নাম? হয়ত তাঁর মনেই ছিল না। হয়ত পিতার দেওয়া আনারকলি নামটি উল্লেখ করতে তাঁর ইচ্ছে হয়নি। আত্মজীবনীতে তিনি কি করেই বা লিখতেন সেই লজ্জার কথা। পিতার হারেমকন্যার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি। দুর্নিবার আবেগ কোন বাধা মানেনি। কিন্তু রাজা হয়ে সে কথা কি লেখা যায়? মানুষ সত্যিই কি সব কথা বলতে পারে? তা বলে প্রেম তো মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। আনারকলিও মিথ্যা হয়ে যায়নি।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের জীবনে অনেক বেগম, অনেক উপপত্নী। জগতের আলো নূরজাহান, খসরুর মা শাহবেগম, খুরমের মা জগত গোঁসাই, পরভেজের মা সাহিব-ই-জামাল, বিহার বানুর জন্মদাত্রী করমসী বেগম ছাড়াও উপপত্নীদের উপস্থিতি অসংখ্যবার। অথচ কেউ কোনদিন আনারকলিকে অতিক্রম করেননি। সেলিম আর আনারকলির প্রেমই কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে আছে। পথ বদল করে ইরাবতী নদী সরে গিয়েছে সৌধের পাশ থেকে। যেন সযত্নে ভাঙন এড়াতে। শত শত বছর পরেও সে শোনাচ্ছে সেলিম আর আনারকলির কথা।

বাজ বাহাদুর ও রূপমতী

ইতিহাসে বাজ বাহাদুর ও রূপমতী দুজনেই স্থান পেয়েছেন। যদিও বাজের মতো সুলতান অনায়াসেই ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যেতে পারতেন আর রূপমতীর লেখা কবিতাগুলি না থাকলে তাঁকে কবিকল্পনা বলেই মনে হত। কিন্তু বাস্তবে কল্পনায় মেশা রূপমতী আজও এক অসামান্যা প্রেমিকা আর তাঁকে ভালোবেসে তাঁর সঙ্গেই বেঁচে আছেন মান্ডুর শেষ সুলতান সুরসাধক বাজ বাহাদুর। শুধু বাজ বাহাদুরকে নয়, মান্ডুকেও রূপমতী অমর করে গিয়েছেন তাঁর কবিতায় :

চিত চন্দেরি মন মালোয়া
হিয়া হিড়োতি ম্যায়।
রনতভয়ো মেঁ শেজ বিছাওয়া
শোয়া মান্ডুর ম্যায়।

এ তো রূপমতীর শেষ ইচ্ছার কথা। আগে শুরুর কথা হোক।

বিন্ধ্য পর্বতের সীমান্তবর্তী যে হরিৎ উপত্যকাটি আজও সকলের মন কাড়ে, চোখ জুড়োয় সেই রূপসী উপত্যকার রানি ছিলেন রূপমতী। পাঁচশ বছর ধরে মান্ডুর ওপর দিয়ে কম ঝড় জল বয়ে যায়নি তবু এখনও মান্ডু রূপমতীর দেশ। জাহাঙ্গির জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন মান্ডুতে, নুরজাহানের প্রিয় শহর ছিল মান্ডু। তবু মান্ডুর স্থানীয় মানুষের কাছে মান্ডু শুধুমাত্র রূপমতী ও বাজ বাহাদুরের দেশ। যাঁদের নিয়ে চারণ বেঁধেছেন ছড়া, ভাট গেয়েছেন প্রশস্তি। রাজস্থানের চিত্রকর এঁকেছেন তাঁদের অভিসারের ছবি, কাংড়ার শিল্পীর কলমে ধরা পড়েছে তাঁদের প্রমোদ ভ্রমণের খণ্ডচিত্র। মুর্শিদাবাদের শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে তাঁদের নৈশ বিহার। মুঘলচিত্রে তাঁদের প্রকৃতিপ্রেম। বহু শিল্পী রাগরাগিণীর ছবি আঁকতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত এঁকে ফেলেছেন প্রেমিকযুগলকে। সব চিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু সব কল্পনার ওপারে তো তাঁরাই ছিলেন। ইতিহাস যেখানে অস্পষ্ট, কিংবদন্তি সেখানে রঙে-রেখায় সম্পূর্ণ।

নর্মদার তীরে সারঙ্গপুর সংলগ্ন সুলতানের মৃগয়াক্ষেত্র। খুব কমই আসেন তাঁরা সেখানে। অদূরেই ধরমপুর দুর্গ, একেবারে নিরালা নয় বলে পশুর সংখ্যাও কম। নদীতে স্নান সেরে দুর্গাধিপের কন্যার হঠাৎ কি খেয়াল হল বনের পথ ধরলেন সখীদের নিয়ে। নির্জন বনপথ, মাঝে মাঝে আলো আঁধারির ছায়াবীথি। উৎফুল্ল কণ্ঠে রূপমতী গান গেয়ে উঠলেন। থানসিং রাঠোরের মেয়ের কণ্ঠে সাতটি সুর পোশা পাখির মতো খেলা করে। যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। অবশ্য শুনবেই বা কে? আত্মীয়-

স্বজন, সঙ্গীতশিক্ষক সকলেই প্রশংসা করেন। রূপমতী শুধু তান বিস্তার করেন না, কথার পিঠে কথা সাজিয়ে মাত্র পনের বছর বয়সেই কবিতা শুনিয়েছেন সখীদের। সেই গানই গাইছিলেন গলা ছেড়ে। তিনি জানতেন না সেদিন সেই বনেই শিকারে এসেছেন বায়াজিদ বা মালিক বায়াজিদ। মালোয়ার সুলতান শুজাত খানের জ্যেষ্ঠপুত্র। খাপছাড়া তাঁর স্বভাব। সুলতানের ছেলে কিন্তু সারাক্ষণ মেতে আছেন সঙ্গীত সাধনায়। শুধু যে গান শুনতে ভালোবাসেন তা নয়, গান গাইতেও ভালোবাসেন। শুজাত খান বিরক্ত হয়ে তাঁকে সারংপুরের জায়গির দেখাশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই মালিক বায়াজিদই এসেছেন মৃগয়ায়। হঠাৎ তাঁর কানে গেল মধুর সুরের রেশ। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শুনলেন বায়াজিদ। সঙ্গীতই তাঁর ধ্যান জ্ঞান, কই এমন গান তো তিনি আগে কখনও শোনেননি। এমন মধুর কণ্ঠ, নিখুঁত তাল-লয় বোধসম্পন্ন সুরজ্ঞান। অথচ গায়িকা গাইছে খালি গলায়, অরণ্যের মধ্যে। এ কী স্বপ্ন? না, মায়া? সুর লক্ষ করে এগোলেন তিনি বনপথে, একা।

আলো ছায়া আর বুনো লতা আপনিই যেন তোরণ রচনা করে নিয়েছে। ঠিক তার নীচে, বায়াজিদ দেখলেন এক অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আর গান নেই। মৃদু পদশব্দ শুনেই গান থামিয়ে পথের দিকে তাকিয়েছিলেন রূপমতী। অত্যন্ত রূপবান রাজপোশাক পরা বায়াজিদকে দেখে তিনি একটু অবাক হলেন। এ বনে তো কেউ আসে না, অবাক বায়াজিদও। ঘন সবুজের মাঝখানে পীতবসনা মেয়েটি যেন মানুষ নয়, একটি সূর্যমুখী ফুল, এখন তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। দুজনেরই চোখে পলক পড়ে না কিছুক্ষণ। তারপরই মেয়েটি চান্দেরি মসলিনের দীর্ঘ ঘোমটা টেনে মিশে যায় সখীদের সঙ্গে। আলাদা করে তাকে চিনতে পারেন না বায়াজিদ। প্রশ্ন করেন, 'কে তোমরা?'

কোন একজন উত্তর দেয়, 'আমরা নদীতে স্নান করতে এসেছিলাম।'

'এই বাগানে এসেছ কেন?'

'আমরা জানতাম না আপনি এখানে আছেন।'

'ওটা তো আমার কথার উত্তর হল না', বেশ ভারিক্কি চালে বলেন বায়াজিদ। তাঁর খুব মজা লাগছিল। বললেন, 'তোমরা এখানে এসেছিলে কেন?'

ওদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়া মেয়েটি এবার রুখে উঠল, 'সে কথাই বা আপনাকে বলতে যাব কেন? আপনি কি সুলতান?'

গলা শুনে বায়াজিদের মনে হল এই মেয়েটিই গান গাইছিল। তাঁর কানে স্বরের সূক্ষ্ম ওঠাপড়া ধরা পড়ে। বললেন, 'না আমি সুলতান নই তবে তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সেখানে হাজির করতে পারি।'

সখীদের মধ্যে একটা ভয়ের তরঙ্গ ছায়া ফেলে গেল। দলনেত্রী ভয় পেল না, বলল, 'আমরা এবার ফিরতে চাই। নর্মদামায়ির কৃপায় আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরব। চল।'

বায়াজিদ বললেন, 'তোমাদের যেতে দিতে পারি। যদি আমাকে একটা গান শোনাও। তোমাদের মধ্যে কে গান জানো?'

মেয়েরা সমস্বরে বলল, 'আমরা সবাই।'

'তাই নাকি? তা আমাকে একটু শোনাবে না।'

'আপনার পরিচয় তো আমরা এখনও পাইনি।'

'আমি মালিক বায়াজিদ, সারংপুরের জায়গিরদার।'

মেয়েরা যেন ভয় পেয়ে গেল। শুধু সেই সাহসিকা বলল, 'আমরা শুনেছি আপনিও সুগায়ক।'

বায়াজিদ ভাবতে পারেননি তাঁর সঙ্গীতপ্রীতির কথা সারংপুরের হিন্দু মেয়েরাও শুনেছে। রোমাঞ্চিত হলেন। বললেন, 'কে বলেছেন আমার কথা?'

'শেখ উমর, আমার গুরুজি।' মেয়েটি নিঃসংশয়ে বলে, 'তিনিই বলেছেন আপনার কথা, আপনার সুকণ্ঠের কথা।'

বায়াজিদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি গান শুনেছেন শেখ উমরের, অতি উচ্চ মার্গের শিল্পী। তাঁর শিষ্যা এই মেয়েটি। তাই এমন কোকিলকণ্ঠী। বললেন, 'আমি মহম্মদ আদিলের কাছে নাড়া বেঁধেছি। এই বাগানে আপনাদের যখন খুশি আসবেন। কাউকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। সঙ্গীতসাধকদের জন্য আমার বাগান, প্রাসাদ সবই খোলা থাকে।'

মেয়েটি নিজেই পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম রূপমতী। আমি ধরমপুরের দুর্গাধিপ থানসিং রাঠোরের মেয়ে।'

বায়াজিদ সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। রূপমতী সখীদের নিয়ে বিদায় নিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে কেন কে জানে বায়াজিদের মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

গজ গমনে রূপমতী বন পেরিয়ে দুর্গের দিকে চলে গেলেও তাঁর মন পড়ে রইল নবাগত জায়গিরদারের কাছে। গান শোনেননি কোনদিন বায়াজিদের কিন্তু গুরুজি তো মিথ্যা বলবেন না। শেখ উমর বলেন, বায়াজিদের কণ্ঠস্বর সজীব আর ভরাট, অতি উঁচু এবং তীক্ষ্ণ। বলেন, বায়াজিদ যদি চর্চা রাখে তার মতো সুকণ্ঠের অধিকারী গায়ক হবে দুর্লভ। সেই থেকে রূপমতীর মনে সবার অলক্ষ্যে বায়াজিদের যাওয়া আসা। সেই স্বপ্নে দেখা পুরুষকে আজ দেখলেন রূপমতী। তাঁর কল্পনার চেয়েও সুন্দর। ওর গান একবার শুনতেই হবে। সেই সঙ্গে মনের গভীরে রক্ত চলকে ওঠে, বায়াজিদকেও শোনাতে হবে তাঁর গান। গুরুজি তো বলেন, রূপমতীর তুলনা মেলা ভার।

ইতিহাসে যদিও রূপমতী স্থান পেয়েছেন কিন্তু তাঁর পরিচয় কোথাও স্পষ্ট নয়। ভাট যে কথা বলে চারণ সে কথা বলে না আবার তাদের কথার সঙ্গে মেলে না বিদেশি পর্যটক আহমদ উল-উমরির কথা। রূপমতী ছিলেন মা-বাবার আদরের মেয়ে। সেজন্য রাজপুত রাওলার অনেক নিয়ম শিথিল হয়েছিল। শৈশব থেকেই মেয়ে পরম ভক্তিমতী। নর্মদার পূজা করে। নর্মদাকে না দেখে থাকতে পারে না। নদীকে দেখতে দেখতেই তিনি গান করেন, কবিতা লেখেন। গানের প্রতি মেয়ের অনুরাগ দেখে পিতা থাকতে পারেননি, শেখ উমরের কাছে গান শেখার অনুমতি দিয়েছিলেন সানন্দে।

সকলে নয়, কেউ কেউ বলে, থানসিং মেয়েকে গান শেখার অনুমতি দিয়েছিলেন রূপমতী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসার পরে। তিনি খুব ধুমধাম করেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন চান্দেরির রাজার সঙ্গে। পাহাড়ঘেরা চান্দেরি দুর্গে বুন্দেলা রাজপুতের ঘরে গিয়েই বালিকাবধূ খঞ্জন পাখির মতো চোখ দুটি তুলে বলেছিল, 'কই নর্মদামায়ি কই?

আমি নর্মদায় স্নান করতে যাব।' দাসীরা সোনার খেলনা দিয়ে ভোলাতে চায় কিন্তু রূপমতী অন্ন জল ত্যাগ করে শুয়ে রইলেন। না, যে দেশে নর্মদা নেই সে দেশে তিনি থাকবেন না। এ কেমন দেশ? বিয়ের আনন্দ বিষাদে বদলে গেল। শ্বশুরবাড়ির সবাই বিরক্ত হলেন। কেউ বললেন, থাকুক উপোস করে, আপনি গুমোর ভাঙবে। কেউ বললেন, বধূহত্যার পাপ না লাগে। শেষে রাজগুরুর আদেশে গাঁটছড়ার বাঁধন আলগা করে চান্দেরিরাজ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন ধরমপুরে। দুপক্ষই হয়ত ভেবেছিলেন দ্বিরাগমনের সময়ে বড় হয়ে রূপমতী নিজেই বুঝবেন তাঁর দাবির অযৌক্তিকতা। চান্দেরি থেকে কখনও নর্মদা দেখা যায়? সত্যি মিথ্যা যা-ই হোক, রূপমতীর জীবনে চান্দেরিরাজ আর কখনও ফিরে আসেননি।

রূপমতীর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতসাধনায় প্রথম পুরুষের ছায়া পড়ল। সেও মালিক বায়াজিদের, সঙ্গীত তাঁরও সাধনার ধন। নর্মদাবেষ্টিত সারঙ্গপুরের বাগানে কি আবার দেখা হল দুই শিল্পীর? না কি জাদু রায়ের প্রমোদ উদ্যানে? জাদু রায় মালিক বায়াজিদের বন্ধু। তাঁর বাড়িতেই নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন রূপমতী। সঙ্গীতরসিক বন্ধুকে চমকে দেবার জন্য জাদু রায় প্রস্তাব করলেন এক কিন্নরকণ্ঠীর গান শোনাবেন তিনি, বিনিময়ে তাঁকেও শোনাতে হবে তাঁর দরাজ কণ্ঠের আলাপ। বায়াজিদ এক কথায় রাজি। রূপমতী শোনালেন গান পরদার আড়াল থেকে। বায়াজিদ অভিভূত হয়ে গেলেন। এই তো সেই কণ্ঠ। বায়াজিদের মনে হল, রূপমতীর জন্য প্রাণ, মান, সিংহাসন সব বিসর্জন দেওয়া যায়।

রূপমতীর গান শেষ হল। এবার বায়াজিদের পালা। বায়াজিদ ধরলেন বিলাবল। তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল বিপ্রলম্ভ-নায়িকার ভাব। বিলাবলের রূপ বর্ণনায় আছে, তার কোমল শরীর, বাসকসজ্জাবেশ, অগুরুসিক্ত কৃষ্ণ কেশদাম, ললাটে তিলক, নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল অথচ ভাবাবিষ্ট। রূপমতীর মনে হল, তিনি বিলাবলের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করলেন বায়াজিদকে।

জাদু রায় বায়াজিদের গানের উচ্চ প্রশংসা করলে বায়াজিদ বললেন, 'বন্ধু, একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও সঙ্গীতের দেবীর সঙ্গে।'

জাদু রায় চমকে উঠলেন। তারপর রূপমতীর অনুমতি চাইলেন। সখী হেসে বলল, 'কে অনুমতি দেবে? সখী যে বিলাবলের মতোই নায়কের প্রতীক্ষায় ভাবাবিষ্ট।'

অনুমতি পেলেন বায়াজিদ। নির্জন উদ্যানে সাক্ষাৎ হল। বায়াজিদ বললেন, 'আমরা পরস্পরের অপরিচিত নই।'

রূপমতী বললেন, 'আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের দেখা হয়েছিল কিন্তু সেদিন আপনার পরিচয় পাইনি।'

বিস্মিত বায়াজিদ বললেন, 'আমি সেদিনও আমার পরিচয় দিয়েছিলাম।'

'সে পরিচয় নয়। আপনার কণ্ঠের কথা সেদিন জানতাম, আজ অনুভব করেছি।'

'আপনি যেন মূর্তিমতী রাগিণী। মনে হচ্ছে আমার সাধনা শেষ হয়েছে। তাই আপনার দেখা পেলাম।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

এক অনির্বচনীয় মাধুরী তাঁদের ঘিরে রইল। ওঁরা বাগানের ফুল দেখলেন, পাখি দেখলেন, জলে পদ্ম দেখলেন, ভ্রমর দেখলেন। সূর্য যে কখন পাটে বসলেন সে কথাও মনে রইল না। ফেরার সময় হল। দুজনেরই মন তখন দুজনের কাছে বাঁধা পড়েছে। সখীরা ঘিরে ধরলেন রূপমতীকে। সকলেরই মুখে হাসি, 'কি কথা কইলে তোমরা এতক্ষণ?'

'কথা?' রূপমতী যেন চমকে ওঠেন, 'কই কথা তো হয়নি।'

'আহা, তাহলে এতক্ষণ কাটালে কি করে? গান গেয়ে?'

'গান? তাই হবে হয়ত। সে গান বুঝি তোমরা শুনতে পাওনি?'

সখীরা হেসে ওঠেন। অশ্রুত সঙ্গীতের নির্ঝর বয়ে যাচ্ছে প্রেমিকযুগলের মনে। তার হদিশ তাঁরা কি করে পাবেন?

বায়াজিদ ফিরে গেলেন মালবে। শুজাত খানের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। পিতার সিংহাসনে বসলেন। তাঁর নতুন নাম হল বাজ বাহাদুর। কেন তিনি এ নামটি বেছে নিলেন কেউ জানে না। মান্ডুতে থাকলেও মন তাঁর পড়েছিল সারঙ্গপুরে, রূপমতীর কাছে। বন্ধু জাদু রায়কে ডেকে তাঁকে উপহার দিলেন সারঙ্গপুর জায়গির। বললেন, 'আমি রূপমতীকে চাই।'

জাদু রায় প্রমাদ গণলেন। রাজপুত সর্দার কি মেয়ে দেবেন আফগানের হাতে? তাছাড়া স্বাধীনচেতা রূপমতীই কি রাজি হবেন? নর্মদার পরমভক্ত রূপমতী। বললেন, 'রূপমতী নিজে না চাইলে তাঁকে কোথাও পাঠানো যাবে না।'

'রূপমতীর মন আমি জানি। সঙ্গীতই তাঁর জীবন। আমারও তাই। সঙ্গীতকে ভালোবাসলে তিনি আমাকে ফেরাতে পারবেন না।'

তবু সারঙ্গপুরে পুনরায় সাক্ষাতের আয়োজন হয়। মধ্যে কয়েক বছর কেটে গিয়েছে, রূপমতী আরও পরিণত হয়েছেন। বাজ বাহাদুর তাঁকে বিয়ে করতে চান শুনে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য কিন্তু নর্মদামায়িকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। আপনার মান্ডুতে নর্মদা নেই।'

নর্মদা না থাকুক মান্ডুতে রয়েছে মিষ্টি জলের সরোবর, লোকে বলে রেবাকুন্ড, তার সঙ্গে নদীর যোগ ঘটাবেন বাজ, রূপমতীকে তাঁর চাই। রূপমতী হাসেন, 'আমি সেইদিনের জন্য বসে থাকব।'

রূপমতীর মন বোঝা গেল। বাজ বাহাদুর নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু এবার কথাটা গোপন রইল না। থানসিং রাঠোর শুনে চমকে উঠলেন। এতদূর স্পর্ধা। রাজপুত কুলে কালি দিয়ে রূপমতীকে নিয়ে যাবে মান্ডুতে। বাজ বাহাদুরকে বাধা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। সামান্য দুর্গরক্ষক তিনি। বিষপান করে কুলের মর্যাদা রাখতে পারবে না কুলনাশিনী রূপমতী? এমনটি হবে জানলে কি মেয়েকে তিনি চান্দেরি না পাঠিয়ে নিজের ঘরে রাখতেন? হায়, মেয়েটা তখনি কেন নর্মদা না দেখে কেঁদে কেটে শুকিয়ে মরে গেল না। মেয়ের মা কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন থানসিংয়ের পায়ে। 'রক্ষা কর। প্রাণ ভিক্ষা দাও। এবার তাকে রাওলার বাইরে পা রাখতে দেব না।' কঠিন হয়ে থানসিং বলেন, 'বড় দেরি হয়ে গেছে। এ কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। যাও আফিমের সঙ্গে

কুসুমফুলের রস মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করগে যাও।' মেয়ের মা বললেন, 'অন্তত একটা রাতের জন্যে তার প্রাণ ভিক্ষা দাও। তার মুখটা শেষবারের মতো ভালো করে দেখি।' আপত্তি করলেন না থানসিং। তাঁর হৃদয়ও তো পাষাণ নয়।

দুঃসংবাদ হাওয়ায় ভাসে। রূপমতীও পিতার আদেশ শুনতে পেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নর্মদাকে স্মরণ করে জ্ঞান হারালেন। অকালে আত্মঘাতী হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই। বাজ বাহাদুরের ভালোবাসা তাঁকে ক্রমশই পার্থিব জীবনের দিকে টানছিল। হঠাৎ এই নিদারুণ সংবাদ। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, স্বয়ং নর্মদা এসেছেন তাঁকে অভয় দিতে। বলছেন, রেবাকুণ্ডের সঙ্গে নর্মদাবারির যোগ ঘটেছে। আজ থেকে রেবার জলও নর্মদার মতো পবিত্র। দ্বিধার কোন কারণ নেই, বাজ বাহাদুরের সঙ্গে রূপমতীর মিলন সুখের হবে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন বাজ বাহাদুর, রাত্রের মধ্যেই রূপমতীকে উদ্ধার না করতে পারলে তাঁর প্রাণ সংশয়। সম্ভবত সারঙ্গপুরেই তিনি ছিলেন। পুরবাসিনীদের ইঙ্গিত পেয়ে দুর্গ আক্রমণ করে নিয়ে গেলেন রূপমতীকে।

রূপমতী এলেন মাণ্ডুতে। কেউ বলেন, তিনি বাজ বাহাদুরের হিন্দু মহিষী, কেউ বলে বাজ বাহদুরের প্রিয়তমা সঙ্গিনী। দুটি কথাই সত্যি। দুই বিরহী চিত্তের মিলন ঘটাল সঙ্গীত। মালোয়ার সুলতানি হারেমে প্রবেশ করলেন না রূপমতী। তিনি থাকতেন দুর্গের অপর প্রান্তে নির্জন বাগান ঘেরা বাজ বাহাদুর প্রাসাদে। এ নাম আজকের দেওয়া। মহলটির নির্মাতাও বাজ বাহাদুর নন, তাঁর পূর্ববর্তী কোন এক নাসির খান। সেনানিবাস হিসাবেই তিনি বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নির্জনতা উপভোগের পক্ষে বাড়িটি আদর্শ বলে রূপমতীকে এখানেই নিয়ে এলেন বাজ। সর্বোপরি এখান থেকেই দেখা যায় নিমার উপত্যকা পেরিয়ে রুপোলি রেখার মতো নর্মদাকে। পাশেই রেবা কুণ্ড।

প্রাসাদের খোলা ছাদে রূপমতীকে নিয়ে গেলেন বাজ বাহাদুর। বললেন, 'এই যে দুটি চবুতরা দেখছ, এর একটি আমার আর একটি তোমার। আমরা এখানে বসে গান গাইব।'

'সেই ভালো। আমাদের দেহের আকর্ষণ সঙ্গীতকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। সাধনার সময় অন্য কোন দিকে মন দিতে নেই।'

দুজনেই হেসে ওঠেন। সুখের হাসি। দুজনেরই মনে হয়, এত সুখ আর কোথাও নেই। এক চবুতরায় বসে রূপমতী যদি ধরেন কল্যাণ, বাজ শুরু করেন বিলাবল, দুটির মিশ্রণে জন্ম নেয় নতুন রাগ ভূপকল্যাণ। কবিতাও লিখতেন। দুজনেই। সব কবিতারই মূল সুর প্রেম।

আউর ধন যাচতা হ্যায় রী মেরে
তো ধন পিয়ারে কে প্রীত পুঁজি...
দিন দিন বাড়ে সবায়ো দুনো বাড়ে
ঘটে না এক গুনজি।

অন্যরা আরও ধন চায়, আমার ধনের পুঁজি তো শুধু প্রেম, দিনে দিনে শুধু বাড়ে, দ্বিগুণ হয়, ঘটে না এক রতি।

দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ে রূপমতীর। তিনি কবি, অসামান্যা শিল্পী। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতে, সঙ্গীত জগতে বাজ বাহাদুর ও তাঁর রূপসী জীবনসঙ্গিনী রূপমতী চিরকালের জন্য মুকুটহীন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা লাভ করবেন। অথচ কটি দিনই বা তাঁরা জগৎ-সংসার সবকিছু ভুলে সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরেছিলেন? মাত্র ছটি বছর। দেখতে দেখতে কেটে গেল যেন। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল রূপমতীর নাম। সব দেখে বাজ বাহাদুর হেসে বলেন, 'প্রিয়তমা, সবাই তোমাকে চায়, তোমাকে ভালোবাসে। কোন দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?'

রূপমতী হেসে ফেলেন। গুনগুন করে স্বরচিত গান শোনান তাঁর প্রিয়তমকে : বাজ বাহাদুরকে স্নেহ পর নিছাওর করুঙ্গি জী আউর তন—বাজ বাহাদুরের ভালোবাসায় উৎসর্গ করব দেহ মন—এই ছিল রূপমতীর শেষ কথা।

বাজ বাহাদুর রূপমতীর মতো প্রশংসা কুড়োননি কেন না তিনি দেশের শাসক। দেশের ভালো মন্দ কিছুই তিনি দেখতেন না। ধনীদের যথেচ্ছাচার দরিদ্রের গলার ফাঁস হয়ে উঠছিল ক্রমশ। সে সময়ে দিল্লির সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট আকবর। রাজ্যবিস্তার এবং সুশাসনের আগ্রহ তো ছিলই সেই সঙ্গে অসামান্য গায়িকা রূপমতীকে অধিকার করার গোপন বাসনাও তাঁর মনে কচি পাতা মেলছিল। তিনি স্থির করলেন, মালব আক্রমণ করবেন। একটি দেশ আক্রমণ ও অধিকার করার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। তিনি আধম খান, পীর মুহম্মদ খান, সাদিক খান, কিয়া খান জঙ্গ, আবদুল্লা খান উমবেক, শাহ মুহম্মদ কান্দাহারি ও কয়েকজন আমিরকে মালব আক্রমণের আদেশ দিলেন। এতজনকে আদেশ দেওয়ার কারণ মালব প্রাকৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত। পাঁচ-ছ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা এগোলেন মাণ্ডুর দিকে। খুব সহজেই তাঁরা পৌঁছলেন দশ ক্রোশের মধ্যে। বাজ বাহাদুর তখনও কোন খবর পাননি। কি করেই বা পাবেন? আমির ওমরাহেরা তাঁকে পছন্দ করেন না। দরিদ্র মানুষ তাঁর কাছে যেতে পারে না। যদিও মাণ্ডু দুর্গ অতি সুরক্ষিত। সেজন্য আধম খান স্থির করলেন, তিনি নিজে দুর্গ আক্রমণ না করে বাজকে প্রলুব্ধ করবেন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে। তিনি দুর্গের বাইরে বসে রইলেন।

এবার খবর পেলেন বাজ বাহাদুর। সুমধুর আত্মবিস্মৃতির কাল শেষ। খাড়া পাহাড়ের একেবারে কিনারা ঘেঁষে রয়েছে রূপমতী মঞ্জিল। বাজ বাহাদুর এলেন বিদায় নিতে। থেমে গেল মালবকৌশিকের গুঞ্জন। কোলের সখী বীণা ফেলে রূপমতী জড়িয়ে ধরলেন বাজকে। সজল চোখে বাজ তাঁর মুখখানি তুলে ধরলেন। আজও রূপমতী সেই প্রথম দেখার দিনটির মতোই রূপসী। প্রথম আত্মনিবেদনের মতোই বিহ্বলা। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আর যদি ফিরে না আসি?'

'অমন কথা বলতে নেই।'

'মনে থাকবে আমায়?'

'তোমার ভালোবাসায় উৎসর্গ করব আমার দেহ মন 'বাজ বাহাদুরকে স্নেহ পর নিছাওর করুঙ্গি জী আউর তন'।'

বাজ বাহাদুর যুদ্ধে চলে গেলেন। যাবার আগে বিশ্বস্ত প্রাসাদরক্ষী খোজা

আবদুলকে বললেন, 'যদি খবর পাও যুদ্ধে আমি হেরে গিয়েছি তাহলে দুর্গের পতনের আগে হারেমের সব্বাইকে হত্যা করবে।' আবদুল নত শিরে জানাল, সে হুকুম তামিল করবে। সেকালে দুর্গ লুণ্ঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকত নারীর লাঞ্ছনা। রাজপুত নারীরা জহরব্রত করতেন, মুসলিম নারীরা সর্বদা সঙ্গে বিষ রাখতেন। তৃতীয় সম্ভাবনাও যে ছিল, বাজ বাহাদুরের আচরণেই তা বোঝা যায়।

যুদ্ধের ফলাফল একরকম জানাই ছিল। বাজ বাহাদুর হেরে গেলেন তাঁর ওমরাহদের বিশ্বাসঘাকতকায়। আফগান আমিররাও বিপক্ষে গেলে বাজ বাহাদুর তাঁর অতি প্রিয় মাণ্ডু ছেড়ে, প্রিয়তমা রূপমতীকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন খানদেশ ও বুরহানপুরের দিকে, কেউ বলেন চিতোরের দিকে। রূপমতীর বীণার তাঁর ছিঁড়ে গেল। মাণ্ডুর আকাশে বাতাসে তখন নট রাগের একটাই সুর গুমরে ফেরে 'রূপমতী কহে হাম দুখিয়া ভৈয়িঁ বিন রে বাহাদুর বাজ'।

আধম খান বাজ বাহাদুরের হারেম ও রাজকোষ হস্তগত করলেন। কিন্তু কোথায় রূপমতী? যেসুইট পাদ্রীর বিবরণে আছে 'মালবের ক্লিওপেট্রা' অপূর্ব সুন্দরী, অসমসাহসিনী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী বাজ বাহাদুরের রানির কথা। বাজের পলায়ন সংবাদ পেয়েই তিনি স্থির করেন মাণ্ডু থেকে পালিয়ে যাবেন। প্রথমে যেমন করে হোক সারঙ্গপুরে তারপর বাজের কাছে। ফুলওয়ালির ছদ্মবেশে তিনি বেরোলেন। পুণ্যার্থীদের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে পৌঁছলেন নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরের কাছে। তিনি জানতেন না তাঁকে ভীষণভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিল খোজা আবদুল। বাজের আদেশে সে হারেমকন্যাদের হত্যা করতে পেরেছিল কি না তা জানা না গেলেও সে জানত, রূপমতী বেঁচে আছেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দরী প্রেয়সীকে হত্যা করবার হুকুম বাজ তাকে দেননি ঠিকই কিন্তু সে তার প্রভুর আদেশ ভুলবে কেমন করে? প্রথমে সে রূপমতীকে খুঁজে পায়নি কেন না তিনি হারেমকন্যা হয়ে কোনদিনই জাহাজমহলে প্রবেশ করেননি। তাঁর ছিল নিজস্ব মহল, শহর থেকে দূরে। বাজ বাহাদুর, সঙ্গীত এবং নর্মদা—এই তিনটিই ছিল তাঁর ভুবন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবদুল সন্ধান পেল রূপমতীর। ফুলওয়ালির ছদ্মবেশে তিনি যখন আত্মগোপন করতে যাচ্ছেন তখনই আবদুল তাঁর উদ্দেশে ছুঁড়ে ছিল তীক্ষ্ণ খঞ্জরটি। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন রূপমতী, পালিয়ে যাওয়া আর হল না। মুঘল রক্ষীরা বন্দি করে তাঁকে তুলে নিয়ে এল মাণ্ডু দুর্গে।

আধম খান হাকিমদের পাঠালেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। যেমন করে হোক, যে কোন মূল্যে হোক রূপমতীকে বাঁচাতেই হবে। আধম খান রূপমতীকে পাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। মুঘল সাম্রাজ্যে নিয়ম ছিল, বিজিত দুর্গের হারেমকন্যা ও ধনসম্পত্তি বাদশাহের কাছে পাঠাতে হবে। সেটাই নিয়ম। রূপমতীর রূপমুগ্ধ আধম খান সম্রাটের কাছে যুদ্ধজয়ের বিবরণ পাঠিয়ে বসে রইলেন। হাকিমদের চেষ্টা বিফল হল না। রূপমতী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সে খবর অবশ্য আধম খান পেলেন না।

রূপমতীর জীবন পিপাসা অনন্ত কিন্তু বাজ বাহাদুর ছাড়া আর কাউকেই তিনি চান না। গোপনে চেষ্টা করতে লাগলেন বাজ বাহাদুরের খবর পাবার। উল উমরি

লিখেছেন, দিনের পর দিন আধম খান তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠান। অধৈর্য প্রেমিকের আকুতি। আর কতদিন তিনি অপেক্ষা করবেন? আসলে আধম খাঁও প্রেমে পড়েছিলেন রূপমতীর। তিনিও জানতেন, সেই আশ্চর্য সুন্দরী নিজে আত্মসমর্পণ না করলে তাঁকে জোর করে পাওয়া যায় না। রূপমতী অবশ্য আধম খানের কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি শুধু বলেন, 'বাজ বাহাদুরকে আমি সব কিছুই দিয়ে ফেলেছি, তোমায় দিতে পারি এমন কিছুই যে আমার বাকি নেই।'

দিনের পর দিন একই প্রার্থনা এবং একই উত্তর। রূপমতী বোঝেন আধম খান শীঘ্রই লুব্ধ হাত বাড়াবেন তাঁর দিকে। তার আগে বাজের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? অপরদিকে আধম খানের আচরণে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন সম্রাট আকবর। আধম তাঁর দুধ মা মাহম খানকার ছেলে। ধাত্রীর মুখ চেয়েই আধমকে তিনি সেনাপতির আসনে বসিয়েছেন। দিনে দিনে তার বদ স্বরূপ ফুটে বেরোচ্ছে। মালব জয়ের পরেও সম্রাটের কোষাগারে বা হারেমে কিছুই জমা পড়েনি। অথচ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রূপমতী রয়েছেন মাণ্ডুতে, রূপের চেয়েও তাঁর অনবদ্য সঙ্গীতের খ্যাতি সম্রাটকে চঞ্চল করে তুলেছে। তিনি স্থির করলেন, আর দেরি নয়, গোপনে নিজেই যাবেন মাণ্ডুতে। শোনা যায়, মাত্র ষোল দিনে আকবর তাঁর বাছা কিছু সৈন্য নিয়ে মাণ্ডুতে পৌঁছেছিলেন। মাহম খানকা এক পত্রবাহককে গোপনে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সম্রাট নাকি তারও আগে পৌঁছেছিলেন।

আধম খান সে খবর পাননি। তখন তিনিও নিজের ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন। তর্জন গর্জন করেই তিনি জানতে চাইলেন, 'রূপমতী কী চান?' উত্তর এল, বাজ বাহাদুরের সঙ্গে মিলনই আমার একমাত্র কাম্য। আধম খান বললেন, 'আমি বিজয়ী বীর কিন্তু তোমার হৃদয় এখনও জয় করা হয়নি। তোমার এক মুহূর্তের ভালোবাসার জন্য আমি সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারি। বাজ বাহাদুরকে ভুলে যাও। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।'

নীরবে চোখের জল ফেলে রূপমতী বললেন, 'আর তিনটি দিন সময় চাই।'

'বেশ। মনে থাকে যেন তিন দিন পরে আমি কোন আপত্তি শুনব না।'

ভাববার জন্য সময় চাইলেন রূপমতী কিন্তু ভাবনার আর কী-ই বা আছে। গোপন অনুসন্ধানের ফল হয়নি কিছু। বাজ বাহাদুর কোথায় আছেন কেউ জানে না। তিনি জীবিত না মৃত সে খবরও মেলে না। নানা রকম গুজব ছড়ায়। শোনা যায়, বাজ আর বেঁচে নেই। মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে নেন রূপমতী। তাঁর প্রিয়তমই যদি না থাকেন, তাহলে আর জীবনের প্রয়োজন কি? সব সুরই যদি হারিয়ে গেল তাহলে বেঁচে থেকেই বা কি হবে? শুনলেন, আধম খান প্রাসাদ সাজাতে নির্দেশ দিয়েছেন। সভাগায়ক রায়চাঁদকে হুকুম দিয়েছেন মিলনের গান গাইতে। সব শুনে হাসলেন রূপমতী। মূর্খ প্রেম কি তা-ই জানে না, জোর করে কি ভালোবাসা পাওয়া যায়? সখীদের বললেন, তাঁকে বধূর সাজে সাজিয়ে দিতে। সখীরা সাজালেন তাঁকে নববধূর মতো। সবাইকে বিদায় জানিয়ে কোলের সখী বীণাটি নিয়ে রূপমতী গিয়ে বসলেন বাসরের পুষ্পশয্যায়। খবর পাঠালেন আধম খানকে, তিনি প্রস্তুত। সব কিছু ফেলে

প্রমত্ত আধম খান ছুটে এলেন। দেখলেন, সাজানো বাসরে অপরূপা রূপমতী, সর্বাঙ্গে নববধূর সাজ, কোলের কাছে প্রিয় সখী বীণা—ঘুমিয়ে আছেন। হীরকচূর্ণ খেয়ে নিজের হাতে নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে রূপমতী এমন জায়গায় পালিয়ে গিয়েছেন যেখানে আধম খানের লোভী হাত যতই নিষ্ঠুর হোক কোনদিন পৌঁছবে না। আর্তনাদ করে উঠলেন আধম খান। একবার মনে হল টুকরো টুকরো করে ফেলেন ওই সুন্দর দেহটি। পরক্ষণেই মনে হল, ওকে ঘুমোতে দেওয়াই ভালো। আদেশ দিলেন, রূপমতীকে সারঙ্গপুরে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করতে। সেই তাঁর শেষ হুকুম দেওয়া। সম্রাট এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাণ্ডুর দরজায়। চমকে উঠেছিলেন আধম খান। তারপর সমস্ত সম্পদ, হারেমকন্যা ও বন্দি শিল্পীদের তুলে দেন আকবরের হাতে। একজনকে ছাড়া। রূপমতী তাঁর বজ্রমুষ্টি শিথিল করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আকবর। আহা, সেই অপরূপা নারীর কণ্ঠে সাতটা সুর সাতটা পোষা পাখির মতো খেলা করত, আর সেই কণ্ঠের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ঘটল না।

উজ্জয়িনী থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে বর্তমান দেওয়াসের কাছে নাকি ছিল সারঙ্গপুর, সেখানে নদীর নাম নর্মদা নয়, কালি সিন্ধ। সে কি নর্মদারই ভিন্ন নাম? উত্তর মেলে না তবে সেখানেই আছে রূপমতী কা গুম্বজ বা ছোট একটি সমাধির ভগ্নাবশেষ। সেখানে একা রূপমতী নন, শুয়ে আছেন বাজ বাহাদুরও।

অনেক ঘটনা ঘটে যা কল্পনার চেয়েও অসম্ভব মনে হয়। বাজ বাহাদুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুদের সাহায্যে মাণ্ডু উদ্ধারের বহু চেষ্টা করেছিলেন, কৃতকার্য হননি। তারপর তিনিও এক সময় শুনলেন, রূপমতী আর নেই। আত্মহত্যা করেছেন। রূপমতীই যখন নেই কি হবে মাণ্ডু উদ্ধার করে? বাজ বাহাদুরের জগৎটা ফাঁকা হয়ে গেল। বছর সাতেক চিতোরের রানার আশ্রয়ে রইলেন। সব হারালেও বাজ সঙ্গীতকে হারাননি। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত বাজ বাহাদুর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন শত্রু আকবরের কাছে। শাহানশাহ শত্রুর সঙ্গে সব সময়েই ভালো ব্যবহার করতেন। নিজের শক্তির সঙ্গে তার শক্তিকে মিশিয়ে নিতেন। শত্রু হত বন্ধু। তিনি বাজকে আশ্রয় দিলেন। প্রথমে এক হাজার পরে দু হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি হলেন বাজ। সুলতান হলেন মনসবদার। তা হোক, বাজের কোন কিছুর ওপরেই আর টান নেই। আসলে তিনি ছিলেন সম্রাটের সভাগায়ক। তানসেনের পরেই তাঁর স্থান। দুজনেই একই গুরুর কাছে এক সময়ে গান শিখেছিলেন, আজ দুজনে একই প্রভুর সভাগায়ক। আবুল ফজল তাঁকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন, গায়কদের মধ্যে এঁর সমকক্ষ কমই আছেন। রূপমতীর মৃত্যু ভিতরে ভিতরে বাজকে শূন্য করে দিয়েছিল. কয়েক বছরের মধ্যেই এল ঈপ্সিত মৃত্যু। তাঁর অন্তিম ইচ্ছাটি জানতে চাইলেন সম্রাট। বাজ বললেন, 'রূপমতীর পাশে আমার জন্য একটু জায়গা চাই।' সম্রাট বললেন, 'তাই হবে।' সারঙ্গপুরেই রূপমতীর পাশে সমাহিত করা হল বাজ বাহাদুরকে। জীবন যাঁদের বিচ্ছিন্ন করেছিল মৃত্যুতে আবার তাঁরা মিলিত হলেন। গ্রাম্য ভাট করুণ সুরে গাইলেন 'রূপমতী বাজ বাহাদুর কোউ না জিয়ে সদা।' কিন্তু আজও বেঁচে আছেন তাঁরা। সমস্ত মাণ্ডু, রেবাকুণ্ড, নর্মদা, কালি সিন্ধ আজও শোনায় তাঁদের কথা।

মুহম্মদ কুলি ও ভাগমতী

ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করতে চান না তাঁকে। অথচ তিনি ছিলেন। হায়দরাবাদের মানুষ তাঁকে ভোলেনি। শহর দেখতে নতুন মানুষ এলেই তাঁরা শোনান 'পুরানা পুল'-এর গল্প, যাঁর জন্য পুল তৈরি হয়েছিল তাঁর কথাও। ইতিহাস ভাগনগরের ভাগমতীকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করলে কি হবে? তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন। শুধু লোকশ্রুতি নয়, তিনি আছেন সমসাময়িক বিবরণে, সালারজং সংগ্রহশালায়।

তখন হায়দরাবাদ শহরের জন্ম হয়নি, ভাগনগরেরও না। ছিল গোলকুণ্ডা আর ছিলেন আবু মুজাফ্ফর, গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশের তৃতীয় সুলতান ইব্রাহিম কুলির পুত্র। বয়স তখন তাঁর কতই বা হবে, বড়জোর পনের। প্রতিদিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান দুর্গের প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে, একেক দিকে। এ তাঁর প্রতিদিনের খেলা। সুলতানের আদুরে দুলাল আবু, যদিও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত নন। কিন্তু গোলকুণ্ডার লোকেরা বলে আবুর জন্মের অব্যবহিত পরেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে ইব্রাহিম অকাতরে সোনা বিলিয়ে ছিলেন। এত সোনা পেয়েছিলেন প্রজারা যে সোনা আর মাটির তফাত খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরা। সেই আবু মুজাফ্ফর একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন চিচলামে, মুশি নদী পেরিয়ে। হঠাৎ তাঁর ঘোড়া চমকে থমকে দাঁড়ায়। নিজের অজ্ঞাতেই তার রাশ টেনে ধরেছিলেন আবু। সামনেই একটি মেঠোপথ। সেই পথ ধরে পুজো দিতে যাচ্ছে গ্রামের মেয়েরা, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে দস্যু ভেবে দ্রুত পালায় তারা, একজন দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের আড়ালে। ঘোড়সওয়াররা চলে গিয়েছে ভেবে পথ নেমেই থমকে দাঁড়ায়। এক নজরেই বুঝতে পারে, আগন্তুক দস্যু নয়, কোন অভিজাত ব্যক্তি। পদ্মপলাশ চোখ দুটি মাটির দিকে নামিয়ে নেয়। আর মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেলেন আবু। অতি সাধারণ গ্রামের মেয়েদের মতো রঙিন পোশাকের ওপর একখানি সাদা চুনরি কিছুটা আড়াল রচনা করেছে মুখের পাশে। এক হাতে পুজোর উপচার সাজানো রুমালে ঢাকা থালা। ভোরের প্রথম আলোর মতো তার মুখ। মেয়েটিও লাজুকলতার মতো আড়ষ্ট হাতে ঘোমটা টানাটানি করেনি। বিস্মিত আবু প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'

মেয়েটি চোখ তোলে না। নম্র কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আমি এই গ্রামেরই মেয়ে, হুজুর।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'মন্দিরে যাচ্ছি।'

'মন্দিরে গিয়ে তুমি কি করবে?' মেয়েটি চোখ তোলে। আবু দেখেন সে চোখেও বিস্ময়। মন্দিরে গিয়ে কি করে এই সামান্য কথাটাও আগন্তুক জানে না? সে বলে, 'আমি সেখানে গিয়ে দেবীমার পুজো করব। তাঁকে গান শোনাব।'

'গান?' আবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'আমি তোমার গান শুনব। আর ওই থালায় কি আছে?'

'সামান্য মিষ্টি।'

'আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে একটু দেবে?'

'এ মিষ্টি পুজোর জন্যে।' মেয়েটি ঋজু কণ্ঠে বলে, 'পুজোর পরে আমি প্রসাদ পাব, আমার বাড়ির লোকেদের দেব। তখন আপনাকে দিতে পারি।'

'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে।'

'পুজো না দিয়ে আমি কিছু দিতে পারব না।'

'বেশ, আমি মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করব।'

মেয়েটি চলে যায়। আবু দাঁড়িয়ে থাকেন মন্দিরের বাইরে। পুজো শেষ করে সে ফিরে আসে এক সময়ে। পাশে দাঁড়িয়ে রুমালটি সন্তর্পণে খোলে। একটি মিষ্টি তুলে দেয় আবুর হাতে। আবু অঞ্জলিবদ্ধ হাতে ঈষৎ নত হয়ে প্রসাদ নেন। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মেয়েটি।

'তুমি কি রোজ পুজো কর?'

'না, শুধু মঙ্গলবার। তবে রোজ সকালে প্রণাম করতে আসি।'

'তাহলে কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমার নাম আবু মুজাফ্‌ফর, গোলকুণ্ডার রাজকুমার। অনেকে আমাকে মুহম্মদ বলেও ডাকে। তা তোমার নাম কি?'

আগন্তুকের পরিচয় শুনে মেয়েটির আপাদমস্তক শিউরে উঠল। চমকে তাকাল তার মুখের দিকে। ভয়ের কিছু দেখল না। সমবয়সী কিশোর, ঠোঁটের ওপরে সামান্য কালো রেখা, হাসিমাখা দুটি চোখ। আবার নতনয়নে বলল, 'আমার নাম ভাগমতী।'

'ভাগমতী', আবু বলেন, 'ভারি সুন্দর নামটি তোমার।' ভালো লাগারই কথা। আবুর মায়ের নামটিও এই রকমই যে, ভাগীরথী। ইব্রাহিম কুলি বিজয়নগরের হিন্দু কন্যাটিকে বিয়ে করেছিলেন, সে দেশে লুকিয়ে থাকার সময়। তারপর যখন গোলকুণ্ডা তাঁর হাতে এল তখন ভাগীরথীই হলেন তাঁর প্রিয়তমা বেগম, সেজন্যই আবুল জন্মলগ্নে মোহরবৃষ্টি। মুগ্ধ আবু বললেন, 'আর তুমিও খুব সুন্দর।' তারপর নিজের গলা থেকে এক ছড়া মুক্তোর মালা খুলে ভাগমতীর থালায় রেখে হেসে বললেন, 'কাল সকালেও আমার খিদে পাবে আর একটা মিষ্টিতে আমার খিদে মিটবে না।' বলেই আবু ঘোড়ায় চেপে চোখের আড়াল হলেন।

আর ভাগমতী? রাজকুমারের ধুলো ওড়ানো পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এই মালা আমার দেবীমায়ের।' তিনি আবার ফিরে গেলেন মন্দিরে, বিস্মিত পূজারীর হাতে মুক্তোর মালাটি দিয়ে বললেন, 'দেবীমার জন্যে এই মালা গোলকুণ্ডার রাজকুমার দিয়ে গেছেন।'

পরদিন। ভাগমতী আবার পুজো নিয়ে এলেন। পুজো দিলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখেন আবু দাঁড়িয়ে আছেন আগের দিনের জায়গাটিতে। সঙ্গে ঘোড়া ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই। অঞ্জলি ভরে প্রসাদ নিলেন। তারপর ভাগমতীর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'মালা কোথায় গেল?'

মধুর হেসে ভাগমতী বললেন, 'দেবীমায়ের কাছে।'

আবু বললেন, 'কিন্তু মালা তো আমি তোমায় দিয়েছিলাম।'

'আমি মানত করেছিলাম, যদি কখনও মোতির মালা পাই, মাকে দেব।'

আবু হেসে ফেললেন। এই মুহূর্তে ভাগমতীকে যেন আরও ভালো লাগছে। নিজের গলা থেকে চার নরির আর একটা অপরূপ মালা খুলে নিয়ে বললেন, 'এটা শুধু তোমার।'

'না হুজুর।' ভাগমতী কোমল কণ্ঠে বলেন, 'আমার দরকার নেই। আমি গরিব মানুষ।'

'আমি জানি তোমার কোন গয়নার দরকার নেই। কিন্তু আমি এই মোতির মালাটার রূপ আরও বাড়াতে চাই।'

'কিন্তু হুজুর', ভাগমতীর মোহময়ী কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ে, 'আপনার এই বাঁদির সে যোগ্যতা নেই। আমি বড় গরিব।'

'ও কথা বোলো না', আবু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'দেশের রাজার ছেলে যার কেনা গোলাম সে কখনও গরিব হতে পারে না।'

চমকে ওঠেন ভাগমতী, ভ্রূ দুটো ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো ঝলসে ওঠে, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

আবু মালাটা নিজেই পরিয়ে দেন বিস্মিত ভাগমতীর গলায়। বুকের কাছে টেনে নিয়ে কপালে আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে শুধু বলেন, 'কাল আবার দেখা হবে।'

ভাগমতীর মনে হল, কোন রাজা উজির নয়, সমবয়সী এই কিশোরটি তাঁর জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী।

গোলকুণ্ডা থেকে সাত মাইল দূরে চিচলাম, বানজারা আর জুবিলি পাহাড়ের বুকে মায়ের কোলে লুকিয়ে বসে থাকা শিশুটির মতো সুন্দর। মুশি নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে, নদীর ওপরে একটি কাঠের পুল। মুহম্মদ প্রতিদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যান সেই পথে। এসে দাঁড়ান মন্দিরের কাছে। ভাগমতী ফেরেন পুজো দিয়ে। সামান্য কটি মুহূর্ত দুজনের কাছে অনন্ত হয়ে ওঠে। ভাগমতীর মা ছিলেন না। বাবা লিঙ্গাইয়াকে অনেকে মনে করেন লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা মন্দিরে নৃত্যগীত করেন। ভাগমতীও নিপুণ শিল্পী তবে দেবদাসী নন। রাজকুমারের দেওয়া উপহারটি তিনি বাবাকে দেখিয়েছিলেন। শঙ্কিত লিঙ্গাইয়া একবার ভেবেছিলেন মেয়েকে নিয়ে দেশান্তরী হবেন কিন্তু পালাতে পারবেন কি? অনুচরেরা ধরে ফেলতে পারে তো। ভাগমতী তাঁকে পরম আশ্বাস দিয়ে প্রবোধ দেন, 'তুমি কিছু ভেবো না বাবা, তিনি দুর্বৃত্ত নন, রাজার ছেলে। আমাদের কোন ভয় নেই।'

মেয়ের কথায় সান্ত্বনা পেয়ে লিঙ্গাইয়া বলেন, 'তুমি তোমার বয়সের মেয়েদের

চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী মা, যা করবে ভেবেচিন্তে কোরো। আমাদের মতো গরিবের কাছে রাজা বা দস্যুর মধ্যে কোন তফাত নেই। দুজনেরই জোর আছে, কেড়ে নিতে পারে, ধরে নিয়ে যেতে পারে।'

ভাগমতীর মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। নির্ভয়ের হাসি। ভালোবাসার জোর যে আরও বেশি। দুজনের দেখা হওয়ায় ছেদ পড়ে না। চিচলামের অধিবাসীদের কাছেও আর ঘটনাটা নতুন নয় বরং সস্নেহ প্রশ্রয়ের একটা বলয় রচিত হয়। আর একদিন ভাগমতী মন্দিরে অন্তর উজাড় করে নাচলেন, গাইলেন। ফিরতি পথে দেখা হল আবুর সঙ্গে। আজ তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছেন ভাগমতীর নাচ, শুনেছেন তাঁর গান। বললেন, 'তুমি যে এত ভালো নাচতে জান তা তো বলনি।'

'আমি শুধু মন্দিরে নৃত্যগীত করি।'

'না তোমাকে দুর্গে আসতে হবে। ওদের দেখাতে হবে তুমি কত ভালো নর্তকী। বেশ তো ওখানেও তোমার জন্য একটা নকল দেবীমূর্তি রেখে দেব। তুমি তার সামনেই নাচবে।'

'এখন নয় পরে।'

'বেশ তো দুর্গটাই দেখে আসবে চল, তোমার বন্ধু, সখী, আত্মীয়স্বজন যাকে খুশি সবাইকে নিয়ে চল।'

'হবে এখন।'

আবার একদিন বলেন আবু, 'কবে আসবে দুর্গে?'

'কোন উৎসব না হলে আমি সেখানে যেতে পারি না যে।'

'তাহলে উৎসব হবে। তোমার আসাটাই হবে উৎসবের উপলক্ষ।' আবু উত্তর দেন, 'আমি আমার প্রাসাদটাকে সাজিয়ে রাখব।'

'এর আগে প্রাসাদটি কতবার সেজেছে?' তীর্যক হাসি ভাগমতীর মুখে।

'একবারও না।' আবু ভাগমতীর হাতখানি তুলে নিজের ঠোঁটে ঠেকান।

আর ভাগমতী মধুর হাসি হেসে বলেন, 'আমি সেখানে যাব দিনের আলোয়, আর যাব শুধু দেখতে নয়, থাকতে।'

'নিশ্চয়', খুশির হাসি হেসে বলেন আবু, 'আমি তোমাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়েই নিয়ে যাব। তুমি হবে আমার বেগম।'

একদিন অঘটন ঘটে। সারারাতের প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির পরে শান্ত মুশি ফুলে ফেঁপে উঠল, ভেসে গেল পারাপারের কাঠের পুলটি। প্রেমোন্মাদ রাজকুমারের চিচলামে পৌঁছবার সেতু। জলের ঢেউয়ে মৃত্যুর ছায়া ওদিকে ভাগমতীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণপ্রায়। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুশির বুকে, ডুবতে ডুবতে ভেসে গেলেন অনেকটা। নদী পারের মাঝিদের সাহায্যে রক্ষা পেলেন তিনি। মৃত্যু হতে পারত তাঁর, হয়ত অন্যরকম হত গোলকুণ্ডার ইতিহাস। সে রকম কিছু না ঘটলেও এবার খবর পৌঁছল সুলতানের কাছে। এক তুচ্ছ গ্রাম্যবালিকার জন্যে তাঁর ছেলে জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শুনে ইব্রাহিম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মৃত্যু তাঁদের কাছে অপরিচিত নয়। সিংহাসনে বসা মানেই মৃত্যুর সঙ্গে

সন্ধি করে দিন কাটানো। কবে কোন অতর্কিতে মৃত্যু তাঁদের জীবনে হানা দেবে কেউ জানে না। কিন্তু কেন এই পাগলামি?

প্রচলিত কাহিনী ইব্রাহিম দুটি কাজ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে কাজ দুটি দুরকমের মনে হলেও ইব্রাহিমের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। প্রথমত, তিনি কিশোর পুত্রকে অন্তরীণ করলেন তাঁর নিজের মহলে। একটি গ্রাম্যবালিকার বিচ্ছেদ ভুলিয়ে দেবার জন্য তিনি পুত্রের হারেম সাজিয়ে দিলেন অগুনতি হুরি পরীর মতো রূপসী দিয়ে। দ্বিতীয়ত, পুত্রের অভিসারের পথ নিরাপদ করতে মুশি নদীর ওপরে নির্মাণ করিয়েছিলেন শক্তপোক্ত একটি সেতু, এখন তারই নাম 'পুরানা পুল'। এই পুল তৈরি হতে সময় লেগেছিল দুবছর। কোন অজ্ঞাত কারণে চিচলাম এবং লিঙ্গাইয়ার অবস্থারও উন্নতি হচ্ছিল। গ্রামে একটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছে, চাষের মাঠের কাছে খাল কাটা হয়েছে। সবই হতে পারে সুশাসক ইব্রাহিমের চোখে গ্রামের দুরবস্থা ধরা পড়ার জন্য কিংবা হতে পারে ভাগমতীর জন্য। যদিও আবুর ভালোবাসাকে একটু মধুর স্বপ্ন ভেবেই ভুলতে চান ভাগমতী। প্রিয়তম আবুর কোনও খোঁজই পান না তিনি।

অন্যদিকে মুহম্মদ কুলির জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। তাঁর জীবনে এল নানহি, গোরি, মুস্তারি, শাঁওলি, কনওয়ালি, ছবিলি, মোহন, লালা, লালন, বিলকিস, রঙ্গিলি, সুন্দর, সজ্জন, পদ্মিনী এবং আরও কতজন। সর্বক্ষণ তারা ঘিরে রইল রাজকুমারকে। ভুলিয়ে দিল দিন রাত্রির ব্যবধান। কুলির মনে হতে লাগল বিলাসী জীবন যাপনের জন্যই তাঁর জন্ম। প্রেম ও সুরার কাছেই তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। কবি মনটি আগে থেকেই ছিল এবার শুরু হল কাব্যচর্চা। বলতে গেলে উর্দু সাহিত্যের জন্ম হল তাঁর হাতে। সতেরটি ছদ্মনাম ছিল তাঁর, তার মধ্যে কুতবশাহ, কুলি এবং মানী বেশ পরিচিত। তাঁর সব কবিতাই প্রথমদিকে প্রেম ও যৌবন বন্দনার. তাঁর নানহি প্রেমকলহে নিপুণ, শাঁওলি শুধু কালো নয় কোকিলকণ্ঠী, কনওয়ালির চোখ দুটি মদির, গোরির রূপে চোখ ঝলসে যায়, ছবিলিকে ছেড়ে থাকা যায় না, মোহনকে দেখে তিনি মজনু হয়ে যান, বিলকিস যেন বেহেস্তের হুরি, রঙ্গিলি রঙিন পানীয়ের মতো মিঠে আর নামহীনা হিন্দু বাহমনীকে দেখেই তিনি তাঁর দাস হয়ে গিয়েছেন। বারজন সঙ্গিনীকে নিয়ে তিনি আটচল্লিশটি কবিতা লিখেছিলেন। কারোরই নাম জানতেন না, বোধহয় হারেমকন্যাদের নাম থাকে না। দৈহিক আকৃতি ও কে কোন জায়গা থেকে এসেছে, বড়জোর হিন্দু কি মুসলমান সেটুকুই শুধু জানা যেত। সুলতান বা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলে নামহীন অবয়বেরা হয়ে উঠত নায়িকা। কুলির জীবনে এঁরা কেউ নায়িকা হয়ে ওঠেননি। অবশ্য কুলির কবিতায় নেই ভাগমতীও। কিন্তু কুলি লিখেছেন মেঘদূতের মতই বায়ুদূতকে সম্বোধন করে উর্দু রুবাই :

অ্যায় বাও মেরি বাত উসে চোরি সূঁ কহ।
মেরি সো গুপ্ত বাত তু উস ছোরি সূঁ কহ।
ফুল জায়ে নমন ও বাত উস গোরি সূঁ কহ।
সমঝা তু নকো সরজুরি সূঁ কহ।
(ও হাওয়া আমার কথা তাকে চুপিচুপি বোলো।

আমার সব গোপন কথা তুমি সেই কিশোরীকে বোলো।
ফুলের মতো নরম করে কথাটি সেই গৌরী মেয়েটিকে বোলো।
জোর জুলুম করে নয় তাকে বুঝিয়ে বোলো।)

অনুমান করতে ভালো লাগে রূপসীর হাটে বসে কুলি এ কবিতা লিখছেন দূরবর্তিনী ভাগমতীর কথা ভেবে।

ইব্রাহিমের মৃত্যু হল। মহম্মদ কুলির বয়স তখন মাত্র ষোল, তাঁর দুই দাদা ছিলেন। তবু বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে দেখা গেল রাজশিরোপা কুলির মাথায়। তাঁর নতুন নাম হল মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ। যে ষড়যন্ত্র তাঁকে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করেছিল অর্থাৎ বাবার প্রধান মন্ত্রী মীর শাহ মীরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন মুহম্মদ, সিংহাসনে বসার পর প্রধান কাঁটা হিসাবেই মীর শাহ মীরকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ইরানে, বধূবেগমও চলে গেলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। আর কেউ কোনদিন মুহম্মদের সেই বেগমের খবর পাননি। তবে ভাগমতী পূজারীর কাছে শুনেছিলেন নতুন সুলতানের বিয়ের কথা।

মুহম্মদ কুলি কিন্তু ভোলেননি। এত কিছু ঘটে যাবার পরে, সিংহাসনে নিজের অধিকার মজবুত করেই তিনি ছুটে এসেছিলেন চিচলামে। ঠিক আগের মতই তিনি পথজুড়ে এসে দাঁড়ালেন, 'ভাগমতী'।

উত্তর দিলেন না ভাগমতী, আভূমি নত হয়ে বারবার সেলাম জানালেন, রাজাকে যেমন জানায় প্রজারা।

'ভাগমতী, আমি এসেছি, আমি।'

'হ্যাঁ সুলতান। সারা গ্রামের পক্ষ থেকে আমি অভিবাদন জানাচ্ছি।'

'ভাগমতী, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কিন্তু কদিন আগেই না সুলতানের বেগম এসেছেন সেখানে? অভিনন্দন জানাতে ভুলে গিয়েছি। ক্ষমা চাইছি সুলতান।'

'ভাগমতী, সে তো কূটনৈতিক ব্যাপার।'

'বিয়ে আর কূটনীতি? আমি বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কোনদিন পারবেও না। শুধু জেনে রাখ, এ সবই করতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্যে।'

'বেঁচে থাকতেন নিশ্চয় তবে হয়ত সুলতান হওয়া হত না।' নীরস কণ্ঠে বলেন ভাগমতী। আবার বলেন, 'এক রাজকুমার হয়ে বেঁচে থাকা কি যথেষ্ট নয়?'

'ভাগমতী, আমাদের নিয়ম তুমি জান না। এই সব আছে আবার কিছুই নেই। রাজার ছেলে হয়ে বাঁচতে চাইলে হয় আমাকে সুলতান হতে হবে নয়ত জীবন দিতে হবে ঘাতকের হাতে কিংবা অন্ধ হয়ে জেলে বন্দি থাকতে হবে। রাজার ছেলের জীবনই এরকম।'

ভাগমতী শিউরে ওঠেন। না না এরকম কোন অশুভ ঘটনার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। ওই মুগ্ধ চোখদুটি দৃষ্টিহীন! কী ভয়ানক। বলেন, 'হ্যাঁ যুদ্ধ আপনাকে করতেই হত কিন্তু বিয়ে করা উচিত হয়নি।'

'আমি স্বীকার করছি উচিত হয়নি। কিন্তু আমি যে বিশ্বস্ত সেটা বোঝাবার জন্যেই বিয়ে। তাই বলছি, আমার বিয়েটাও কূটনীতির অঙ্গ। আমি সেই মেয়েটিকে আমার হারেমের চৌহদ্দিতে ঢুকতে দিইনি। এতদিনে সে চলেও গিয়েছে তার বাবার সঙ্গে ইরানে।'

মেঘ কাটতে শুরু করে। ভাগমতী বলেন, 'কিন্তু আমার সুলতান, তুমি কি আমাকে একটাও খবর দিতে পারতে না?'

'আমি যুদ্ধ করেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে তুমি অন্তত আমাকে ভুল বুঝবে না।'

রাগ পড়ে গেল। ভাগমতী প্রসাদের থালা থেকে মিষ্টি তুলে দিলেন সুলতানের হাতে, 'দেবী মায়ের অশেষ কৃপায় তুমি রক্ষা পেয়েছ। আমি আর কিচ্ছু চাই না।'

ভাগমতীর আনন্দাশ্রু নিজের হাতে মুছে দেন কুলি, 'এক সপ্তাহ পরেই তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সেখানে আমাকে মানাবে না সুলতান। আমি যে বড় গরিব।'

'ফের সেই কথা। তোমাকে যেতেই হবে। আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না?'

'কি করে রাখব? তুমি যে দূরের মানুষ।' ভাগমতীর মনে শঙ্কা ছিল। সুলতানের হারেমে প্রতিদিনই আসে অনেক সুন্দরী। সান্ধ্য মেহফিল রঙিন করে কদিন পরে বিদায় নেয় তার। সামান্য মাসোহারা আর কয়েকটি উজ্জ্বল মধুযামিনীর স্মৃতি সম্বল করে বেঁচে থাকে। ভাগমতী তাদের শরিক হতে চায় না। তার চেয়ে বরং ভালো চিচলামের সামান্য কুটির, মেঠো পথ আর দেবী মন্দির। পেয়ে হারানোর চেয়ে না পাওয়া শতগুণ ভালো।

মুহম্মদ কুলি বললেন, 'বেশ তাহলে আমিও যাব না।'

জহাঁ তু ওঁহা হুঁ পেয়ারে মিনজে কেয়া কাম হ্যায় কিস সুঁ।

না বুতখানে কা মিনজ পরোয়া ন মসজিদ কা খবর মিনজ কুঁ।

(প্রিয়তমা তুমি যেখানে আমিও সেখানে, আর কারও সঙ্গে আমার কোনও কাজ নেই। আমি মন্দির নিয়েও মাথা ঘামাই না, মসজিদ নিয়েও না)

তবু বাধা ছিল, দ্বিধা ছিল ভাগমতীর মনে। তিনি দেবীর পুজো করেন, মুহম্মদ কলি মুসলমান। তাঁদরে পথ কি আলাদা নয়? কুলির কাছে এর উত্তরও ছিল :

কুফর রীত কেয় হোর ইসলাম রীত।

হয় এক রীত মেঁ হ্যায় ইশক কা রাজ।

(কাফেরের রীতিই বা কি আর ইসলামের রীতিই বা কি

প্রতিটি সাধনার গোপন কথা হল ভালোবাসা।)

কুলি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ধর্মের ভিত হল প্রেম, বাইরের রীতিনীতি আলাদা হলেও সব ধর্মের মূলকথা একই।

ভাগমতীর সংশয় দূর হল, তিনি বললেন, 'আমি যাব প্রিয়তম, এই গ্রাম ছেড়ে তোমার রাজপ্রাসাদে।'

পরদিন পরিচারকেরা এল ভাগমতী ও তাঁর বাবা লিঙ্গাইয়ার জন্য উপহারের সামগ্রী নিয়ে। গ্রামের মানুষ সেদিন থেকেই তাঁকে চৌধুরী বা মোড়লের সম্মান দিল। কদিন পরে এল সোনায় মোড়া পালকি সঙ্গে এক হাজার ঘোড়সওয়ার, রানি যাবেন রাজপ্রাসাদে। এ তো সামান্য হারেমকন্যার বিলাসভবনে আসা নয়। আসছেন সুলতানের জীবনসঙ্গিনী, আসছেন সমারোহের মধ্য দিয়ে। সেই যে কুলি বলেছিলেন, ভাগমতীর আসাটাই হবে প্রাসাদসজ্জার উপলক্ষ, তাই হল শেষ পর্যন্ত। সেইসঙ্গে, ফিরিস্তা লিখেছেন, আগেই সুলতান সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ভাগমতী যখন আসবেন তখন আপামর জনসাধারণের এবং কোনও আমির ওমরাহের আচরণে, দৃষ্টিতে কিংবা ঠোঁটের কোণে যেন ভাগমতীর প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার বিন্দুমাত্র প্রকাশ না ঘটে। চিচলামবাসীরা পেলেন বিশেষ নিমন্ত্রণ, কেল্লায় আতসবাজি দেখবার জন্য। তাছাড়া তাদের জন্য এল পঞ্চাশ গরুর গাড়ি ভর্তি মিষ্টি ও স্মারক উপহার, ভূরিভোজের ব্যবস্থা তো ছিলই। মন্দিরের দেবীমার জন্য এল জড়োয়া গয়নার অর্ঘ আর পূজারী পেলেন পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। প্রত্যেক চিচলামবাসী উপহার পেল, খুশির স্রোত বয়ে গেল সারা গ্রামে।

ভাগমতী এলেন। এভাবে বধূ বা বেগমের কেল্লাপ্রবেশের কথা কোথাও শোনা যায় না। স্বাভাবিক কারণেই সবাই ধরে নিলেন, ভাগমতী এক রূপসী নর্তকী এবং সুলতানের সঙ্গিনী। ফিরিস্তা, ফইজি, নিজামউদ্দিন বকশি, কাফি খান, নিহাওয়ান্দি—সমসাময়িক সকলের লেখায় একই গল্পের পুনরাবৃত্তি। প্রতি বছর গ্রামে আসতেন ভাগমতী, রানি হয়ে নয়, প্রিয় সখীদের 'ভাগো' হয়ে। বছর পাঁচেক পরে তিনি সখীদের সগর্বে জানালেন তাদের গ্রামটি এবার নতুন শহরে পরিণত হবে। সুলতান তাই চান। কুলি শুধু প্রেমিক ছিলেন না, তিনি একাধারে সুশাসক এবং জাঁকজমকপ্রিয়। সুখে থাকতে এবং সুখে রাখতে চান সবাইকে। ভাগমতীকে পেয়ে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবন তো নয় যেন ভরপুর সুরার পেয়ালা। কবিতা লেখেন,

মুহব্বত কি লজ্জত ফরিস্তায়া কো নই হ্যায়।
বহুত সই সুঁ ম্যায় সো লজ্জত পছানি।
(প্রেমের আনন্দ কি ফরিস্তারাও জানেন না,
অনেক চেষ্টা করে আমি জেনেছি।)

কিংবা

জিনহে কামিল কিয়া হ্যায় প্রেম আপনা।
গনি হ্যায় দো জগ মেঁ নই হ্যায় ও মুহতাজ।
(সেই সবচেয়ে ধনী যার প্রেম সফল হয়েছে।
স্বর্গমর্ত্য কোথাও তার আর চাইবার কিছু নেই।)

ভাগমতীকে আরও কিছু দিতে চান কুলি, নতুন উপহার। চমকে দেবেন তাঁকে। তাই নগর পরিকল্পনা। মন্ত্রী মীর মোমিনও নতুন নগর নির্মাণের পক্ষে। কুলি বললেন, 'মুশির তীরেই তৈরি হবে নতুন শহর।'

ভাগমতী আগেই শুনেছেন সে কথা। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, কি নাম হবে নতুন শহরের?'

কুলি বললেন, 'ভাগনগর।'

সত্যিই চিচলাম ও তার আশেপাশের জায়গা জুড়ে নতুন শহর পত্তন হল। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তি বলে, এখন যেখানে চারমিনার, ওই জায়গাটিতেই দেখা হত কুলির সঙ্গে ভাগমতীর। তাই চারমিনার দিয়েই শুরু হল নগর পত্তন, আর ভাগমতীর প্রতি গভীর ভালোবাসার স্মারক হল ভাগনগর।

আবার এক শোভাযাত্রা, সোনার তাঞ্জাম ঘিরে হাজার অশ্বারোহীর। ভাগমতী চলেছেন নতুন মহলে। না, সুলতানের বিলাসকুঞ্জ কুতব মন্দিরে কখনও যাননি তিনি, হারিয়ে যাননি হাজার রূপসীর ভিড়ে। নতুন মহলে ভাগমতীকে অভ্যর্থনা জানালেন কুলি, 'এই দেখ তোমার মহল।'

ভাগমতী সবিস্ময়ে দেখলেন প্রাসাদের নাম হায়দর মহল, 'কিন্তু...'

'হ্যাঁ, এই প্রাসাদের নাম হায়দর মহল। কারণ তোমার উপাধি হল হায়দর মহল।'

ভাগমতী নত হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার আগেই কুলি তাঁকে ধরে ফেলেন, 'আমি তোমাকে এই প্রাসাদ আর শহর দিলাম। তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হল এদের নাম, যাতে যুগ-যুগান্তর ধরে লোকে জানতে পারে তোমার নাম আর আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।'

'প্রিয়তম, আমি ও সবের যোগ্য নই।'

'তুমি জানো না তোমার যোগ্যতা কতখানি।' মুহম্মদ বলেন, 'এক একবার সুলতানও নিজেকে গরিব মনে করে। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে আরও অনেক দিতে। তোমার জন্যে, তোমার নামের জন্যে। আমি যদি সিকন্দর বাদশাহ হতাম, সারা বিশ্বে তোমার নাম ছড়িয়ে দিতাম। কিন্তু আমি সামান্য...'

বাধা দিয়ে ভাগমতী বলেন, 'আমার কাছে তুমি সবচেয়ে বড় রাজা। তুমি আমার প্রভু। আর কিচ্ছু জানি না আমি।'

ভাগমতীর শত্রু বাড়ছিল। সুলতানের প্রিয়তমার শত্রু থাকবে না তা তো হতে পারে না, তিনি যদি শুধু নর্মসঙ্গিনী হয়েই থাকতেন তাহলে কেউ কিছু ভাবত না কিন্তু সুলতান যে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতে চান। অভিযোগের প্রধান কারণ হল ভাগমতী অভিজাত পরিবারের মেয়ে নন। সম্ভ্রান্ত পারশি ওমরাহরা লজ্জা পান নিজেদের ভাগনগরবাসী ভাবতে। ষড়যন্ত্র ক্রমে বিদ্রোহের আকার নেয়। বিদ্রোহ করেন কুলিরই ছোটতাই খুদা বান্দা। কিছুতেই কিছু হল না। কুলি বিদ্রোহে দমন করলেন কঠোর হাতে, খুদা বান্দা নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন নগরের নাম বদলে রাখা হোক ফারকুণ্ডা বুনিয়াদ। নামটির অর্থ ভাগনগর বা সৌভাগ্যনগরের সমার্থক। কুলি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললেন, 'তোমাকে ফারকুণ্ডা বেগম বলে ডাকলে কেমন লাগবে?'

'আপনি আমাকে যে নামে খুশি ডাকুন সুলতান, আমি জানি আমি শুধু তাঁর বাঁদি।'

'কিন্তু তুমি তো দাসী বাঁদি নও ভাগমতী, তুমি রাজার হৃদয়ের রাজা।'

'আমি শুধু সেখানটিতেই থাকতে চাই।'

এ সময়েই ভাগমতী কুলিকে শোনালেন একটি সুখবর, তিনি মা হতে চলেছেন। এখন কুলির বয়স আঠাশ বছর, ভাগমতীরও তাই। কুলি আর কাউকে বিয়েও করেননি

সেজন্য মাঝে মাঝে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা তাঁদের ভাবিয়ে তুলছিল। বিয়ের বারো বছর পরে ভাগমতী শোনালেন নতুন অতিথির আগমনবার্তা। খুশিতে মন ভরে উঠল তাঁর। তার পরেই মনে হল, 'কে আসবে? রাজপুত্র না রাজকন্যা?'

ভাগমতীর চিন্তা সেই শিশুই রাজা হবে তো?

কুলি অত ভাবতে চান না, 'রাজাই হোক বা রানিই হোক, আমার ভালোবাসা তাতে কমবে না। আমি স্বপ্ন দেখছি কচিকাঁচাতে প্রাসাদটা ভরে উঠেছে।'

'তুমি নিজেই বলেছ রাজপুত্রদের ভবিতব্য হল হয় সিংহাসনে বসবে নয় বন্দিশালায় ঘাতকের হাতে অন্ধ হবে কিংবা প্রাণ দেবে। আবার এত শিশুর কথা ভাবছ কেন?'

মেয়েই হল শেষ পর্যন্ত। যেন চাঁদের টুকরো। দাসীর মুখে খবর শুনে কুলি তাকে মুক্তোর মালা বকশিস করলেন। সাধারণত মেয়ের জন্ম হলে বাইরে কোন উৎসব হয় না, কুলি সে নিয়ম ভেঙে রাজকুমারের জন্মোৎসবের মতোই ভাগনগরকে সাজালেন। সুলতান মেয়ের নাম দিলেন হয়াৎবকশি বা জীবনদাত্রী। পুত্র না থাকায় তিনিই কুলির উত্তরাধিকারী হন। বিয়ে হয়েছিল কুলির ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ সুলতানের সঙ্গে, কুলির মৃত্যুর পরে মুহম্মদ সুলতান সিংহাসনে বসেন। হায়ৎবকশি এক সুলতানের কন্যা, এক সুলতানের ঘরণী আবার এক সুলতানের জননী। রাজ্য পরিচালনায় তাঁর ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করে না। হায়দরাবাদের মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

ভাগমতীর নামে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি অব্যাহত রইল। সকলেই ভেবেছিলেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগমতী হারাবেন কুলির ভালোবাসা। কিন্তু তা হল কই? দিনের পর দিন কুলি মুগ্ধ হয়ে রইলেন, অপরিসীম আনুগত্য নিয়ে মগ্ন হয়ে রইলেন ভাগমতীতে। তাহলে তিনি নিশ্চয় মায়াবিনী, ফইজি তাঁকে বলেই বসলেন বৃদ্ধা বেশ্যা, রূপহীনা, কুৎসিত—

অসুস্থ ভাগমতীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা জল। কুলি বললেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'তুমি জানো, আমি তা নই।'

'কি নও?'

'ফইজি যা বলেন, আমার নামে।'

'ওসব কথা নিয়ে তুমি ভাবো কেন? কে বলল তোমাকে? তুমি যা জানো আমিও তাই জানি আর সারা জগত তাই জানে।'

পরম শান্তি পান ভাগমতী, 'তুমি জানো যখন আর আমার কেন দুঃখ নেই। তবে আর তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।'

'আমি বিব্রত হই না, গর্ববোধ করি।'

তৃপ্তির হাসি ফোটে ভাগমতীর বিবর্ণ ঠোঁটে। সেই রাত্রেই মৃত্যু হয় ভাগমতীর। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, মেয়ের বয়স তেরো বছর। আর একবার চেষ্টা শুরু হল ভাগনগরের নাম বদলাবার। শেষে কুলি নিমরাজি হলেন একটা প্রস্তাবে। তাতে

বলা হল, শহরের নাম হোক হায়দরাবাদ। ভাগমতী তো খেতাব পেয়েছিলেন হায়দর মহল তাহলে ভাগনগরের নাম হায়দরাবাদ হলে ক্ষতি কি? তা-ই হল শেষ পর্যন্ত। কুলি অবশ্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হায়দরাবাদকে ভাগনগর বলেই ডেকে গেলেন। তিনি তো ভাগমতীকে ভুলতে পারেন না। নতুন করে মনে হল, তাঁদের ভালোবাসাকে কাব্যরূপ দেবার কথা। তিনি নিজেও কবি কিন্তু এই কাব্য লেখার ভার দিলেন বিখ্যাত কবি বাজাহিকে। তাঁকে শোনালেন নিজেদের গল্প, ভালোবাসার গল্প। ১৬০৯ সালে বাজাহি লিখলেন 'কুতব-মুস্তারি' উর্দুতে লেখা একটি অনবদ্য প্রণয়গাথা। বাজাহির মনেও দ্বিধা ছিল, আভিজাত্যের দ্বিধা। তিনি কাব্য লিখেছিলেন রূপকের আকারে। তাঁর কাব্যে রূপবান রাজপুত্র কুলি স্বপ্নে এক অসামান্য নারীর প্রেমে পড়েন। অনেক বাধার পাহাড় পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর স্বপ্নসুন্দরীকে, তিনি বাংলার রাজকন্যা। কুলি তাঁর মন জয় করলেন ও তাঁকে ঘরণী করে নিয়ে এলেন। সকলেই জানত রূপকের আড়ালে এ গল্প কুলির জীবনের গল্প। তবে কেন স্বপ্নসুন্দরী বাংলার রাজকন্যা? বাজাহি বোধহয় ভেবেছিলেন, ভাগনগরের ভাগমতীকে সবাই একদিন ভুলে যাবে। তাই রাজকন্যার ছদ্মবেশ। কিন্তু সত্যিকারের প্রেম হারায় না। চারশো বছর ধরে মুশি নদী সুলতান কুলি আর ভাগমতীর প্রেমকথা শুনিয়ে আসছে।

রাজকুমারী মুমল ও মহেন্দ্র

ইতিহাসের চেয়ে কিংবদন্তির আয়ু নিশ্চয় বেশি। তা না হলে লোদ্রাবায় আজও টিকে থাকত না মুমল কি মেড়ি বা মুমলের মহল। ইতিহাসে তাঁকে খুঁজে পাওয়া শক্ত কিন্তু মরুভারতের মানুষ আজও লোদ্রবার রাজকুমারী মুমল এবং অমরকোটের কুমার মহেন্দ্রর ভালোবাসার কথা শুনিয়ে আনন্দ পান। কে এঁরা? স্পষ্ট করে কেউ উত্তর দিতে পারবেন না তবে রাজস্থানের জয়সলমির, গুজরাটের কচ্ছ ও ভূজ এমন কি সিন্ধুপ্রদেশের মানুষও বলবেন লোদ্রবায় গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসতে।

চারদিকে সোনা রঙের ধু-ধু বালি, তার সঙ্গে রং মিলিয়ে সোনালি পাথরের জাফরিকাটা সেকেলে বাড়ি তৈরি করতে ভালোবাসেন জয়সলমিরের অধিবাসীরা। আজও সেখানে হাভেলির পর হাভেলি। পটুয়োঁ কি হাভেলি, নাথমল কি হাভেলি, সালেম সিং কি হাভেলি, গজমহল, মোতিমহল, বাদলবিলাস, জওহরবিলাসের মতো এখানে ওখানে উঠছে নতুন বাড়ি—কোনটা নতুন কোনটা পুরনো, তৈরি হয়ে গেলে আর বোঝার উপায় নেই। এখানে ঝরোখা, ওখানে পাখি, এদিকটায় ঝুল বারান্দা তো ওদিকে পাথরের জালিকাটা জানলা, ঘোরানো সিঁড়ি, অলিগলির মতো অর্থহীন কিছু পথ, খিলান, গম্বুজ, লোহার খিল বসানো মোটা মোটা দরজা। সবই মধ্যযুগের রুচি ও রীতির প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি বাড়িই লুকোচুরি খেলার ভুলভুলাইয়া, যেন মুমলের মায়ামহল।

এখনকার জয়সলমির থেকে অল্প দূরেই লোদ্রবা। অতীতের প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ লোদ্রবাপাটন। বারোটা প্রবেশদ্বার ছিল শহরে, বারোটা চোখজুড়োনো সোনালি তোরণ। খিলানে জমকালো কারুকাজ, রাজা থাকতেন এখানকার দুর্গে। আর আগে যেখানে দুর্গ ছিল এখন সেখানে রয়েছে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। ধরাশায়ী দেওয়াল যেন এখনও কান পেতে আছে, কাকনদী পেরিয়ে মহেন্দ্র কি আসছেন লোদ্রবায়?

মনে হবে যেন গল্প শুনছি। গল্পে অভাব নেই রাজস্থানে। চারণেরা শুধু বীরগাথা শোনাতেন না, প্রেমগাথাও শোনাতেন তার সঙ্গে। উষর জীবনের একঘেয়েমি দূর হত। ইতিহাস অপ্রয়োজনীয় বোধে ঘটনার ঘনঘটা থেকে প্রেমকে বাদ দিয়ে জীবনকে গ্রহণ করেছে, ভাট-চারণেরা ঠিক তার বিপরীত। প্রেম ছাড়া কি জীবন হয়? তাঁরা একটি জীবনকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য রাজাদের ভালোবাসার কথাও শোনাতেন সেজন্যই সেখানকার প্রণয়কাহিনীগুলো একেবারে হারিয়ে যায়নি। যেমন, মুমল ও

মহেন্দ্রর প্রেমকাহিনী। গল্প বলেই ধরে নেওয়া যেত কিন্তু লোদ্রবায় আজও রয়েছে মুমল কি মেড়ি অর্থাৎ মুমলের মায়ামহল। যে রাজকন্যার অস্তিত্ব নেই তার কি মহল থাকে? কাজেই বোঝা যায়, একদা এ কাহিনী সত্য ছিল। ইতিহাসের কাঁটা বিছনো পথে তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হলেও কিংবদন্তির সরণি পৌঁছে যায় মুমলের হাভেলির সামনে। যেখানে নিজের খেয়ালখুশি মতো থাকতেন রাজকুমারী মুমল। লোদ্রবার সোনালি পাথর দিয়েই বুঝি বিধাতা তৈরি করেছিলেন এই সোনার পুতুলটিকে। যেমন রূপ তেমনই বুদ্ধি আর বুঝিবা পাথরের মতো নিষ্ঠুরও।

শুরু থেকেই শুরু করা যাক। যদিও মুমলের পিতার নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি অনেকে মনে করেন, ইনি ছিলেন ভাটী যাদবের কন্যা অর্থাৎ মুমল চন্দ্রবংশীয় যাদবদের 'ভাটী' শাখার রাজকন্যা। এই বংশ পঞ্জাব থেকে লোদ্রবায় এসেছিলেন। এঁদের প্রবল প্রতাপের কথা বলে শেষ করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে এঁরা বিভিন্ন স্থানে রাজধানী তুলে নিয়ে যান। নটি জায়গার নাম শোন যায় :

মথুরা কাশী প্রগবড় গজনী অরু ভটনের।
দিগম দিরাওল লোদ্রবা নম্মো জৈসলমের।।

মুমলের সময়ে রাজধানী ছিল লোদ্রবায়। রাজধানী হবার আগেই সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে লোদ্রবা অপরিচিত ছিল না। ভাটের গান থেকে জানা যায়, প্রবল পরাক্রমী দেবরাজ ভাটী তাঁর রাজধানী তুলে আনেন লোদ্রবায়। তিনি নিজে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন ও তাঁর অধস্তন ছয় রাজার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা লোদ্রবায় ছিলেন। এঁদেরই একজনের কন্যা মুমল। ভাটীরাজারা বংশপরম্পরায় বুদ্ধিমানের কদর করতেন বলে দুসালজির দুই ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জৈসলদেবের বদলে রাজা হন তাঁর ছোটভাই বিজয়রাজ। ইনি বীর এবং বুদ্ধিমান বলে দুসালজি এঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। রাজকুমারী মুমলের ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুদ্ধির সঙ্গে তেজ আর বোকাকে অপদস্ত করার তীব্র আনন্দ।

মুমলেরা দুটি বোন। বড়বোনের নাম সুমল আর ছোট মুমল। তাঁদের ভাই ছিল কি না ভাটেরা বলেননি কেন না এ কাহিনীর সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই বলে। তখনও এদেশে মুসলিম আক্রমণ এবং শাসন শুরু হয়নি। দু-এক জায়গায় আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মাত্র। পুরুষেরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন যুদ্ধ নিয়ে। নারীরা দিন কাটাতেন অন্তঃপুরে বা রাওলায়। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের আগে তাঁরা পর্দানশিন বা চার দেওয়ালের আড়ালে পুরোপুরি বন্দিনী ছিলেন না। সুমল ও মুমল যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। দুজনেই রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী। মুমলের বুদ্ধি বেশি থাকায় সবাই তাঁকে আলাদা চোখে দেখতেন। পিতার অগাধ প্রশ্রয় তাঁকে আরও সাহসী করে তুলেছিল।

বাবার অনুমতি নিয়ে মুমল একটি আলাদা হাভেলি তৈরি করিয়েছিলেন কাকনদীর ধারে। রাজা আপত্তি করেননি। এ অঞ্চলে সবাই হাভেলি তৈরি করতে চায়। সেটাই প্রধান বিলাসিতা। মুমল তৈরি করালেন তাঁর মনের মতো মহল বা হাভেলি। মহলটি তৈরি হল লোদ্রবা থেকে এক মাইল দূরে, উত্তরে। পাশেই ছিল একটি শিবমন্দির।

আজ দুটিই ধ্বংসস্তূপ হয়ে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। কয়েকটা মূর্তি শুধু ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটির নির্মাতা লোদ্র রাজপুতেরা, ভাটীরা যাঁদের হাত থেকে লোদ্রবা কেড়ে নিয়েছিলেন।

মুমল এই জায়গাটিই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর হাভেলির জন্য। লোকে বলে, মুমলের মহলটি ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব এবং আগাগোড়া রহস্যে মোড়া। আরও শোনা যায়, অভিনব গৃহটি ছিল একলস্তম্ভী বা একটিমাত্র স্তম্ভের ওপর। চারদিকে ভুলভুলাইয়ার মতো আসল নকল দরজা জানলা, অসংখ্য অলিগলি অলিন্দ সুড়ঙ্গ। কোন মানুষই সেখানে সরাসরি পৌঁছোতে পারে না। কিভাবে একলস্তম্ভী কক্ষে পৌঁছোতে হয় জানত মাত্র তিনজন, মুমল নিজে, তার বোন সুমল ও মুমলের খাসদাসী। মুমলের মাতা পিতাও জানতেন না। যে কোন ব্যক্তিই নিজের হাভেলির রহস্য গোপন রাখতে পারতেন, সেটাই ছিল দস্তুর। যদিও অধিকাংশ মানুষ চাইতেন অপরের ঈর্ষা ও সম্ভ্রম কুড়োতে। তাই লোক দেখানো আড়ম্বরও কম ছিল না। অপরকে হাভেলি দেখিয়ে খুশি হতেন অনেকে।

মুমলের মহলের আশেপাশে খুব বেশি জনবসতি ছিল না। স্বচ্ছতোয়া কাকনদী আর শিবমন্দিরের পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রমোদভবন। শুরুতে হয়ত দিদি আর দাসীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। দিনের শেষে কোনদিন ফিরে যেতেন পিতার রাওলা বা রাজ অন্তঃপুরে আবার মাঝে মাঝে থাকতেন নিজের হাভেলিতে। সুমলের বিয়ে হয়ে গেল এক সময়। ধুমধাম করে। পিতা আদর করে বললেন, ‘আমার মুমল বড় বুদ্ধিমতী। ওর বর ওই খুঁজে নেবে।’ গওনার পরে সুমল চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। মুমল মেতে উঠলেন অন্য এক খেলায়। তিনি ঠিক করলেন, দিদির মতো তিনি যে কোন রাজপুতের গলায় মালা দিয়ে ঘোমটা টেনে বউটি সেজে শ্বশুরবাড়ি যাবেন না। বুদ্ধির পরীক্ষায়, সাহসের পরীক্ষায় যিনি জয়ী হবেন তাঁর গলাতেই তিনি মালা দেবেন।

মুমলের রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল মরুভারতের সর্বত্র। সুমলের চেয়েও রূপসী তিনি। রূপসী এবং বুদ্ধিমতী। এমন দুর্লভ ঘটনা ঘটে না বড় একটা। অনেক রাজাই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন দুর্লভ কুসুমটিকে সংগ্রহ করে নিজের রাওলা সাজাবার জন্য। মনে মনে প্রমাদ গুনলেন লোদ্রবারাজ। কাকে মেয়ে দেবেন তিনি? যে বঞ্চিত হবে সেই তাঁর শত্রু হয়ে উঠবে। মুমলের পিতা হয়ে লোদ্রবারাজ প্রকারান্তরে বিপদেই পড়লেন শত্রুবৃদ্ধির আশঙ্কায়। তাই যখন শুনলেন তার মেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, নিছক রমণী সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য কোন রাওলায় তিনি যাবেন না, তখন তিনি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তাঁদের পরিবারে কুমারী কন্যার বয়স বাড়লে কোন ক্ষতি নেই। মেয়ের নিজের পছন্দ অপছন্দই মুখ্য।

মুমলের প্রতিজ্ঞাটি বড় বিচিত্র। যে পুরুষ তাঁর মায়া-হাভেলিতে কোথাও না থেমে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সব দরজা পার হয়ে পৌঁছোতে পারবেন তাঁর একলস্তম্ভী কক্ষে, তারপর সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন, মুমল বরণ করবেন তাঁকে। গৃহপ্রবেশের রহস্যভেদই আসল কথা। যিনি প্রতিযোগিতায় নামবেন অথচ হেরে যাবেন

তাঁকে বন্দি করে রাখা হবে লোদ্রবার কারাগারে। প্রথমে ব্যাপারটা লোদ্রবারাজের কাছে স্বস্তির মনে হলেও পরে তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। মুমলের পাণিপ্রার্থী হয়ে দূর দূরান্ত থেকে, ইরান, আরব, ইরাক, আফগানিস্তান, সিন্ধু গুজরাট, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য থেকেও রাজপ্রতিনিধিরা এলেন। স্থানীয় অর্থাৎ মরুভারত থেকে তো রাজা এলেনই কিন্তু ছোট বড় কোন রাজাই মুমলের হাভেলির রহস্যভেদ করতে পারলেন না। এঁরা সকলেই কি লোদ্রবার কারাগার ভরে তুললেন? তাও কি হয়? লোদ্রবারাজ সকলকেই মুক্তি দিতেন। ভান করতেন, মেয়ের খামখেয়ালের জন্যই তিনি তাঁকে জামাই করতে পারলেন না। তিনি অবশ্য আপামর জনসাধারণকে বুদ্ধির পরীক্ষায় আহ্বান জানাননি। ব্যাপারটা রাজারাজড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবুও সাধারণ মানুষ, যারা কৌতূহলী হয়ে এসেছিল তাদের পচে মরতে হল কারাগারে।

যে যত দুষ্প্রাপ্য সেই তত কামনার ধন হয়ে ওঠে। লোদ্রবার রাজকুমারী মুমলের নাম ভাটেদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র। সিন্ধুপ্রদেশের অমরকোট গ্রামের মহেন্দ্র নামের এক সৌটা রাজপুত যুবকের কানেও মুমলের অপরূপ কথা পৌঁছল। মহেন্দ্র রাজা বা রাজপুত্র না হলেও অভিজাত পরিবারের সন্তান। অত্যন্ত সুদর্শন, বীর যোদ্ধা। তাঁর বিশেষ একটি গুণ ছিল, তিনি অতি দক্ষ উটচালক। মরুভূমিতে উটের আদর সবচেয়ে বেশি, উটচালকেরও। দৈবদুর্বিপাকে মহেন্দ্রর পিতা অন্ধ এবং একজন সাধারণ রাজপুতের মতো জীবনযাপন করতেন। যদিও ভাটেরা তাঁদের গানে তাঁকে অন্ধরাজা বলতেন। মনে হয় তিনি ছিলেন ঠাকুর। রাজার যে ছেলে রাজা হয় না, রাজপুতানায় তাঁদের বলা হত ঠাকুর। জমি ও পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ পেয়ে নিজের গ্রামে তাঁরা দোর্দণ্ড প্রতাপে বাস করতেন। রাজপুত রাজাদের অনেক রানি, অনেক পুত্র কন্যা, কাজেই ঠাকুরের সংখ্যাও কম ছিল না। মহেন্দ্র অবশ্য পিতার একমাত্র সন্তান। অমরকোটে পিতা, মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতেন। একটি সুখী সচ্ছল পরিবার। হঠাৎ ভাট বা ঢুলির গান তাঁর কানের মধ্য দিয়ে একেবারে প্রাণের মধ্যে পৌঁছল, ভাটের বর্ণনার গুণে রূপসী মুমলের অধরা মাধুরী তাঁর ঘুম কেড়ে নেয়। শয়নে স্বপনে তিনি মুমলকে কল্পনা দিয়ে গড়েন। প্রতিদিন ভাবেন লোদ্রবা যাবার কথা। শেষে বাসনাই জয়ী হয়। একদিন উঠে বসেন প্রিয় চিখলের পিঠে। থর মরুভূমির সেরা উট চিখল, সবচেয়ে দ্রুতগামী, সবচেয়ে নির্ভুল। মরুভূমিতে পথ চিনে চলে উট, বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে, তার চালক অনেক সময় সে পথের হদিশ জানে না। তার মোটামুটি একটা আন্দাজ থাকে আর উটের সঙ্গে সমঝোতা, তাতেই কাজ চলে যায়। মহেন্দ্রর সঙ্গে চিখলের যোগ বেশি। চিখলের কানে মাথায় হাত বুলিয়ে মহেন্দ্র তাকে বোঝালেন কাকনদীর অবস্থান। ছুটে চলল চিখল।

কাকনদীর তীরে এসে চিখলকে এপারে রেখে মহেন্দ্র নদী পার হয়ে যখন শিবমন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন নিস্তব্ধ দুপুর গড়িয়ে চলেছে বিকেলের দিকে। মুমলের একলস্তম্ভী হাভেলি যেন ঘুমিয়ে আছে। শুধু মুমল ঝুল বারান্দার ঝরোখার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলেন কাকনদীর কাকচক্ষু জলের দিকে। অলস আনমনা মুমল। শিবমন্দিরের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র দেখলেন তাঁকে। এক

পলক দেখে মনে হল, একে সামনে থেকে একবার দেখতে না পেলে জীবনই বৃথা। আর তখনই তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, মরুভূমির সোনার পুতুলটিকে নিজের কঠোর বাহুবন্ধনে ননীর মতো কোমল কলে ফেলার।

অমরকোটে ফিরে এসেও মহেন্দ্রর স্বপ্ন দেখা শেষ হল না। এতদিন তিনি শুধু মুমলকে দেখতে চাইতেন। প্রবল কৌতূহলই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল লোদ্রবায়। কিন্তু মুমলকে দেখেই তিনি তাঁর প্রেমে পড়লেন। ইতিপূর্বে অনেক রাজা মহারাজা অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছেন কিংবা বন্দিজীবন যাপন করছেন, অসফল হলে তাঁর অবস্থাও যে তাই হবে, সে কথা মনে রেখেও মহেন্দ্র মুমলের কথা ভাবতে লাগলেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, তাঁরা কেউ মুমলকে চোখে দেখেননি, মহেন্দ্র দেখেছিলেন। অন্যদের কাছে যা ছিল মর্যাদার লড়াই মহেন্দ্রর কাছে তা প্রেমের পরীক্ষা। কয়েকদিন ভেবে মহেন্দ্র স্থির করলেন তিনি আবার যাবেন কাকনদী পেরিয়ে লোদ্রবায়। মুমলের মায়ামহলে তিনি ঢুকবেনই। বীরপুরুষ পুরুষকারে বিশ্বাসী। মহেন্দ্র বুদ্ধিমানও ছিলেন। রাজা বা রাজপুত্রদের মতো তিনি সরাসরি হাভেলি প্রবেশের কথা না ভেবে স্থির করলেন, মন্দিরের কাছে বসে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে তবে হাভেলিতে প্রবেশ করবেন।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। মহেন্দ্র বাড়িতে বলে গেলেন তিনি কয়েকদিনের জন্য দূরে যাচ্ছেন। অন্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' মহেন্দ্র বললেন, 'আমি যাত্রী নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে।'

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হলেন। বহু তীর্থযাত্রী হিংলাজ যায়। চিখলকে নিয়ে মহেন্দ্র তাদের সঙ্গে যান। এমনই কোথাও হবে হয়ত। মহেন্দ্র চলে গেলেন লোদ্রবা। কাকনদী পেরিয়ে শিবমন্দিরের সামনে গাছের নীচে বসে রইলেন কয়েকদিন। মুমলের দেখা পেলেন না। দেখলেন মুমলের খাসদাসীকে। নিয়মিত আসে যায় সে। একদিন সে হাভেলি থেকে বেরোতেই মহেন্দ্র তাকে ধরলেন। টেনে নিয়ে গেলেন নির্জন মন্দিরের ভিতরে। কাতরভাবে বললেন, 'আমায় বল, বলে দাও এই হাভেলিতে ঢোকা যাবে কি করে, তা না হলে আমি মরে যাব।'

দাসী বলল, 'সে আমি পারব না। তারপর আমার গর্দান যাবে যে।'

মহেন্দ্র তাকে ছাড়েন না। জোর করে হাতে গুঁজে দেন আস্ত রুপোর টাকা। প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। দাসী আসে যায়। দেখে গাছতলায় চুপ করে বসে আছে রূপবান পরদেশি যুবকটি। মায়া হয়। কার জন্য প্রাণপাত করছে? ও কি জানে মুমলের চেহারাটা নরম-সরম হলে হবে কি মনটা পাষাণের মতো কঠিন। আবার কোন কোনদিন করুণা হয় মহেন্দ্রকে দেখে। আর কতদিন মুমল কুমারী বসে থেকে বর খোঁজার খেলা খেলবে? দাসী বলে, 'কেন বোকার মতো এখানে বসে আছ? বাড়ি ফিরে যাও। জান না মুমল রাজার মেয়ে, তার কত খামখেয়াল। সে কি তোমার মতো গরিবকে বিয়ে করে তোমার ঘরে গিয়ে বাজরার রুটি সেঁকবে তোমার জন্য?'

মহেন্দ্র বললেন, 'আমি আর কিছু চাই না। ওই সোনার পুতুলটিকে শুধু একবার সামনে থেকে বসে দেখে যেতে চাই। ওকে আমি একবার দেখেছি। দেখে আমি সব

কিছু হারিয়েছি। তুমি দয়া না করলে কদিন পরে কাকনদীর জলে আমার মৃতদেহ ভাসতে দেখবে।'

'আহা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি দীর্ঘজীবী হও। তা অন্য রাজাদের মতো তুমি হাভেলিতে ঢুকতে না গিয়ে এখানে বসে আছ কেন?'

'আমি রাজা উজির নই বলেই। আমার মন বলল, তুমি প্রসন্ন হলেই আমার ইচ্ছাপূরণ হবে।'

দাসী মনে মনে খুশি হল। সে মুমলকে মানুষ করেছে। তার ভালোমন্দও ভাবে। পতি নির্বাচনের এই নিষ্ঠুর খেলা তার ভালো লাগে না। তাছাড়া মুমল চেয়েছে এক বুদ্ধিমান পুরুষকে। এই ছেলেটি যে বুদ্ধিমান তা তো বোঝাই যায়। অন্যদের মতো হুড়মুড় করে হাভেলিতে ঢোকার চেষ্টা করে মাথা ফাটায়নি। গরিব যদি হয়ও, রাজার ছেলের মতো সুন্দর তো। মুমলের সঙ্গে ভারি মানাবে। সে খুশিমনেই মহেন্দ্রকে মন্ত্রগুপ্তির সন্ধান দিয়ে বিদায় নিল।

এরপর মহেন্দ্রর শুধু এগিয়ে যাবার পালা। ধীরেসুস্থে তিনি এগোলেন হাভেলির দিকে। হেরে গেলেই বন্দিজীবন। কিছুতেই তা হবে না। মুমলকে আর একবার চোখের দেখা দেখতেই হবে। প্রথমে তিনি দরজা পেরোলেন, ভয়ানক দর্শন দুটি বাঘ বিকট গর্জন করে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। দাঁড়ালেন না মহেন্দ্র, দাসীর কল্যাণে তিনি জেনেছেন বাঘ দুটি নকল, আসল বাঘের চামড়ায় খড় পুরে তৈরি করা। নিচের কাঠের পাটাতন যান্ত্রিক কৌশলে দরজায় কেউ পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এগোতে থাকে। শোনা যায় নকল বাঘের ডাক। যে জানে না, সে থমকে দাঁড়ায় কিংবা ভয় পায়, দুপা পেছোয়, মুমলের কাছে পৌঁছয় না।

মহেন্দ্র এরপরে পেলেন চারটি দরজা। একই রকম দেখতে। মহেন্দ্র ডানদিকের দরজা পেরোলেন। সর্বনাশ। এখানে শুধুই জল। কোথাও না থেমে এগোতে হবে। জলে পা রাখতেই মহেন্দ্র বুঝলেন, জয় নয় এ শুধু টালির কেরামতি। স্ফটিকের মেঝেকে জল ভেবেছিলেন দুর্যোধন আর তাতে হেসেছিলেন ভীম। এখানে রাজাদের নাস্তানাবুদ হতে দেখে হেসে কুটিপাটি হন মুমল। হয়ত ময়দানবের তৈরি বাড়িটাই তাঁর মাথায় ছিল। রাজস্থানে গোলকধাঁধার মতো বাড়ি এখনও প্রচুর। চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যও এমন গোলমেলে বাড়ি তৈরি করা হয়। মহেন্দ্র জল পার হয়ে পেলেন সরু গলিপথ। ঘন লতাপাতা, অন্ধকারে সাপ, বিছে সবই কৃত্রিম, কিন্তু জানা না থাকলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে। কোথাও না থেমে সবশেষে মহেন্দ্র পৌঁছলেন একলস্তম্ভী মিনারের ওপরতলায়।

খুব সাজানো গোছানো ঘরটিতে বসে আছেন মুমল। ঘর আলো করে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল মহেন্দ্রর। তিনি দেখলেন মুমলের মাথায় শিশফুল, কানে কুণ্ডল, গলায় চম্পাকলি, হাতে বাজুবন্ধ, কোমরে করধনি, পায়ে ঝাঁঝর। মহেন্দ্রকে আচমকা সেখানে প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠলেন মুমল। মনে হল, এতদিন এই মানুষটির জন্যেই তিনি প্রতীক্ষার বাসর সাজিয়ে বসে আছেন। মুগ্ধ হলেও বুদ্ধি হারালেন না। বরং বুক দুরুদুরু করে উঠল ভয়ে। এতক্ষণ পেরেছে, শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে তো? বাঁধনি

চুনরির জমকালো আঁচলে মুখ ঢাকলেন মুমল। কোন কথা না বলে মেহেদি রাঙানো পদ্মের মৃণালের মতো হাতটি দিয়ে সামনের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন আগন্তুককে। মহেন্দ্র সেখানে না বসে বসলেন মুমলের পালঙ্কে। এটাই ছিল শেষ পরীক্ষা। সামনের আসনে বসলেই মহেন্দ্র নিক্ষিপ্ত হতেন অন্ধকূপে। এরপরে উত্তর দেবার পালা। মুমলের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন মহেন্দ্র। সেগুলো অতি সাধারণ হেঁয়ালি 'একথালা সুপারি, গণিতে নারে ব্যাপারি' বলত কী গোছের। দাসী না বলে দিলেও মহেন্দ্র সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। হাভেলির রহস্যভেদই ছিল আসল ব্যাপার।

হার মানলেন মুমল। খুশিতে টলটল করে উঠল তাঁর মুখটি। ভাবলেন, আজ তাঁর প্রতিজ্ঞা সার্থক হল। যেমনটি চেয়েছিলেন, তাই পেলেন। মহেন্দ্রর হাতে তুলে দিলেন পান সাজানো থালি। মহেন্দ্রর মনে পড়ল, দাসী বলেছিল, 'সব শেষে যদি তোমায় পান সাজানো থালি দেয় তবে বুঝবে তোমার পরীক্ষা শেষ। বরমালা তুমিই পাবে।' মহেন্দ্রর মনে হল, তাঁর দুঃসহ প্রতীক্ষার শেষ হল। এই সোনার পুতুলটিকে দেখতেই এসেছিলেন তিনি। ভাগ্যলক্ষ্মীর বদান্যতায় বরণমালা হয়ে উঠল সোনার পুতুল। এখন কি করবেন তিনি?

কিছুক্ষণ মুমলের দিকে অবাক চোখে চেয়ে থেকে মহেন্দ্র বললেন, 'তোমার জন্যে, তোমাকে একবার দেখবার জন্যে আমি জীবনও দিতে পারতাম রাজকুমারী।'

মুমল নত চোখে লাজুক হেসে বললেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনাকে পতিরূপে পেয়েছি।' আড়াল থেকে তার কথা শুনে দাসী হাসি চাপল আর সখীরা গালে হাত দিল। মুমলকে এত নম্র, এত কোমল তারা কোনদিন দেখেনি।

মহেন্দ্র বললেন, 'তার আগে আমার কথা শোন। আমি রাজা বা রাজার ছেলে নই। আমি অতি সাধারণ মানুষ। লোদ্রবারাজ কখনও আমাকে তাঁর মেয়ে দিতে রাজি হবেন না।'

মুমল বললেন, 'আমি আপনাকে দেখেই মনে মনে পতিরূপে কল্পনা করে নিয়েছি। তার আর নড়চড় হবার জো নেই। হাভেলিতে প্রবেশ করার কঠিন পরীক্ষাতেও আপনি জয়ী হয়েছেন। আমার পিতা নিশ্চয় রাজি হবেন।'

আড়াল থেকে এসব কথা শুনে দাসী স্থির করল, মুমলকে বোঝাতে হবে, এতে মহেন্দ্রর জীবন সংশয় হতে পারে। সে পাথরের থালায় ফল সাজিয়ে নিয়ে এল দুজনের জন্যে। বলল, 'তোমরা পরস্পরকে বরণ করে নিলে। আজ একে অপরের মুখে কিছু তুলে দাও। রাজামশাই জানবার আগেই গন্ধর্বমতে বিয়ে কর। মনের মিলই হল আসল। তোমরা যখন দুজনে দুজনকে ভালোবেসেছে তখন সবাইকে জানাবার দরকার কি?'

দুজনেরই মনে ধরল দাসীর কথা। মুমল সখীদের গাঁথা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন মহেন্দ্রর গলায়। মহেন্দ্র বধূর মুখ দেখলেন ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে, চাঁদের আলোতে। মুমলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া কেউ জানল না, মুমল তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন। স্বপ্নের মতো কয়েকটা দিন কেটে গেল। দুজনেই ভুলে গেলেন জগৎ

সংসারকে। তারপর একদিন মহেন্দ্র মুমলের শুকতারার মতো উজ্জ্বল চোখ দুটিতে চোখ রেখে বললেন, 'এবার আমায় বিদায় দাও।'

মুমল তাঁকে ছাড়তে চান না। বললেন, 'না, প্রিয়তম, তোমায় ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারব না।'

মহেন্দ্র বললেন, 'আমিও পারব না। ফিরে আসব প্রতি রাতে। আবার ভোর হলে অমরকোটে ফিরে যাব।'

মুমল ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কি করে আসবে তুমি? শুনেছি এখান থেকে অমরকোট বহু দূরে।'

'আমি আসবই। তুমি দেখো।' মহেন্দ্র জানেন, অমরকোট থেকে লোদ্রবা অনেক দূরে ঠিকই কিন্তু চিখল সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

মুমলের আশঙ্কার শেষ নেই। শুধু বলেন, 'এতখানি পথ।'

মহেন্দ্র বললেন, 'আমি আসবই। আমার উট চিখল দারুণ ছুটতে পারে। আমি তার পিঠে চেপে আসব। কোন ভয় নেই। তুমি তোমার হাভেলির দরজা খুলে রেখো।'

'খোলা থাকবে। এখানে প্রবেশের কৌশল কেউ জানে না। যারা হাভেলি তৈরি করেছে তারাও না।'

'সে কি করে হয়?'

'কোন একজন শিল্পী সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল না। চারজন স্থপতি আলাদাভাবে এর নকশা তৈরি করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক এখানে কাজ করেছে, কেউ অপরের কাজ সম্বন্ধে কিছু জানে না। কাজেই দরজায় হাত দিলেই দরজা খুলে যায়। তুমি যখন খুশি এস।'

মহেন্দ্র চিখলকে নিয়ে বিদায় নিলেন। সারাদিন অমরকোটে থাকেন। সন্ধ্যা হলেই চিখলকে নিয়ে চলে আসেন লোদ্রবায়। মুমল পথ চেয়ে বসে থাকেন। কখনও রাতের অন্ধকারে চলে আসেন কাকনদীর ধারে, মহেন্দ্রকে বিদায় দিতে। কখনও মহেন্দ্র তাঁকে নিয়ে উঠে বসেন চিখলের পিঠে। নির্জন মরুর বুকে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। প্রেমিকযুগলের বুকেও দুর্বার প্রেম ঝলসে ওঠে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিন কেটে যায়।

আরও কিছুদিন কাটে। লোদ্রবারাজ ব্যস্ত যুদ্ধ নিয়ে। তিনি মহেন্দ্রর কথা জানতেও পারলেন না। কিন্তু মহেন্দ্রর অন্ধ পিতার মনে সন্দেহ জাগল। তিনি নিজের দুর্ভাবনার কথা বললেন স্ত্রীকে। বললেন, 'মহেন্দ্র কি আজকাল প্রতিদিনই বাইরে যায়?' তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন মহেন্দ্রর স্ত্রীকে। বধূ নতমুখে জানালেন, তাঁর স্বামী প্রতি রাতেই শয়নকক্ষে অনুপস্থিত থাকেন, বাড়ি ফেরেন শেষরাতে। কোথায় যান তা কোনদিন বলেননি। শাশুড়ি বধূকে বকলেন, 'কেমন বউ তুমি? জিজ্ঞেস করতে পারনি? কেঁদে কেটে হাট বাঁধাতে পারনি? না বলে যাবে কোথায়?'

বধূ বললেন, 'রাতে যখন ঘরে ফেরেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে থাকে। চুল থেকে জল পড়ে। খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরেন। আর ঘুমিয়ে পড়েন।'

সব শুনে মহেন্দ্রর পিতা মাতা দুজনেই যেন অকূল পাথারে পড়লেন। বৃদ্ধ দারুণ ভয় পেলেন। কোথায় যায় মহেন্দ্র। লোদ্রবায় নয়ত? সব্বোনাশি রাজকুমারীর মায়া হাভেলিতে গিয়ে, মরীচিকার পিছনে ঘুরে ঘুরে শেষে হয়ত প্রাণ দেবে। ব্যাপারটা কাউকেই তিনি বললেন না। ভাবতে বসলেন। তাঁর অনুমান মিথ্যা নয় কিন্তু মহেন্দ্র তো হেরে যাননি, রাজকুমারীকে জিতে নিয়েছেন। সে কথা তিনি বাড়ির লোকেদের কাছে কেন যে বললেন না কে জানে?

ভেবে ভেবে বৃদ্ধ ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, মহেন্দ্র চিখলকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজেই বললেন, 'তুমি রাতে কোথায় যাও বল তো? চিখলকে নিয়ে? আজ থেকে চিখল খেতের ফসল পাহারা দেবে।'

মহেন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখলেন। চিখলকে না পেলে তাঁর চলবে কেন? প্রতিদিন মুমলকে তাঁর দেখা চাই। মুমলকে না দেখে তিনি থাকতে পারেন না। তাঁকে না দেখলে রাজকুমারীরও একই দশা। বললেন, 'খেত পাহারার জন্যে চিখলের কি দরকার? আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'না, ফসল চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমার কাউকে বিশ্বাস নেই। চিখলের মতো হুঁশিয়ার উটই এখন আমার দরকার।'

মহেন্দ্র আর কী করবেন? বন্ধুদের ধরে করে অনেক কষ্টে সার নামে আর একটা উট জোগাড় করে তার পিঠে সওয়ার হয়ে বসলেন লোদ্রবা যাবার জন্যে। সার তো চিখল নয়, সে লোদ্রবা পৌঁছল নিশুতি রাতে।

ওদিকে লোদ্রবাতে সেদিন মুমলের হাভেলিতে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন সুমল। মুমল সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। বোনের মুখে সব কথা শুনে দিদি তো মহাখুশি, বললেন, 'আমিও দেখব তাঁকে।' মেয়েদের মনে কৌতূহল একবার জাগলে তা না মেটা পর্যন্ত চেপে রাখা কঠিন। সুমল অনেক বোঝাল দিদিকে, 'আজ নয়। আগে তাকে বলি তারপরে দেখা কোরো। না হলে সে ভয় পাবে পাছে আমাদের বাবা জানতে পারবেন ভেবে।' সুমল নিজের গোঁ নিয়ে বসে রইলেন। কতদিন পরে এসেছেন, আবার কবে আসবেন কে জানে? মুমল বললেন, 'তা হলে এক কাজ কর। তুমি ঢোলি সেজে বসে থাক।' রাজস্থানে ঢোলির ভূমিকা কম নয়। সে নানা জায়গায় খবর পরিবেশন করে গান গেয়ে, ঢোল বাজিয়ে। ভাটের সঙ্গে তার তফাত সামান্যই। মুমল বললেন, 'তুমি ঢোলি সেজে থাকলে মহেন্দ্র তোমাকে চিনতে পারবে না। খবর শোনাতে কোন ঢোলি এখানে এসেছে ভাববে বড়জোর। আর তোমারও ওকে দেখা হয়ে যাবে।'

সুমল খুব খুশি হয়ে পুরুষের বেশে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঢোলি সাজলেন, নকল গোঁফ লাগালেন, গলায় ঢোল, হাতে সারিন্দা, কোমরে লাল গামছা। দুবোনের হাসাহাসিতে অনেক সময় চলে গেল। কিন্তু কোথায় মহেন্দ্র? তাঁর আসার সময় পেরিয়ে গেল। অন্য দিন হলে মুমলের বড় ভাবনা হত, দুচোখ ভরে জল আসত। আজ কথায় কথায় সময় কেটে গেল। মুমল বললেন, 'আজ বোধহয় আসতে পারল না।' সুমল দুঃখ করে বলল, 'আমার কপাল।' সারাদিন হেসে খেলে কাটিয়ে দুজনেরই ঘুম এল চোখ জুড়ে। কতক্ষণ আর জেগে বসে থাকবেন। নিশুতি রাতে তারাভরা

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁরা গলাগলি করে দুবোনে একসঙ্গে শুয়ে পড়লেন পালঙ্কের ওপরে। ঘুমচোখে সুমলের আর পোশাক বদল করা হল না।

মহেন্দ্র এলেন শেষরাতে। হাভেলিতে প্রবেশ করার কৌশল তাঁর জানা। সোজা চলে এলেন মুমলের ঘরে। এতক্ষণ কল্পনায় দেখছিলেন, প্রতীক্ষা করতে করতে কেঁদে কেঁদে মুমল ঘুমিয়ে পড়েছেন, চোখে জলের দাগ এখনও শুকোয়নি। তিনি মুছে দেবেন আলতো হাতে আর মুমল জেগে উঠে হর্ষে বিস্ময়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরবে। এসে দেখলেন মুমল ঘুমোচ্ছেন আর তাঁর সঙ্গে ও কী একজন ঢোলি শুয়ে আছেন এক বালিশে মাথা রেখে। খামখেয়ালি রাজকুমারীর খেয়ালখুশির নমুনা দেখে শিউরে উঠলেন মহেন্দ্র রাগে, দুঃখে। এই তাহলে মুমলের ভালোবাসা? এইজন্যই নির্জন হাভেলিতে নিশাচরীর মতো দিন কাটায়? এর জন্য তিনি নিজেকে বিপন্ন করতে বসেছিলেন? এর জন্য তিনি প্রতি রাতে অমরকোট থেকে লোদ্রবায় ছুটে এসেছেন? ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি হাভেলি থেকে বেরিয়ে এলেন। মুমলকে ডাকলেন না। স্বেচ্ছাচারিণীর প্রমোদভবনে রাত কাটাতে তিনি আসেননি। আসবেনও না। কাকনদীর জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, ব্যভিচারিণী মুমলের সঙ্গে তিনি আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না।

পরদিন কাকনদীর তীরে উটের পায়ের টাটকা দাগ দেখে চমকে উঠলেন মুমল। তবে কি মহেন্দ্র এসেছিলেন? এলেনই যদি তাঁকে না ডেকে ফিরে গেলেন কেন? দিনের পরে রাত এল মহেন্দ্র আর এলেন না। ভাবনায় ভাবনায় মলিন হয়ে গেলেন মুমল। সুমল গোপনে লোক পাঠালেন মহেন্দ্রের সন্ধানে, কিন্তু রাজা-উজির নয় সাধারণ মানুষ, তার খোঁজ পাওয়া সহজ নাকি? তবু শেষ পর্যন্ত খবর পেলেন, অমরকোটে মহেন্দ্র নিজের পরিবারের সঙ্গে সুখেই বাস করছেন। বিরহে উন্মাদ হয়ে মুমল বললেন, 'চল দিদি, আমরা অমরকোটে যাই। তাঁকে না পেলে আমি বাঁচব না।'

সুমলই ব্যবস্থা করলেন। তারপর তীর্থে যাবার নাম করে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে লোকজনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দুই বোন পৌঁছলেন অমরকোটে। শোনা যায়, মুমল শেষে খুঁজে পেয়েছিলেন মহেন্দ্রকে। ছুটে এসে ধরলেন তাঁর হাত, 'ফিরে এস, ফিরে এস প্রিয়তম। কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এলে?' কদিন আগের সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী, বুদ্ধিমতী মুমল মহেন্দ্রর জন্যে কেঁদে বুক ভাসালেন। কিন্তু মহেন্দ্র তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত করে ফিরিয়ে দিলেন। বুকে তাঁর মুমলের অম্লান স্মৃতি তবু স্বৈরিণীর কাছে নত হবেন না অবুঝ প্রেমিক। চোখে আঁচল চেপে মুমল ফিরে এলেন। এত বড় মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করার ইচ্ছেটুকুও তাঁর রইল না। রাজার মেয়ে, তাঁর পক্ষে এর চেয়ে বেশি সহ্য করা সম্ভব হল না।

সুমল ছাড়লেন না। তিনি বললেন, 'আমি এর শেষ দেখে তবে যাব।' তিনি আবার অমরকোটে ফিরে এলেন। মুমলের চেয়ে তাঁরও বুদ্ধি কিংবা সাহস কম ছিল না। তাছাড়া সব ব্যাপারটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তিনি নিজেকেও মনে মনে দায়ী করেছিলেন। সব শুনে তিনি বুঝলেন, বোকা মহেন্দ্র মুমলকে ভুল বুঝে তাঁর জীবনটা নষ্ট করলেন। আসলে তো মুমল আর কাউকে ভালোবাসেনি, ঢোলির বেশে সুমলকে

দেখেই মহেন্দ্র এত বড় ভুল করলেন। তিনি স্থির করলেন, তিনি বোকা মহেন্দ্রর ভুল ভাঙাবেন। বিনা দোষে মুমলকে কলঙ্কিত হতে দেবেন না। আর সেটাই হবে মহেন্দ্রর সবচেয়ে বড় শাস্তি। অমরকোটে এসে তিনি সেই ঢোলির পোশাকটি আবার পরলেন এবং সুললিত সুরে গান বাঁধলেন এক রাজকুমারী ও তার বোকা প্রেমিকের। সেই গান তিনি শোনাতে লাগলেন অমরকোটের হাটে-মাঠে-পথে-ঘাটে সর্বত্র। সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে সে গান। একদিন মহেন্দ্রও শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ঢোলি তাঁর কথাই শোনাচ্ছে। ঢোলিকেও চিনতে পারলেন তিনি, কটুকণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন তাকে। সুমল ছাড়বার পাত্রী নন, তিনি মহেন্দ্রর সামনেই খুলে ফেললেন ঢোলির পাগড়ি, নকল গোঁফ। বললেন, 'আমি মুমলের দিদি সুমল। মুমল বুদ্ধিমান বর চেয়েছিল কিন্তু তুমি একেবারেই বোকা। সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই মুমলকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। এর জন্য সারাজীবন তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে।'

সুমলের সব কথা শোনার আগেই মহেন্দ্রর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। তিনি নিজের চরম ভুল বুঝতে পেরেই উন্মাদের মতো ছুটে চললেন লোদ্রবার দিকে। তাঁর হারানো প্রেম, নতুন করে তাঁকে নিয়ে চলল মুমলের কাছে। কি করে সেই সোনার পুতুলটি তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল আর তিনি কি না হৃদয়হীনের মতো তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। 'মুমল, তুমি আমাকে একটি বারের জন্য ক্ষমা কর। আর কখনও আমার ভুল হবে না। তুমি রাজার মেয়ে, আমি গরিবের ছেলে তবু আকাশের চাঁদ হয়ে তুমি আমার হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছিলে। আর একবার তুমি আমার জীবনে ফিরে এস।' অমরকোট থেকে পায়ে হেঁটে লোদ্রবায় এসে পৌঁছলেন মহেন্দ্র। কাকনদী পেরোলেন। কিন্তু কোথায় মুমল? তাঁর হাভেলি পড়ে আছে নিরানন্দপুরী হয়ে। সব মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মতো চলে গিয়েছেন অভিমানিনী মুমল। চলে গিয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। মহেন্দ্রর ডাক কোনদিনই তাঁর কানে পৌঁছবে না। হাহাকার করে দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠোকেন মহেন্দ্র।

তারপর? লোকে বলে, মরুভূমির ঝড় হয়ে আজও মহেন্দ্রর হাহাকার আছড়ে পড়ে মুমলের হাভেলির ভাঙা দেয়ালে। কাকনদীও সরে গিয়েছে। লোদ্রবা ত্যাগ করে ভাটি রাজারা রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন জয়সলমিরে। স্থানটিও এখন পরিত্যক্ত। ভাঙা শিবালয়ের ইতস্তত দু-চারটি মূর্তি আর হাভেলির ধ্বংসাবশেষটুকু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মরুভারতের মানুষের সুখদুঃখের স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছেন মুমল আর মহেন্দ্র। প্রায় হারিয়ে যাওয়া কাকনদী আজও তাঁদের গল্প শোনায়।

মুহম্মদ আদিল শাহ্ ও রম্ভাবতী

বিজাপুরের বুকে গোলগুম্বজ যতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবেন তার নির্মাতা মুহম্মদ আদিল শাহ ও তাঁর প্রিয়তমা রম্ভাবতী। ইতিহাসের পাতায় রম্ভাবতীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়ার কথাও নয়, তবু তিনি ছিলেন। থাকবেন। অস্বীকার করা যাবে না কোনদিন। আদিলশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানের অমর কীর্তিটির মাঝখানে তিনি বেঁচে থাকবেন কিংবদন্তির মতো।

দক্ষিণের তিনটি শাহী বংশ কায়েমী রাজত্ব করেছে দীর্ঘদিন। আহমদনগরের নিজামশাহী, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী আর বিজাপুরের আদিলশাহী। মুহম্মদ যখন সিংহাসনে বসলেন তখন বিজাপুরের খ্যাতি মুগল সম্রাট শাহজাহানকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেছিলেন আরও কয়েক বছর পরে। মুঘল আনুগত্য নামে মাত্র স্বীকার করে স্বাধীনভাবেই জীবন কাটিয়েছিলেন মুহম্মদ। তিনি যখন সুলতান হলেন তখন বিজাপুর আরও একটি কারণে বিখ্যাত। তাঁর পিতা ইব্রাহিম সুশাসক, শিল্পানুরাগী, পত্নীপ্রেমিক। তাঁর জীবনের দুর্লভ সৌভাগ্যের মতো এসেছিলেন বেগম তাজ সুলতানা। সেই বেগমের জন্য তিনি একটি বড় মাপের সমাধিসৌধ বা রওজা নির্মাণ করছিলেন। অপূর্ব সুন্দর সেই স্থাপত্য আজও বিজাপুরে গেলে চোখে পড়বে। কিন্তু সমাধি শেষ হবার আগেই মারা গেলেন ইব্রাহিম। বেগম বললেন, 'আমার জন্যে যে রওজা তৈরি হয়েছে সেখানেই সুলতানকে দাফন করা হবে। আজ থেকে এর নাম হবে ইব্রাহিম রওজা।' তাই হল। অর্ধসমাপ্ত ইমারত আর মসজিদটি তৈরি করালেন বেগম স্বয়ং। মৃত্যুর পরে তাজ সুলতানা আশ্রয় নেন স্বামীর পাশে। এই অপূর্ব সুন্দর ইমারতটিই বাদশাহ শাহজাহানকে তাজমহল নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ এক তাজমহল প্রেরণা যুগিয়েছিল অপর তাজমহল নির্মাণে। এই পরিস্থিতিতে সুলতান হবার পরেই মুহম্মদের মনে নিজের জন্যে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জন্মাল। এভাবেই কেটে গেল কয়েকটা বছর।

রম্ভাবতী কীভাবে আদিলশাহী হারেমে এলেন কিংবা কবে এলেন জানা যায়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে শাহী হারেমে যেমন করে হারেমকন্যারা আসত, সেই পরিচিত পথ ধরেই এসেছিলেন তিনি। জন্মেছিলেন কোন অখ্যাত গ্রামে, দরিদ্র কুটিরে। অসামান্য রূপ ছিল সর্বাঙ্গে। মায়ের মনে হয়েছিল, স্বর্গের অপ্সরা ভুল করে জন্ম নিয়েছে মর্ত্যের দরিদ্র কুটিরে। আদর করে মেয়ের নাম দিলেন রম্ভা, রম্ভা থেকে

রম্ভাবতী। ইন্দ্রের প্রমোদকাননে সবচেয়ে লাস্যময়ী নর্তকীয় নাম রম্ভা। এত রূপসী গরিবের ঘরে মানায় না রাজার ঘরেই মানায়। তবু গরিবের ঘরে জন্ম যখন তাই একটু ঘুরপথ। প্রথমে নর্তকীর তালিম নেওয়া, তারপর সেরা সুন্দরী হিসাবে আদিলশাহী হারেমে নিজের স্থান করে নেওয়া। আবার এমনও হতে পারে, তিনি ছিলেন কোন দেবদাসীর মেয়ে। দাক্ষিণ্যাত্যের প্রতিটি মন্দিরে তখন দেবদাসীর ভিড়। বিজাপুরের পাশেই ছিল হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর, তখন পড়ন্ত অবস্থা কিন্তু এক সময়ে, অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন সেখানকার মন্দিরে ছিল অসংখ্য দেবদাসী। মুসলিম শাসকদের অনেকেই মন্দির লুঠ করে সোনাদানা আর মেয়েদের নিয়ে যেত। অপরূপা রম্ভাবতীর মন্দিরকন্যা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আসলে তাঁর নামটির জন্যেই এ কথা বেশি করে মনে হয়। রূপসী রম্ভাবতীর ছবি এখনও আছে বিজাপুরের শাহী সংগ্রহশালায়। স্নানরতা রম্ভাবতী। সুলতানের নির্দেশে এঁকেছিলেন কোন শিল্পী।

মুহম্মদ তাঁর পিতা ইব্রাহিমের মতো ভাগ্যবান ছিলেন না। বেগমদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। হারেমে শুধুমাত্র বেগমদেরই ভালোবাসার কোন দায় নেই, অন্য হারেমকন্যারা সকলেই চেষ্টা করে সুলতানের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠার। বেগমদের প্রিয়পাত্রী না হলেও চলে। মুহম্মদের প্রধান স্ত্রী জেহান বেগম বা বড়ি বেগম, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, রাশভারী। সুলতানের একমাত্র পুত্রের জননী। তাঁকে মনে মনে ভয় পান মুহম্মদ। অনেক সর্দার-ওমরাহ বড়ি বেগমের দলে। নিজের ভাই আফজল খাঁকে এনে রেখেছেন বিজাপুরে, তার পরামর্শে চলেন। সুলতান এসব একেবারে পছন্দ করেন না কিন্তু অশান্তির ভয়ে কিছু বলতেও পারেন না আরুস বেগম সহজ, সরল। তাকে ভালো লাগে কিন্তু অশান্তির ভয়ে কিছু বলতেও পারে না। আর যে স্বপ্ন দেখে না সে অপরের মনে স্বপ্নের জাল বিছিয়ে দেবে কি করে? প্রয়োজন ছিল একটি সুন্দরী পরসতারের। এমনই সময়ে শাহী হারেমে এলেন রম্ভাবতী। প্রথম দিনই তাঁর নাচ দেখে মুগ্ধ হলেন মুহম্মদ। মনে হল, এতদিন ধরে এমন একটি মেয়েকে খুঁজছিলেন তিনি। মনে হল, এ মেয়ে স্বপ্ন দেখতে জানে। তাঁর ভালো লাগল, তিনি নিজেও যে স্বপ্ন দেখেন।

সে স্বপ্ন হল নিজের জন্য একটি মনের মতো রওজা নির্মাণ করার। এমন সমাধি সৌধ যা তাঁকে অমর করে রাখবে। মৃত্যুর পরেও লোকে তাঁকে ভুলতে পারবে না। তাঁর রওজা দেখতে আসবে। যা তাঁর পিতার রওজাকেও ছাপিয়ে যাবে। কানাঘুষো শুনেছেন, বাদশাহ শাহজাহানও তাঁর প্রিয়তমা বেগমের মত্যুর পরে এক অসাধারণ মর্মরসৌধ গড়ছেন ইব্রাহিমের পথ অনুসরণ করে। তিনি তৈরি করেবেন নিজের জন্য, নিজের বেগমের জন্য আলাদা, আলাদা। তবে নিজেরটা আগে। তিনি মারা গেলে তার অসমাপ্ত কাজ কেউ করবে সে ভরসা তাঁর নেই। জেহান বেগম পারেন, তাঁর ক্ষমতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহই নেই। মুহম্মদ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি দুটো রওজা তৈরি করব বেগম, একটা তোমার আর একটা আমার।'

বড়ি বেগম বললেন, 'ভালোই তো।'

'কোনখানে রওজাদুটো হবে বল তো?'

'কোথায়?'

'আমারটা বিজাপুরে আর তোমারটা আইনাপুরে।'

'বেশ তো।' বড়ি বেগম কথা বাড়ান না। আসলে তাঁর এ সবে কোন উৎসাহ নেই। তিনি দেখেছেন সব সুলতানই নিজের কবরখানা তৈরি করেন, তাঁর শ্বশুর বেগমের জন্য তৈরি করেছিলেন। শেষে দুজনেরই সেখানে জায়গা হয়েছে। না হলেই বা কি? মরার পরে তিন হাত জমি কে না পায়? তার জন্যে আসমান-জমিন এক করে ভেবে কি লাভ?

মুহম্মদ একা একাই ভাবেন। কখনও কিলা অর্কে বেড়াতে বেড়াতে, কখনও বুরুজের ওপর উঠে মালিক-ই-ময়দানের চকচকে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে। মালিক-ই-ময়দান হচ্ছে বিজাপুরের বিখ্যাত কামান। এখন মুহম্মদ রম্ভাবতীকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। সুলতানের জীবনে রূপসীরা আসে যায়। রম্ভাবতী শুধু রূপসী ছিলেন না, নানারকম গুণ ছিল তাঁর। নাচতে জানতেন, গাইতে জানতেন, নৃত্যগীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন। স্বপ্ন দেখতেন, স্বপ্ন দেখাতে পরতেন। সর্বোপরি হারেমকন্যাদের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে সুলতানকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। মুহম্মদও অনুভব করছিলেন, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপর জগতে রম্ভাবতী এক টুকরো শান্তির আশ্রয়। তাঁকেই বলতে শুরু করলেন মনের কথা।

'এই দুনিয়ায় কি আমি আমার নাম রেখে যেতে পারব?' শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নিজের মনের কথা উপুড় করে দেন মুহম্মদ।

'কেন পারবেন না মালিক-এ-জাহান? আপনার চেয়ে বড় কে আছে?'

রম্ভাবতীর অজ্ঞতায় হাসেন সুলতান, 'এই দুনিয়ার কতটুকু তুমি জানো পিয়ারী? আমি তো সামান্য সুলতান। দিল্লির বাদশাহ আছে, ইরানের বাদশাহ আছে, ইস্পাহানের বাদশা আছে।'

'থাকলেই বা মালিক-এ-জাহান। ওঁরা আজ আছেন কাল থাকবেন কি না কে জানে?'

'আমিও তো থাকব না।'

'আমি শুনেছি মালিক-এ-জাহান, মানুষ না থাকলেও তার কীর্তি বেঁচে থাকে। কীর্তিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার অপরাধ নেবেন না, আপনিও তো আপনার কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেন।'

মুহম্মদের মনে হল, ঠিক এভাবেই তো তিনি ভাবছিলেন। এই স্বপ্নই তো তিনি দেখছিলেন। কল্পনা পাখা মেলতে শুরু করল। রম্ভাবতীকে বললেন, 'আমি খুব বড় মাপের রওজা তৈরি করব ঠিক করেছি।'

রম্ভাবতী অবাক, 'রওজা? কার জন্যে মালিক-এ-জাহান?'

'আমার নিজের জন্যে?'

'নিজের রওজা নিজে তৈরি করবেন?'

'তাই তো করতে হয়।'

'কই আগে দেখিনি তো।' সত্যিই রম্ভা যে দু চারজনকে মরতে দেখেছেন তারা কেউ নিজের কবরের ব্যবস্থা করে যায়নি। হিন্দুসমাজে তো কবর হয় না। তবে গ্রামে

নদীর ধারের শ্মশানে তিন চারটে ছোট ছোট দেউল দেখেছিলেন শৈশবে। মা কাকিরা পরবের দিনে নদীতে চান করতে গেলে সেই দেউলে সিঁদুর দিয়ে আসতেন আর বলতেন, সতী মায়ের মন্দির .... স্বপ্নের মতো মনে হয় সে কথা।

'সুলতানদের নিজের রওজা নিজেদেরই তৈরি করতে হয়।'

'তাই হবে মালিক-এ-জাহান। শুনেছি আপনার বাবাও....'

'ইব্রাহিম রওজার কথা তুমি তাহলে শুনেছ? আমার বাবা তৈরি করিয়েছিলেন বেগমের জন্যে। হঠাৎ মারা গেলেন বলে ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।'

'আপনি এত মৃত্যুর কথা বলবেন না। আপনি অনেক অ-নে-ক দিন সিংহাসনে বসে থাকবেন।'

'তা তো থাকবই। কিন্তু সুলতানদের সব সময় তৈরি থাকতে হয়। মরতে আমি ভয় পাই না। শুধু আমার স্বপ্ন যদি সফল হয় ....'

'হবেই মালিক-এ-জাহান। আচ্ছা এই স্বপ্নই কি আপনি জীবনভর দেখে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্বপ্ন সফল হবেই।'

'কি করে জানলে?'

'আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি যে।' চটুল হাসি ছড়িয়ে বলেন রম্ভাবতী।

একটু একটু করে কাজ এগোয়। মুহম্মদ যে শুধু তাঁর সমাধিসৌধ তৈরি করিয়েছিলেন তা নয়, বিজাপুরের বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের অনেকখানিই তাঁর আদেশে তৈরি করেন মালিক ইয়াকুব। আসার মহলও তাঁরই তৈরি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তাজ বাউরি, জেহান বেগমের কবর আর মুহম্মদ আদিলশাহের সমাধিসৌধ একই ব্যক্তির পরিকল্পনা। অসাধারণ সে স্থপতি। কিন্তু কোথাও তাঁর নাম খুজে পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েছে মুহম্মদের সমাধি, লোকমুখে প্রচলিত যার নাম গোলগুম্বজ। পনেরো-ষোলো বছরের পরিশ্রমের ফসল।

এই দীর্ঘদিনে রম্ভাবতী সুলতানের প্রিয়তমায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু নিজের জন্যে একটুও ভাবেন না তিনি। সুলতানই তাঁর প্রাণ। অন্য নর্তকীরা রম্ভাকে ঈর্ষা করে, অবাক হয়ে দেখে, নিজের ভালোমন্দ ভাবতে জানেন না রম্ভা। অর্থ, প্রতিপত্তি, আত্মীয়দের জন্য উচ্চপদ, মঞ্জিল, পালকি-তাঞ্জাম এমনকি বেগম হবার আবদার কী না করতে পারেন রম্ভা? সবাই জানে, সুলতান কোন আপত্তি জানাবেন না। বড়ি বেগমের মতো তেজস্বিনী নারীর মনেও এখন ভয়, সুলতান হয়ত এই সামান্য নর্তকীকেই বিয়ে করে বেগমের মর্যদা দেবেন। দু একজন সুপরামর্শ দেয়, 'ওরে বোকা মেয়ে, রূপ যৌবন দুটোই তো জলের মতো বয়ে যায়, ফিরে আসে না, আজ যদি সুলতানের নজরে আর একটা রূপসী ধরা পড়ে, কাল তোমার কি হবে?'

রম্ভাবতী হাসেন, নিজের কপাল দেখিয়ে বলেন, 'নসীবে যা আছে তাই হবে। সুলতান তো আমার কিছু অভাব রাখেননি। আমি আর কি চাইব?'

তবু কেউ বলে, 'সুলতান তোমার হাতের মুঠোয়। সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে বেগম হতে পারো না?'

রম্ভাবতী হেসে বলেন, 'বেগম হয়ে আমি করবটা কি? আমি সুলতানকে চাই, তাঁকে ভালোবাসি। আর কিছু চাই না।'

সবাই বলে, বোকা। রম্ভাবতীর কিছুই এসে যায় না।

মুহম্মদের মন এখন ভরপুর সুখে আচ্ছন্ন। দেশে শান্তি রয়েছে, সেনাবাহিনীর কথা অন্যরা প্রশংসার সঙ্গে মনে রাখে। নানা ধরনের ইমারতে বিজাপুর সুন্দর হয়ে উঠেছে।, মনের মতো প্রিয়তমা সঙ্গিনী পেয়েছেন। তাঁর বড় সাধের সমাধিসৌধ বিশাল রূপ নিয়ে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠছে। রম্ভাবতীকে বলেন, 'আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে রম্ভা, তুমি ঠিক বলেছিলে, এ দুনিয়ার আমার নাম থাকবে।'

'সে তো বলেইছিলাম তবে আমি বলেছিলাম, আপনার স্বপ্ন সফল হবে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ স্বপ্নই তো। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, দুনিয়ায় আমার নাম থাকবে। এখনও শেষ হয়নি কিন্তু এতবড় গুম্বজ দুনিয়ার কোথাও নেই।' তারপর হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে মুহম্মদ প্রশ্ন করলেন রম্ভাকে, 'আচ্ছা, তুমি স্বপ্ন দেখো না?'

'ওমা, স্বপ্ন না দেখলে বেঁচে আছি কি করে?'

'বল তুমি কি চাও? কি স্বপ্ন দেখো তুমি?'

'কি হবে শুনে?'

'ভয় পেয়ো না রম্ভা, তুমি বল। তুমি আমার প্রেরণা। প্রতিদিন যদি উৎসাহ না দিতে এই ইমারত আমি তৈরি করতে পারতাম না।'

'সুলতানের কাঁধে মাথা রেখে রম্ভাবতী বললেন,' আমার স্বপ্ন খুব ছোট মালিক-এ-জাহান, আবার অনেক দুঃসাহসের তাই বলতে সাহস হচ্ছে না।'

'বল....বল। তুমি তো জানো, তোমাকে দিতে পারি না এমন কিছু আমার নেই।'

'আমি চিরকাল আপনার পাশে থাকতে চাই।'

মুহম্মদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রম্ভার দিকে। বললেন, 'শুধু এই?'

'শুধু এই।'

হেসে ফেললেন মুহম্মদ। তিনি রম্ভার এই স্বপ্নের কোন অর্থই খুঁজে পেলেন না। একি শুধু কথার পারিপাট্য? না, হিন্দুনারীর সংস্কার? হঠাৎ মনে হল, রম্ভার স্বপ্ন বেগম হওয়া। বললেন, 'তুমি বেগম হতে চাও?'

'না, মালিক-এ-জাহান। আমি বেগমদের চেয়ে আপনার অনেক কাছে রয়েছি।'

'তোমার মতো আশ্চার্য মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।'

'সে আমার পরম সৌভাগ্য।'

এমনই করে দিন কাটে। প্রজাদের বিস্মিত চোখের সামনে মুহম্মদের সমাধিসৌধ পরিণত রূপ লাভ করে। গোলগুম্বজের উচ্চতা ও বিশালত্ব কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম গোম্বুজ বা ডোম। ১৮,১০৯,৩৫ স্কোয়্যার ফিট এর পরিধি, এই বিশাল ডোমটি কোন অবলম্বন বা থাম ছাড়াই দাড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ডোমটি হল রোমের প্যানথিয়ন, তার পরিধি ১৫,৮৩৩ স্কোয়্যার ফিট। সৌধটির উচ্চতা ১৯৮ ফিট ৬ ইঞ্চ। চার পাশে চারটি সাততলা উঁচু মিনার। শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙে গুম্বজের

কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা, প্রতি তলায় দাঁড়িয়ে চারপাশের শোভা দেখা ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা। গুম্বজের কাছে এসে সব কটি সিঁড়িই পৌঁছেছে প্রশস্ত অলিন্দে, এখন যার নাম হুইসপারিং গ্যালারি। এইটাই গোলগুম্বজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এগারো ফিট চওড়া দেওয়াল, সেখানে সামান্য শব্দও প্রতিধ্বনিত হয় এগারোবার। কেউ অতি সাবধানে গুম্বজের অলিন্দে পা রাখলেও শোনা যাবে তার পদশব্দ। আর যদি কেউ চুপি চুপি কান রাখে দেওয়ালের গায়ে তাহলে শুনতে পাবে গুম্বজের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কানে কানে বলা কোন কথা। এ যেন এক আশ্চর্য লুকোচুরির খেলা। যাকে দেখতে পাচ্ছি না, সে যদি দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কানে কানে কথা বলার মতো ফিসফিসিয়ে বলে, ভালো আছো? অমনি দেয়ালে কান রেখে তা শুনতে পাবে। কোন কোন সমাধিসৌধের ডোম বা গম্বুজে কিছুটা প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঠিকই তবে তাদের সঙ্গে কোন তুলনা চলে না গোলগুম্বজের। বিশাল ইমারতটি দেখে সুলতানের আনন্দ আর ধরে না। এমনটি আর কোথাও নেই। সারা বিশ্বে তিনি শুধু একা নন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি এখন অমরত্বের কাছাকাছি। আধুনিক স্থপতিদের মতে, এই প্রতিধ্বনির বৈশিষ্ট্য বা ইকো সিস্টেম নির্মাণকৌশলের মধ্যে নেই। মুহম্মদ বা তাঁর কারিগরদের মাথায় এরকম কোন কল্পনাও ছিল না। সুলতানের নিজেরও কোন ভুমিকা নেই, তিনি শুধু বড় গম্বুজ চেয়েছিলেন। আর তাতেই ধরা পড়েছে এই অসামান্য বৈশিষ্ট্য। গম্বুজের বিশালত্বে মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় শিল্পকৌশল। গোলগুম্বজের মতো আর একটা সৌধ নির্মাণ করলেই বোঝ যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু তৈরি করবে কে? মুহম্মদের পুত্র আলি সুলতান হয়ে আরও বড় সমাধিসৌধ তৈরি করে বাবাকে হারাবেন ভেবেছিলেন, তার ভিত আর অর্ধেক দেয়াল এখনও আছে বিজাপুরে, কাজ শেষ হয়নি। আজও গোলগুম্বজ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

সুলতান মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারেন না। রম্ভাবতীকে বলেন, 'আজ তুমি আমাকে একেবারে মাতিয়ে দাও রম্ভা, আজ আমি খুব খুশি।'

'মালিক-এ-জাহান এতদিনে নিশ্চয় সবাইকে হারিয়ে দিতে পেরেছেন।'

'ঠিক। আমার স্বপ্ন শুধু সফল হয়েছে তা নয়, পেয়েছি আরও কিছু।'

'সে কি? আমাকে বলবেন না?'

'বলব। তার আগে তুমি আন্দাজ কর দেখি।'

'আমি কি করে বলব?' ছদ্ম অভিমানে ঠোঁট ফোলান রম্ভা। নিভৃতে দুজনেই এখন কাছের মানুষ। ভুলে যান শাহী নিয়মকানুন। সুলতান ও তাঁর পরসতার নয় যেন চিরকালের প্রেমিক প্রেমিকা। ছদ্ম কোপে বললেন, 'আমি কি গোলগুম্বজ দেখেছি? লোকে বলে তাই শুনি।'

'গোলগুম্বজ? আমার রওজাকে এই নাম দিল কে?'

'আপনার প্রজারা। তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন?'

'আমি সে চেষ্টা করব না।'

'আমারও তাই মত।'

'কেন?'

'আপনার নামের সঙ্গে মৃত্যুর কোন যোগ থাকলে কেমন লাগে।'

'তুমি আমাকে এত ভালোবাসো।'

'আমার প্রাণের চেয়ে বেশি।'

'আমি যদি মরে যাই তখনও ভালোবাসবে?'

'আপনার দীর্ঘ আয়ু হোক মালিক-এ-জাহান। আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে ভালোবাসব।'

'আচ্ছা তুমি যেন কি বলছিলে? গোলগুম্বজ দেখোনি। এই তো?'

'হ্যাঁ। আমার তসবির তৈরি করেছে যে শিল্পী, সে বলেছে গোলগুম্বজ ছবির মতো সুন্দর।'

মুহম্মদ হাসেন, 'কিচ্ছু জানে না সে। আসল কথাটাই জানে না।'

'আসল কথাটা কি আমাকে বল।'

'বলব না। দেখাব।'

'আমাকে দেখাবেন?' উচ্ছ্বাসভরা হাসি শোনা যায় রম্ভার।

চোখ বুজেছিলেন মুহম্মদ, মনে হল এই হাসিটা যদি প্রতিধ্বনিত হয় গোলগুম্বজে, কেমন শোনাবে? ঝরনার মতো? জলতরঙ্গের মতো? উঠে পড়ে বললেন, 'কালই তোমায় নিয়ে যাব।'

'সে কি? আগে বড়ি বেগম দেখে আসুন।' রম্ভা নিজের অবস্থানের কথা ভুলতে চান না। তিনি পরসতার। নিভৃতে সুলতানের প্রিয়তমা সঙ্গিনী। কিন্তু জেহান বেগমের মর্যাদা লঙঘন করবেন কি করে? আগে তিনি দেখে আসুন, তারপরে যাবেন রম্ভাবতী।

মুহম্মদ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার কথা না ভাবলেও চলবে। আমি কাল হারেমের সবাইকে গোলগুম্বজ দেখতে যাবার অনুমতি দেব। বেগমদের সঙ্গে তুমিও যাবে।' তিনি আর রম্ভাকে বললেন না, জেহান বেগমকে আনুষ্ঠানিকভাবে আগেই তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারও আগে নিজে বলেছেন। জেহান বেগম এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। এমন কি আইনাপুর অঞ্চলে তাঁর নিজের সমাধিসৌধটি নিয়েও কোন আগ্রহ দেখাননি। মুহম্মদ অবশ্য দমেননি। জেহান বেগমের রওজার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষ যদি ওটাকেও সুলতানের ভালোবাসার স্বীকৃতি মনে করে তাহলে ভুল করবে। তাঁর মনে কোন আবেগ নেই জেহান বেগম সম্পর্কে।

কিলা অর্ক থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমাধিসৌধ। সব কাজ শেষ হয়নি তখনও। মসজিদ, অতিথিশালা, বাগিচার কাজ চলছে। হারেম থেকে সবাই আসবেন বলে বিশেষ ব্যবস্থা। নববধূর মতো সেজেছেন রম্ভাবতী। তাঁর খুশি সবচেয়ে বেশি। বড়ি বেগম ইচ্ছে করেই আসেননি। তবে হারেমকন্যারা এসেছেন দল বেঁধে। সুলতানের হুকুম ছাড়াও তাঁদের তীব্র কৌতূহল ছিল। বিশাল ইমারতের সামনে তাঞ্জাম থেকে নেমেই রম্ভাবতী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সুলতানের স্বপ্নের অংশীদার হয়ে গল্প শুনে শুনে তাঁর কল্পনার জগতে গোলগুম্বজ একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। বাস্তবে

না হোক কল্পনা মিশিয়ে তিনিও মনে মনে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলেন সৌধটিকে। আজ প্রথম চাক্ষুষ দেখলেন। কল্পনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বাস্তব। ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে বাস্তবেই মাথা উঁচু দাঁড়িয়ে আছে সমাধিসৌধটি।

সুলতান শিশুর মতো খুশি হলেন রম্ভাবতীকে মুগ্ধ হতে দেখে। মনে মনে বড়ি বেগমের বুদ্ধির তারিফ করতেও ভুললেন না। তিনি এলে সুলতান রম্ভাবতীকে নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে পারতেন না। কিন্তু এখন তিনি রম্ভাকে দেখতে পারেন সব কিছু। তাঁকে দেখাবেন বলেই তো ডেকে এনেছেন।

রম্ভা উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'মালিক-এ-জাহান, আপনার মঞ্জিল তো আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।'

মুহম্মদ হাসলেন, 'আমার মঞ্জিল নয়, আমার রওজা, তাতে তো আবার তোমার আপত্তি। তা সে যাক, যে নামেই ডাকো, এই ইমারত তৈরি হতো না তোমার প্রেরণা ছাড়া।'

'আমার প্রেরণা? মালিক-এ-জাহান, সত্যিই কি আমি আপনাকে কিছু দিতে পেরেছি।'

'তুমি আমার প্রেরণা। পিয়ারি, তুমি ভালোবাসায় ভরিয়ে না রাখলে আমি এই ইমারত তৈরি করতে পারতাম না।'

'আমার এখনই মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন?'

'আনন্দে।'

'এখনও তো তুমি আসল জিনিস দেখোনি। এসো, দেখবে এসো।' বলে মুহম্মদ তাঁকে নিয়ে আসেন একটা মিনারের কাছে। এক পা এক পা করে একশ সিঁড়ি ভাঙেন তাঁরা, প্রতি চাতালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে, চার পাশের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁরা ওপরে আসেন। অন্যান্য হারেমকন্যারা যে যার মতো হুড়োহুড়ি করে। কিন্তু রম্ভা ঘুরে ফিরে দেখেন, কখনও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে, কখনও নিজের পায়ের শব্দে চমকে চমকে উঠে। মিনারের শেষ তলা থেকে সমস্ত বিজাপুর দেখা যায়। এক সময় হাসি ফোটে রম্ভার মুখে। সেই হাসি ঝরনা নয় যেন বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ ভরে শোনেন মুহম্মদ। এমন ঢেউয়ের মতো কলতান গোলগুম্বজ ছাড়া কোথাও শোনা যাবে না।

এমন মিষ্টি হাসিই বা হাসবে কে? রম্ভাবতী ছাড়া। তিনি রম্ভাকে আরেক ম্যাজিক দেখাতে চলে গেলেন অলিন্দের অপর প্রান্তে। রম্ভাকে বলে গেলেন, 'তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, এই দেয়ালে কান পেতে।'

রম্ভা দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর চোখের সামনেই সুলতান অন্যদিকে চলে গেলেন। রম্ভার একটুও ভালো লাগছিল না, সুলতানের দূরে চলে যাওয়া। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, পড়ন্ত বেলার হলুদ আলো খোলা জানলার পাশে স্বপ্ন রচনা করছে। হঠাৎ শুনলেন, সুলতানের কণ্ঠস্বর। এখন তাঁকে দেখাও যাচ্ছে না। ওদিকটায় ছুটে যেতে

হলেও সময় লাগে। রম্ভা শুনলেন, সুলতান বলছেন, 'রম্ভাবতী, শুনতে পাচ্ছো? কথা বল। কথা বল।'

আনন্দে রম্ভার গায়ে কাঁটা দিল। কোথা থেকে কথা বলছেন, সুলতান আর তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। বললেন, 'মালিক-এ-জাহান, আমি শুনতে পাচ্ছি।'

'তুমি কি চাও? আমাকে বল পিয়ারি।'

'শুধু আপনাকে। আর কিছু চাই না।'

এ যেন এক আশ্চর্য মজার লুকোচুরি খেলা। দেখা যাচ্ছে না তবু ফিসফিস করে বলা মনের কথা পৌঁছে যাচ্ছে অপর পারে।

রম্ভা বললেন, 'আমি আপনার কাছে কি করে যাব মালিক-এ-জাহান। কোন দিকে যাব?'

ঠিক এতটা লুকোচুরির জায়গা নয় গোলগুম্বজ। কিন্তু রম্ভাও তো মহলের বাইরে বড় একটা পা রাখেন না। হঠাৎ এসে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

মুহম্মদ হাসতে হাসতে বললেন, 'কেন সামনের ঝরোকা থেকে ঝাঁপ দাও। তাহলেই আমার কাছে চলে আসবে।' তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই রম্ভার চোখ পড়ল গরাদেহীন খোলা জানলার ওপরে। হলুদ আলোর হাতছানি তাতে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেখান থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল শিউরে উঠে চেঁচিয়ে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে মুহম্মদ আর্তনাদ করে দ্রুত পায়ে নেমে এলেন অপর দিকে মিনারের সিঁড়ি দিয়ে। লোকজন অনেকেই ছিল কিন্তু কঠিন পাথরের উপর নিজেকে ছুঁড়ে ফেলা রম্ভাবতীকে কোনমতেই রক্ষা করা গেল না। সুলতান ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন রম্ভাবতীর দেহ। বললেন, 'একী করলে তুমি? সামান্য একটা ঠাট্টাকে সত্যি বলে ধরে নিলে?'

রম্ভার দেহে প্রাণ ছিল তখনও, জ্ঞানও। শেষ মুহূর্তটিকেও মধুর হাসিতে ভরিয়ে তুলে কোন রকমে শুধু বললেন, 'আপনার হুকুম তামিল করাই আমার কাজ মালিক-এ-জাহান।

মুহম্মদ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার শেষ ইচ্ছে কি আমাকে বল।'

রম্ভা অনেক কষ্টে তাঁর মুখের দিকে কোনরকমে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার পাশে থাকতে চাই, চি-র-কা-ল।'

হাকিম সাহেব এসে রম্ভার রক্তাক্ত হাতটি স্পর্শ করেই করুণ মুখে মাথা নাড়লেন তারপর উঠে গেলেন। সমস্ত আনন্দ যেন ম্লান হয়ে হয়ে অন্ধকারে মুখ লুকোল। সুলতান অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লেন। রম্ভার শেষকৃত্যের আদেশ দিয়ে বললেন, 'রম্ভাবতীকে এখানেই দাফন করা হবে।'

সবাই চমকে উঠলেন, এ যে সুলতানের নিজের জন্য তৈরি করা রওজা। এখানে কি করে রম্ভাবতীর কবর হবে? মৃদু আপত্তিও উঠল। মন্ত্রীর কাছ থেকে, বড়ি বেগমের মহল থেকে। আমিরদের মুখে ঘৃণা। রম্ভাবতী তো সুলতানের বেগম নন, সামান্য নর্তকী, পরসতার। ইহজীবনের নর্মসহচরী। সুলতান কোন আপত্তি শুনলেন না।

বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? আমি তাকে কথা দিয়েছি। আমার পাশেয় শুয়ে থাকবে সে। আমার সমাধির পাশেই থাকবে রম্ভার সমাধি।'

তবু কেউ কেউ বললেন, ইতিহাসে সুলতানের নাম থাকবে। এই অপূর্ব রওজাটিও বিখ্যাত হবে। পরবর্তীকালের মানুষ কি বলবে?

সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ বললেন, 'বলবে, সুলতানের পাশে শুয়ে আছে রম্ভাবতী। এবার বুঝেছি রম্ভা কেন আত্মহত্যা করল আর কেনই বা আমার পাশে থাকতে চেয়েছিল। আমি তার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবই।'

তাই হল শেষ পর্যন্ত। শুয়ে রইলেন রম্ভাবতী, সুলতানের ঠিক পাশেই। একই সমাধিক্ষেত্রে পরে জায়গা পেয়েছিলেন দুই বেগম, নাতনি, মেয়ে। এরা এখানেই সমাহিত হন বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায়। তবে তাঁরা কেউ সুলতানের পাশটিতে বেগমের মর্যাদায় শুয়ে নেই। সেখানে শুয়ে আছেন রম্ভা ও সুলতান, চিরকালের দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। রম্ভাবতী তাই চেয়েছিলেন। প্রতিটি পর্যটককে গোলগুম্বজ সেই অমর প্রেমকথা শোনায়।

দারা শুকোহ্ ও রানাদিল

ইতিহাসে এমন কি কোথাও কোন অস্তিত্ব না থাকলেও লোকপরম্পরায় কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে আছেন রানাদিল। মুঘল শাহজাদা দারা শুকোহ্ ভালোবেসে তাঁকে রাজপথ থেকে তুলে এনে ছিলেন মহলে। বেগমের মর্যদা দিয়ে। দুর্লভতম উদাহরণ চুঘতাই রাজবংশে। তবু সম্ভব হয়েছিল প্রেমের জন্য। শাহজাদা নেমে এসেছিলেন পথনটীর পাশে। ঐতিহাসিকেরা ভুলে যেতে পারেন, সাধারণ মানুষ তাঁদেব ভুলবে কি করে?

ইতিহাসের বড় গোলমেলে সময়ে জন্মেছিলেন দারা। মুঘল শাহজাদা শাহজাদা খুরমের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাদশাহ জাহাঙ্গিরের অতি আদরের নাতি। দারা। দারা শুকোহ্ মতান্তরে শিকোহ্ নামটি তাঁরই দেওয়া। আদর করে। কোনদিন সিংহাসনে বসলে হয়ত আর একটা গালভরা নামের আড়ালে চাপা পড়ে যেত ডাক নামটি। তা যখন হয়নি তখন থাকুক অন্য নামগুলি। অতি স্নেহে অতি যত্নে তাঁকে শাহী খানদানের ভবিষ্যৎ এবং তখ্‌ৎ-এ-তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারী ধরে নিয়ে মানুষ করছিলেন স্নেহময় পিতা শাহজাহান। নিজের সিংহাসনারোহণের দিনগুলি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে।

মুঘল খানদানে পারিবারিক বন্ধনের আমেজ বিশেষ ছিল না। কোন রাজবংশেই বোধহয় তা থাকে না। ভ্রাতৃ দ্বন্দ্বের ইতিহাস নিয়ে যখন কাব্য লেখা হয় তখন তা হয়ে ওঠে রামায়ণ কিন্তু বাস্তব জীবনে ছলে-বলে ভাইকে হারিয়ে সিংহাসনের দখল নেওয়াই শেষ কথা। এই সোজা নিয়মেই অর্থাৎ চুঘতাই রীতি রেওয়াজ অনুসারে বড় হচ্ছিলেন দারার বাকি তিন ভাই—সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ। দারা শাহী রীতি-নীতির অতিরিক্ত যা পেয়েছিলেন তা হল পিতৃস্নেহ ও পাণ্ডিত্য। যা তাঁকে শেষপর্যন্ত শাহী তখ্‌তের উত্তরাধিকারী হতে দেয়নি। দিল্লি আগ্রা ছেড়ে দারা যদি নিজের মনসব সামলাতে যেতেন তাহলে তাঁর লোক চেনার ক্ষমতা ও পরিচালনাশক্তি বাড়ত। দিনরাত সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় সময় না দিয়ে অস্ত্রচালনায় মন দিলে তাঁর যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকত।

কিন্তু যা হবার নয়, কোনকালেই তা হয় না। রণনিপুণ সেনানায়ক না হতে পারলেও আগ্রার সাধারণ মানুষের ভালোবাসা দারা পেয়েছিলেন। তাঁর মনসবের দায়িত্ব কর্মচারীদের হাতে দিয়ে তিনি থাকতেন আগ্রাতে। সাধু-সন্ত-ফকির-দরবেশের নিত্য আনাগোনা তাঁর মহলে। তিনি নিজেও যেতেন তাদের কাছে। অতি সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে, তাদের একজন হয়ে। দরগায়-চবুতরায় সুফি সাধকদের সঙ্গে মেতে উঠতেন

ধর্মালোচনায়। আর এভাবেই একদিন আগ্রার পথে তাঁর দেখা হয়ে গেল রানাদিলের। চাঁদের সঙ্গে চকোরের।

সেদিনও দারা ছদ্মবেশে পথে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি কোন মুসাফির। আগ্রার পথ তাঁকে টানে। পথের মানুষও। তাই আউল বাউল ফকিরের সঙ্গে মনের মানুষের খোঁজও চলে। নিজের অজান্তে। সেদিন তিনি যাচ্ছিলেন এক দরগায়, এক মহাত্মার আগমন সংবাদ পেয়ে। পথে জটলা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। অনেক মানুষের ভিড়। কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে তিনি কি দেখলেন? না, একটি নৌটঙ্কির আসর। নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষ এসব নাচ-গান-অভিনয় দেখে-শোনে, তৃপ্তি পায়। দলে থাকে দু-তিনজন মানুষ। কেউ ঢোল বাজায়, কেউ বাঁশি বাজায় কিংবা গায়, ঘুঙুর পায়ে বেঁধে ঘাঘরা-চুনরি পরে মেয়ে সেজে নৃত্য করে কোন কিশোর। শাহজাদাদের হিসাবে-কিতাবে কোথাও নেই এই হতদরিদ্র মানুষগুলো। নেই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী হবার সময়। সাধারণত দারা এসব অনুষ্ঠান দূর থেকে দেখলে শত হস্ত দূরে চলে যান কিন্তু আজকের আসরটা যেন বেশি জমাট। দরগার কাছে বলে? পরক্ষণে ভুল ভাঙল দারার, চমকে উঠে তিনি দেখলেন, কোন কিশোর নয় নাচছে একটি কিশোরী। পাকা গমের মতো রং, দীঘল গহিন কাজলকালো চোখে ছুরির ধার, কালভুজঙ্গের মতো বেণী, ছিপছিপে বেতের মতো শরীর। উদ্দাম ভঙ্গিতে নাচছে মেয়েটি। সস্তা রঙচঙে ঘাঘরা, ঘামে ভেজা লহঙ্গা, আধময়লা ওড়না সবকিছুই তার নাচের সঙ্গে এমনভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে, যে কোনটাই আলাদা করে চোখে পড়ছে না। একই সঙ্গে মেয়েটি নাচ থামিয়ে মাঝে মাঝে হাত পা নেড়ে অভিনয় করছে। সব মিলে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে আমজনতাকে। দারা নিজেও স্থানকাল ভুলে দেখতে লাগলেন মেয়েটির নাচ। সত্যই মুগ্ধ হবার মতো। নাচ শেষ করে মেয়েটি হাত পাতল বিজয়িনীর মতো। সকলেই দু চার পয়সা দিচ্ছে। পথের মেহফিল শেষ। সবাই যে যার পথ ধরে। মেয়েটিও তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে যাচ্ছে।

পথচারীদের কয়েকটি উচ্ছ্বসিত সংলাপও কানে আসে দারার। '.... ওঃ রানাদিল যা নাচে না..., '

'ওঃ দারুণ। যদি কোনদিন কোঠেবালী ডেরায় গিয়ে শুধু বসে, তাহলে আর দেখতে হবে না...'

'...আগ্রার রইসজাদারা ওর নাচ দেখতে ভেঙে পড়বে কোথায়....'

নামটাই শুধু কানে গেঁথে যায় দারার। আপন মনে হেসে ওঠেন তিনি। রানাদিল। মানে হৃদয়েশ্বরী। সত্যি এমন নাম ওকে কে দিল? যেই দিক সত্যিই প্রতিটি প্রেমিক হৃদয়কে টানতে পারে মেয়েটি। ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যেও সেই টান অনুভব করলেন দারা। কী আশ্চর্য! চুঘতাই খানদানের শাহজাদা হয়ে আমি কি না.. নিজেকে শাসন করেন দারা। আবার ভাবেন প্রতি সন্ধ্যায় আগ্রার কিলায় যে কাঞ্চনীরা সম্রাটকে সেলাম করতে আসে তার ভিড়ে রানাদিলকে তো কোনদিন তিনি দেখেননি। দেখলে ও মুখ তিনি ভুলতে পারতেন না। সে কি নর্তকীদের সঙ্গে কেল্লায় যায় না?

রানাদিল সত্যই এসব এড়িয়ে চলে। পথই তার জীবন। পথই তার সঙ্গী। কীভাবে

যে তার পায়ে তাল এল, কণ্ঠে সুর এল, ভঙ্গিতে এল ভাষা—কেউ জানে না। পথে-ঘাটে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় না। দু'চারজন বয়স্কা বাঁদি ছাড়া। আর মাঝে মাঝে আসে বেদেনিরা। আর সবাই থাকে পর্দার আড়ালে। নর্তকী কিংবা গায়িকারা আগ্রার মণ্ডির কোঠায় ঘর নিয়ে থাকে। তারা নাচে গায় কিন্তু পথে বেরোয় না। নিতান্ত প্রয়োজনে যারা বেরোয় বোরখা, ঝরোখা, নকাব তাদের আলাদা করেই রাখে। রানাদিলের সঙ্গে ওদের মস্তবড় তফাত--সস্তা মানুষের মনোরঞ্জনে ওদের তৃপ্তি নেই। রইসজাদাদের নেকনজরে পড়াই তাদের লক্ষ্য। রানাদিল রূপসী, নৃতপটীয়সী। ওরকম একটা জীবন বেছে নেওয়াই ছিল তার পক্ষে সঙ্গত। তা সে নেয়নি। হয়ত তার রক্তেই ছিল পথের টান। হয়ত তার পিতার জীবন কেটেছিল নৌটঙ্কি দলের সঙ্গে। কিংবা সে দেখেছিল তার কোঠাবাসিনী মায়ের জীবনের করুণ ট্র্যাজেডি। পা বাড়ায়নি বাঁধা পথে। বেছে নেয়নি কাঞ্চনীর জীবন। তার বদলে আপন করে নিয়েছে বেদেনিদের মতো পথটাকেই। কেন? কেন? কেউ জানে না।

কৌতূহল দারাকে স্থির থাকতে দেয় না। এখন তাঁর সান্ধ্যভ্রমণে সতর্কতা। চুপচাপ তিনি খুঁজে বেড়ান পথনায়িকাকে। অন্যান্য কাজের ফাঁকে। আবার কবে দেখা মেলে। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। আগ্রার চক, মণ্ডি, যমুনার তীর, মন্দির প্রাঙ্গণ, চৌরাস্তা, চবুতরা সর্বত্রগামিনী রানাদিল। এবার আড়াল থেকে শুনলেন তার গান। সারিন্দা বাজিয়ে গাইছে। আশ্চর্য মাদকতা তাতে। আজ তার চুল চুড়ো করে বাঁধা। একটা ময়ূর পালক গোঁজা তাতে। গান শোনাচ্ছে রানাদিল, যমুনাতীরে গোপিনীরা হোরিখেলায় মেতেছে ওদের হাতের ফাগে আকাশ লাল হয়ে গিয়েছে, আবির-গুলালে রাঙা যমুনার জল। রানাদিলের কণ্ঠে ওস্তাদি সুর নেই আছে কথকতার জাদু। যে শুনছে, যে শোনাচ্ছে দুজনেই জানে এ গান নতুন নয়, শুধু পরিবেশনের গুণে নতুন হয়ে উঠছে।

দেখতে দেখতে দারারও নতুন লাগে। নেশার মতো মনে হয়। রঙমহলে দরবারি নাচ দেখেছেন তিনি, শুনেছেন বহু ওস্তাদি গান। কিন্তু এ মেয়ে একেবারে অন্যরকম। যখন ডফলি বাজিয়ে নাচে, কিঙ্গিনা বাজিয়ে গায় তখন একরূপ, আবার যখন উদাস করা মেঠো সুরে কথকতা শোনায় তখন একরূপ। দারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন রানাদিলের নির্দিষ্ট কোন বাজিয়ের দলও নেই। কখনও কখনও সে একাই বেদেনিদের মতো নাচে।

আলাপ হল একদিন। রানাদিল বলেন, 'তোমাকে আগ্রার সব জায়গাতেই দেখি। মানে সব রাস্তায়। কোথায় থাকো তুমি?'

ছদ্মবেশী দারা সরাসরি সে উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তোমাকেও তো আমি সব জায়গায় দেখি।'

কাচভাঙা হাসির জলতরঙ্গ ছড়িয়ে রানাদিল বলেন, 'আমার তো কাজই নেচে গেয়ে বেড়ানো। সব জায়গায় ঘুরে না বেড়ালে আমার চলবে কি করে? কিন্তু যারা আমার নাচ দেখে, যারা আমার গান শোনে তারা আমার সঙ্গে ঘোরে না। শুধু আজকাল তোমাকেই দেখি সব জায়গায়।'

রানাদিলের আজ কোন সঙ্গী নেই। তিনি একাই যমুনাতীরের মানুষকে খঞ্জনি বাজিয়ে কথকতা শুনিয়েছেন। এবার ফেরার পালা।

দারা কাছে আসেন। ছদ্মবেশের আড়ালেও তাঁর রূপ বিশেষ করে গায়ের উজ্জ্বল রঙ রানাদিলকে উত্তরোত্তর বিস্মিত করছিল। দারা গভীর স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকেই দেখতে আসি রানাদিল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার তাকে দেখে নিয়ে রানাদিল বললেন, 'আমার নাচ দেখতে, গান শুনতে আস না?'

'তোমার নাচগান আর তুমি কি আলাদা? তুমি যখন নাচো মন হয় একটা ময়ূর আকাশে মেঘ দেখে নাচছে। তুমি যখন গাও মনে হয় যমুনার জল বয়ে যাচ্ছে। শিল্প আর শিল্পী এক হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না।'

অবাক হলেন রানাদিল। আবার বলেন, 'কে তুমি? এতো সাধারণ মানুষের কথা নয়।'

'সব মানুষই সমান রানাদিল'...

এতক্ষণে রানাদিল চিনে ফেলেছেন শাহজাদাকে। ভয়ে বিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ে সেলাম জানিয়ে বলেছে, 'আমাকে মাফ করুন শাহজাদা।'

'মাফ করব? কেন? তুমি তো কোন অপরাধ করনি।'

'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'না পারাই উচিত। ছদ্মবেশীকে চিনে ফেললে আর মজা কোথায়?'

'আমি না জেনে আপনাকে বলেছি, আপনাকে কেন সব জায়গায় দেখছি।'

'কথাটা তো মিথ্যা নয়। আমি তোমাকে দেখবার জন্যই ইদানীং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি। আগেও যেতাম। দরবেশ, সাধু, ফকিরদের কাছে তাদের কথা শুনতে যাই।'

'সে তো যেতেই পারেন। সারা শহরই আপনার।'

'শুধু আমার? তোমার নয়? এই শহরের কঠিন বুকে তুমি পা রেখে দাঁড়িয়ে নেই?'

'সবই ঠিক হুজুর তবে গরিবের কিছুই হয় না। ধনীরাই সবকিছুর মালিক হয়। আর আপনার তো কথাই নেই। আপনি দিনদুনিয়ার মালিক বাদশাহের ছেলে। ভবিষ্যতে বাদশাহ হবেন।'

'ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না রানাদিল। আমি বর্তমানের কথাই বেশি ভাবছি। রানাদিল, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকে চাই।'

রানাদিল দারার কথা অনেক শুনেছেন। পথে যাদের জীবন কাটাতে হয়, তাদের সব খবরই রাখতে হয়। তিনি জানেন, সম্রাটের এই পুত্র সজ্জন, বিদ্বান। দীন দুঃখী মানুষের জীবনে এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। কিন্তু কী শুনছেন তিনি? শাহজাদা দারার মতো মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন। আরেকবার সেলাম করে সম্ভ্রমের সুরে রানাদিল উত্তর দেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য। সারা দেশ আপনাকে শ্রদ্ধা করে শাহজাদা। হিরে-মোতির অভাবে নেই আপনার হারেমে। সে সব ফেলে রাস্তায় পড়ে থাকা কাচের টুকরোর দিকে আপনার চোখ পড়ল?'

'তুমি কাচের টুকরো?'

'তাও ভাঙা কাচ। বিঁধে গেলে আপনার পাদুটিই রক্তাক্ত হবে শাহজাদা।'

রানাদিলের কথার বাঁধুনি মুগ্ধ করে দারাকে। মেয়েটি যেন কাছে থেকেও দূরের, ধরা দিয়েও অধরা। এমন মেয়ের দেখা কোথায় পাবেন তিনি? যতই আমজনতার সঙ্গে মিশুন, আসলে তো তাদের কেউ নয়। তাঁর শিক্ষা সহবতের সঙ্গে মানানসই যে নারীদের তিনি পেয়েছেন কিংবা দেখেছেন তাদের সঙ্গে রানাদিলের কোন মিল নেই। হেসে বললেন, 'আরে তুমি তো দেখছি সাচ্চা হিরে। কাচের মতো পড়ে আছো বলে চেনা যাচ্ছে না। আমি শাহজাদা, সাচ্চা হিরে চিনি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমার হারেমে।'

চমকে উঠলেন রানাদিল। ভয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠল। জোর করে ধরে নিয়ে গেলে করবেনই বা কি? একদিকে বাদশাহজাদা অন্যদিকে পথের এক সামান্য নর্তকী। একটু যেন মরিয়া হয়েই রুখে দাঁড়ালেন তিনি। এই তেজটুকুই তাঁর সম্বল। কোন প্রলোভনই তাঁকে টানে না। বলেন, 'চুঘতাই খানদানের শাহজাদারা কখনও আম আদমিকে ছুঁয়ে দেখে না হুজুর। আর আমি সাধারণ মানুষেরই একজন।'

'না, তুমি তা নও।'গম্ভীর কণ্ঠে বললেন দারা, 'তাহলে এতটা টানতে পারতে না। আমি কয়েকদিন ধরে তোমার নাচ দেখেছি, গান শুনেছি, অভিনয় দেখেছি। আশ্চর্য তোমার প্রতিভা। দিনের পর দিন তুমি রাজা-রাজড়ার গল্প শোনাচ্ছ আমজনতাকে। মানুষের মনকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তোমার আছে।'

'সাধারণ মানুষেরও মন আছে একথা তাহলে স্বীকার করেন শাহজাদা?' রানাদিল তাঁর হারানো সাহস ফিরে পাচ্ছেন। রাতের অন্ধকারে যমুনা পার হয়ে কোন অজানা গ্রামে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লে এই ভাবুক শাহজাদা কি তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে? কিন্তু বুকের মধ্যে একটা চোরাটানও যে অনুভব করছেন তিনি। দারাকে তাঁর ভাল লাগছে। এর নাম বুঝি ভালোবাসা। কৈশোর যৌবনকে দখল ছেড়ে দিচ্ছে।

দারা বললেন, 'নিশ্চয় করি।'

'তাহলে আমি যদি হারেমে যেতে না চাই, আপনি কি জোর খাটাবেন?'

দারা আকাশের দিকে তাকালেন। রাত গাঢ় হয়ে আসছে। ওটা কি নক্ষত্র আকাশে? কিসের ইঙ্গিত? শুভ, না, অশুভ? একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেটা বোধহয় পারব না রানাদিল। আমি ভালোবাসতে পারি। জোর খাটাতে পারি না। তুমি কোথায় থাকো?'

এ কোন মানুষের কথা শুনছেন রানাদিল?' এক মুঘল শাহজাদা? তখ্‌ত-এ-তাউসের ভাবী উত্তরাধিকারী? না, কোন ভাবুক মানুষ, যে রানাদিলকে ভালোবেসেছে। রূপ যৌবন দেখে নয়, শিল্প আর শিল্পীকে এক হয়ে যেতে দেখে আর তার মুখের কথা শুনে। এঁকে কি ভালো না বেসে থাকা যায়? নিজের হৃদয় ফুলের সাজির মতো উপুড় করে ঢেলে দিলেন রানাদিল।

'সে তো আপনি চিনবেন না। তবে আজ আর সেখানে ফিরব না। ওই মন্দিরে গিয়ে বসে থাকব।'

'চিনব না জানলে কি করে?' দারা হেসে বলেন, 'ভয় পাচ্ছ, পাছে ধরে নিয়ে যাই।'

হাসলেন রানাদিলও, 'না ধরে নিয়ে যাবার মানুষ আপনি নন। ধরা দেবারও নন।'

দারা মুগ্ধ হলেন। রানাদিলের কথার বাঁধুনি কী সুন্দর। ওর সঙ্গে কথা কয়েও সুখ। দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আরও কাছে। নিচু স্বরে বললেন, 'যদি ধরা দিই?'

'আমার দিলের পিঁজরা এখনও খালিই আছে শাহজাদা।' হেসে উত্তর দেন রানাদিল।

বিদায় নেন দুজনেই। অনুভব করেন, সব নিয়ে আসা হয়নি, কিছু রয়ে গিয়েছে পরস্পরের কাছে। দারা অনুভব করেন রানাদিলের তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু মুঘল শাহজাদার সঙ্গে কি সামান্য পথনায়িকার প্রেম হয়? কেউ কি স্বীকৃতি দেবে? রানাদিল ঠিকই বলেছে চুঘতাই বংশে শাহজাদাদের সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসা বারণ। শাসকের মনে শাসিতের প্রতি যাতে কোন টান না থাকে সেজন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা। কিন্তু অসাধারণ কে? কিসে হয়? দারা আবার নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে তাকালেন। জ্যোতিষে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সপ্তর্ষির পাশে চোখে পড়ল অরুন্ধতী নক্ষত্রটি। রানাদিলও কি তাঁর পাশে থাকবে? তাকে কি সাধারণ মেয়ে বলা যায়? দারা নিজের হৃদয়ের গহনে আর একবার ডুব দিলেন, রানাদিলকে তাঁর চাই।

মুঘল শাহজাদা হলেও দারা ছিলেন অন্যধরনের মানুষ। তিনি স্থির করলেন, রানাদিলকে তিনি বেগম করে ঘরে নিয়ে আসবেন। হারেমের প্রতি রানাদিলের অনীহা দেখেই একথা ভাবলেন। আসলে পারিবারিক জীবনের প্রতি দারার টানা ছিল। নাদিরা বেগম তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, কয়েকটি পুত্রকন্যা, সকলেই দারার কাছের মানুষ। অন্য শাহজাদাদের সঙ্গে তাঁদের বেগমদের কিংবা পুত্রকন্যাদের প্রাণের যোগ থাকত না বললেই চলে। ঘরোয়া পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, শাহী হারেমের কোথাও তা ছিল না। দারা এই নিয়ম মেনে বড় হননি। শাহজাহান অত্যন্ত ভালোবাসতেন বড় ছেলে ও বড় মেয়েকে, দারা ও জাহানারা শাহজাদা ও শাহজাদী হয়েও পেয়েছিলেন অপার পিতৃস্নেহ, তারই প্রভাব পড়েছিল দারার জীবনে।

বাদশাহ অবশ্য এককথায় দারার আরজি নাকচ করে দিয়েছিলেন। না, হারেমকন্যাদের নিয়ে বিলাসিতা আর পথের নর্তকীকে বেগম করতে চাওয়া এক জিনিস নয়। শাহী রাজবংশে ওরকম সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার চলতে পারে না। নিজস্ব কোন হাভেলিতে তাকে বিবির আদরে রাখতে চাইলে কোন আপত্তি নেই কিন্তু বেগমের মর্যাদা স্বতন্ত্র। সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন না দারা, নীরবে মনের দুঃখে শুকিয়ে যেতে থাকেন। রানাদিলকে জোর করে হারেমের নিয়ে আসতেও তাঁর সংকোচ হয়। পিঁজরায় বন্দি হলে তোতা কি কথা কইবে? আগের মতো?

অবশেষে পিতা ও সম্রাটের টানাপোড়েনে পিতা জয়ী হলেন। দারার ম্লানমুখ বিদ্ধ করল শাহজাহানকে। তিনি অনুমতি দিলেন দারাকে। তবে বিনা আড়ম্বরের অনুষ্ঠানে, নাদির বেগমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে। ঘটনাটা যেন বিরাট আকার ধারণ করে লোকের মুখে মুখে না ছড়িয়ে পড়ে।

আবার দেখা করলেন দারা রানাদিলের সঙ্গে। বেশ কয়েকদিনের ব্যবধানে দারাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন রানাদিল। দারা দেখলেন, রানাদিলের চোখের কোলে

রাতজাগার কালি, মুখের ওপর বিষণ্ণতার ছায়া। সবাই চলে গেলে নির্জনে বললেন, 'রানাদিল, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

জোর করে হাসলেন রানাদিল, 'জোর করে?'

'যদি বলি হ্যাঁ। কি করবে তুমি?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে রানাদিল চুপ করে থাকেন। দারা বললেন, 'তোমার মুখে আজ কথা নেই কেন? চোখের কোণে কালি। মুখে চিন্তার ছাপ, কি হয়েছে?'

রানাদিল বলতে পারেন না, শাহজাদার কথা ভেবে ভেবেই তাঁর এই দশা। কবে কোন সময়ে তিনি স্থির করেছিলেন বড়লোকের খেলার পুতুল হয়ে জীবন কাটাবেন না, আজ সেকথা মনে পড়ে না। পথে, মণ্ডিতে নাচতে এসেও তাঁর চোখদুটো খুঁজে বেড়ায় শাহজাদা দারাকে। একথা তো কাউকে বলা যায় না। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অনেকদিন দেখতেও পাইনি সব খবর ভালো তো?'

'এই মুহূর্তে সব ভালো কেন না আমি তোমার সামনে বসে আছি। আমার জোর দেখানোর কথা না হয় থাক। তোমার দিলের পিঁজরার খবর কি বল? খালি আছে তো এখনও?'

'না শাহজাদা। খালি নেই' অকপটে বলে ফেললেন রানাদিল।

'নেই?' চমকে উঠে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন দারা।

'ধরা না দিলেও মনে মনে আমি যে আপনাকে সেখানেই ধরে রেখেছি। আর কেউ সেখানে ধরবে না। কোনদিন নয়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দারা। হেসে বলেন, 'আমিও না।'

'আপনি তো ধরা দেবার মানুষ নন।'

'কিন্তু তোমার ফাঁদে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি।'

'আমি কোন ফাঁদ পাতিনি। শাহী হারেমে যাবার শখ নেই আমার। এই গাছতলাই ভালো।'

'কেন শাহী হারেম তোমার পছন্দ নয় আমি জানি না তবে আমি তোমাকে বেগমের মর্যাদা দিয়েই নিয়ে যাব।'

'বেগম?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না রানাদিল। তিনি ঠিক শুনছেন তো, নাকি জেগে জেগেই খোয়াবে দেখছেন? একসময় তাঁর পদ্মের পাপড়ির মতো চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ে গালে। বললেন, 'তুমি...আপনি আমায় এত ভালোবাসেন? আমার মতো এক সাধারণ মেয়েকে....'

'তুমি সাধারণ মেয়ে নও রানাদিল। মানুষ হিসেবে তুমিও তুলনাহীন। সমস্ত প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করে তুমি বেছে নিয়েছ কষ্টের জীবন অথচ বেছে নিতে পারতে কোঠিওয়ালি তওয়াফের সুখের জীবন।'

অস্ফুটে রানাদিল বলেন, 'ভাগ্যিস নিইনি।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হত না হয়ত।'

হেসে দারা বলেন, 'হতই। আমাদের ভাগ্যে ছিল দেখা হওয়া।'

'আপনার মতো আমারও জ্যোতিষে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।'

'বিশ্বাস করো রানাদিল। শান্তি পাবে। আমি জ্যোতিষীদের কথা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করি।'

রানাদিল বিশ্বাস করেন না। চুপ করে রইলেন। তাকিয়ে রইলেন অন্ধকার আকাশে ফুটে ওঠা তারাগুলের দিকে। সত্যই কি মানুষের ভাগ্য ওই তারাগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে? কোনটা তাঁর ভাগ্যতারা? দারারই বা কোনটা? কি লেখা আছে তাতে?

দারা বললেন, 'ওই দেখ সপ্তর্ষি। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আমায় অনেক তারা চিনিয়েছিলেন। ওই ছোট্ট তারাটি দেখছ। ওই তারাটা হচ্ছে পাশের ওই উজ্জ্বল তারার স্ত্রী। সব সময় রয়েছে স্বামীর পাশে।'

রানাদিল মনে মনে বলেন, 'আমিও থাকব।'

আগ্রায় সম্ভবত রানাদিল বাস করতেন রানি হাভেলিতে। দারা শুকোহ্, ষাট হাজারি মনসবদার হলেও। তাঁর মনসবগুলি শাসন করতেন কর্মচারীদের সাহায্যে। আগ্রাতেই থাকতেন। তাঁর অন্য ভাইরা নিজেরাই কাজকর্ম দেখতেন বলে অনেক চৌকস হয়ে উঠলেন। সম্রাট যখন আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী তুলে নিয়ে গেলেন তখন দারাকেও আগ্রা ছাড়তে হল। রানাদিল স্থান পেলেন তাঁর বেগম মহলে। দারার কান্দাহার অভিযানেও হয়ত তিনি গিয়েছিলেন। তারপর যেমন হয়,. চিক, পর্দা, ঝরোখার আড়ালে বেগমের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে হারিয়ে গেলেন রানাদিল। ঠিক যেমন করে সম্রাটের নির্দেশে রাজপথ থেকে হারিয়ে গিয়ে মহলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই একই নিয়মে তবে সম্রাটের আদেশে নয়, জীবনের গতানুগতিক নিয়ম মেনে। মুক্ত বিহঙ্গীকে পিঁজরায় পুরেছিলেন দারা কিন্তু খাঁচার মধ্যে কীভাবে কাটল বুনো পাখির জীবন। কে জানে? দারার যদি ভাগ্যবিপর্যয় না হত কিংবদন্তির গল্প তাহলে এখানেই শেষ হত। কিন্তু তা হয়নি।

শাহী হারেমে স্থান পেলেও হারেম-সংস্কৃতির সঙ্গে রানাদিলের জীবন একেবারে খাপ খায়নি। তাঁর জীবনের সবটাই ছিল দারাকেন্দ্রিক। কিন্তু শাহজাদার জীবন তো হারেমকেন্দ্রিক নয় তাই তাঁর জীবন বয়ে চলল ভিন্ন খাতে। অন্যান্য হারেমবাসিনীদের দিন কাটত গুপ্ত সংবাদের আদানপ্রদানে, ষড়যন্ত্রে এবং অবরুদ্ধ বাসনার চোরা স্রাতে গা ভাসিয়ে। এর মধ্যে শুধু কল্পনার আশ্রয় নিয়েই বোঝা যায় রানাদিলের একাকিত্ব। বিয়ের শর্ত হিসেবেই হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত মানুষেরা। বেগম মহলে আভিজাত্য-গরবিনীরা পথের নটীকে নিজেদের একজন ভাবতেই পারেননি কখনও। আর অন্যান্য হারেমকন্যারা বিশেষ করে পরসতার বা উপপত্নীরা রানাদিলের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতই হল, আপন হল না। এমন কি পরিচারিকা, বাঁদিরাও মনে মনে তাঁকে নিজেদের সমগোত্রের একজন ভাবত, মালিক নয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংকট যখন ক্রমেই ঘনিয়ে উঠল সামুরাইয়ের যুদ্ধে হেরে দারা দিল্লি ছাড়লেন বেগম ও সন্তানদের নিয়ে।

পথে রানাদিলই কেবল অম্লান কুসুম। পথে তাঁর কষ্ট নেই। মাত্র কয়েক বছরের

ব্যবধানে পথ কি ভুলে যেতে পারে তাঁকে। রাত্রের আকাশে তিনি ব্যাকুলভাবে খোঁজেন শুধু একটা তারাকে।

ক্লান্ত, চিন্তিত দারা একদিন তাঁকে বলেন, 'আকাশে কি খুঁজছ রানাদিল? রাতটুকু বিশ্রাম নাও। কাল কি আছে কে জান?'

'আমি সেই তারাটাকে খুঁজছি আলিজা। সেই যে আপনি দেখিয়েছিলেন।'

দারার কিছুই মনে পড়ে না। বলেন, 'কোন তারা? আজ কি মনে হয় জানো রানাদিল। ওগুলো সবই বোধহয় মিথ্যা। ওদের মধ্যে শুধুই ফাঁকি।'

দুঃখে রানাদিলের বুক ফেটে যেতে চাইল। কত দুঃখে যে আজ দারা জ্যোতিষে বিশ্বাস হারিয়েছেন সে কথা রানাদিল জানেন। বলতেন, 'তারা মিথ্যা নয় আলিজা। ওই জ্যোতিষীরা মিথ্যাবাদী। ওই তো দেখুন সেই তারাটা, সপ্তর্ষিমণ্ডলের বড় তারাটার পাশে ঠিক একই রকম।'

'তারা বলেই আছে, মানুষ হলে থাকত না। সব বেইমান। সবাই আজ আমাকে ভুলে গিয়ে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।'

চলে যান দারা। তাঁর এখনও অনেক কাজ। যদিও বুঝতে পারছেন সবই ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে।

রানাদিল তাকালেন আকাশের দিকে। সেই তারাটাকে বললেন, 'আমি ভুলিনি তোমাকে।'

যা হবার তাই ঘটে গেল একদিন। দারা ধরা পড়লেন আফগানিস্তানের সীমান্তে। পথশ্রমে, রোগে ভুগে নাদিরা বেগম পথেই মারা গিয়েছেন। বাকিরা সবাই বন্দি হলেন। ফিরে এলেন দিল্লিতে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হল দারাকে দিল্লির রাজপথে, চরম অপমানের মধ্যে। কারণ ঔরঙ্গজেব প্রচার করেছেন, তিনি কাফের, ধর্মদ্বেষী, সবশেষে শিরশ্ছেদ। এ তো ইতিহাসের পাতায় লেখাই আছে। যদিও ইতিহাস রক্ষায় কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না ঔরঙ্গজেবের। তিনি শুধু কবি ও গায়কদের বিরুদ্ধেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তা নয়, সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল ইতিহাসের ওপর। এমন কি দরবারের শাহী ইতিহাস লেখকদেরও কোন কার্যধারা রক্ষা করতে দেওয়া হয়নি, তাই গোপনে রক্ষিত সামান্য কয়েকটি ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র ছাড়া এই সময়কার কোন নথিই পাওয়া যায় না। ঔরঙ্গজেব কেন এমন করেছিলেন? নিজের কীর্তিকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছে কি তাঁর ছিল না? না, তিনি জানতেন, কালের বিচারে তিনি সকলের ঘৃণাই কুড়োবেন। সেজন্যই নিজের হাতে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন সব কিছু। পারেননি যে সে তো দেখাই যাচ্ছে।

শোনা যায় লেখার অভ্যাস ছিল জাহানারার। সুফিতত্ত্বের দুখানি বই তিনি লিখেছিলেন। তার একটির নাম সাইবিয়াঁ। এটি পীর মুল্লাশাহ কাদিরীর অসম্পূর্ণ জীবনী। এর শেষে জাহানারার আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা আছে। জানা নেই, এই গ্রন্থসূত্রই আন্দ্রিয়া বুটেনশনের উপন্যাসের ভিত্তি কি না। হয়ত এখানেই ছিল রানাদিলের নামটি।

দারাকে বন্দি করে দিল্লিতে নিয়ে আসার পরে তাঁর হারেমের মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঔরঙ্গজেবের হারেমে। এটাই ছিল শাহী দস্তুর এভাবেই হারেম সমৃদ্ধ হত। বিজিতের হারেমে বিজেতার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। দারার সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন মাত্র তিনজন। প্রধানাবেগম নাদিরা, রানাদিল ও উদয়পুরি। উদয়পুরি প্রথমে ছিলেন দারার হারেমের পরসতার। পরে বেগম হয়েছিলেন কি না স্পষ্ট করে জানা যায় না তবে বেগম না হলেও তিনি দারার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। দারার হারেমের দুটি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রানাদিল ও উদয়পুরির কাছে ঔরঙ্গজেব প্রস্তাব পাঠালেন, বেগম হয়ে তাঁরা হারেমের শোভা বৃদ্ধি করলে তিনি সবচেয়ে সুখী হবেন। পরসতার উদয়পুরি ছিলেন উচ্চাকাঙক্ষী নারী, বেগম হবার স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে, সেই স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনায় প্রস্তাবটি লুফে নিলেন তিনি। বাকি রইলেন রানাদিল। তিনি প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আমি বাদশাহের হারেমে যাব কেন? আমার মালিক দারা শুকোহ্। তিনি যেখনেই থাকুন। বেঁচে আছেন।'

হুকুম হল, জেনানা কয়েদখানায় আটক থাকবেন রানাদিল। পাথরের মতো মুখ করে দারোগারা নিয়ে গেল রানাদিলকে। বোকা মেয়েটার জন্য কেউ হয়ত একটু অনুকম্পার হাসি হাসল। রানাদিলের কেউ আপনজন তো ছিল না। কাজেই কয়েদখানার নির্জন ঘরে একটি মাত্র খাটে অতি সামান্য বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন রানাদিল। চোখ জুড়িয়ে শ্রান্তিতে। এতদিন উৎকণ্ঠা ছিল। ভয় ছিল। খবর পেয়েছেন দারা আর বেঁচে নেই। হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের কোন একটা জায়গায় ঠাঁই পেয়েছে তাঁর সেই সুন্দর মুখখানি। শুনতে চাননি তবু হারেমের বসে বসে আপনিই খবর পেয়েছেন। কাঁদেননি। শুনেছেনে দারা শুকোহ্কে মুছে ফেলার জন্য ঔরঙ্গজেবের অন্তিম প্রয়াস। যেমন তেমন করে গোর দেওয়া শাহজাদার কবরে যাতে কেউ ফুল দিতে, চেরাগ জ্বালতে না যায় সেজন্য হুকুম জারি করা হয়েছে। যেন একটা সাধারণ মানুষকে মিটিয়ে দেওয়া হল সাধারণ মানুষের মতো।

কয়েকদিন পরে আবার প্রস্তাব পাঠালেন বাদশাহ। তাঁর অন্দরমহলের দরজা রানাদিলের জন্য খোলা আছে। বাদশাহ জানেন, রানাদিল 'অনমোল' হিরা, তিনি তাঁকে বেগমের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। রানাদিল এবার শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, 'কেন আমার প্রতি বাদশাহের এত অনুগ্রহ জানতে পারি কি?'

দুত ফিরে গেল এবং ফিরে এল। সম্রাট শুনেছেন আপনার সুন্দর মুখের কথা। অপূর্ব সুন্দর চুলের কথা। তিনি বলেছেন, 'আমি দেখতে চাই সেই রূপ, সেই চুল।'

রানাদিল তৎক্ষণাৎ বুকের মধ্যে থেকে বার করলেন একটি ছোট্ট ছুরি। নিজের হাতে সেই ছুরি দিয়ে কাটলেন দীর্ঘ রুক্ষ বেণীটি। ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চিরলেন নিজের মুখ। চেপে ধরলেন মুখের ওপর রুমালটি। উপস্থিত সকলে হইচই করে ছুটে এল। দারোগা কেড়ে নিল হাতের ছুরিটি। ভর্ৎসনা করে বলে উঠল, 'এ কি করলেন আপনি?'

রানাদিল মুখ তুললেন। বীভৎস ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ। রক্তাক্ত রুমাল আর কাটা

বেণীটি দূতের হাতে দিয়ে বললেন, 'দারা শুকোহ্ বেঁচে আছেন আমার দিলের মধ্যে। সেখানে কেউ তাঁকে হারাতে পারবে না। তবে বাদশাহকে তো আমি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমার যে রূপের জন্য তিনি আমাকে কামনা করেছেন সেই রূপ সেই চুল আমি তোমার হাত দিয়ে তাঁর কাছেই পাঠালাম।'

সেদিন এক অতি সাধারণ নর্তকীর কাছে ঔরঙ্গজেব হার স্বীকার করলেন। তাঁর এ পরাজয় হতমান দারার কাছেও। ওঁদের ভালোবাসার কাছে। প্রকৃত আনুগত্যকে ঔরঙ্গজেব অসম্মান করেননি কখনও। রানাদিলকেও নিত্য নতুন যাতনায় জর্জরতি হতে হয়নি। জেনানা কয়েদখানাতেই নিবল রূপহীনা নামহীনা এক নারী কয়েদির জীবনদীপ। একেবারে অবহেলায় হয়ত নয়, কারণ কয়েদখানার দারোগাদের হৃদয় তো সত্যই পাথরের নয়। বাদশাহ্ সমস্ত ঘটনার ওপর পাথর চাপা দিতে চাইলেও যেভাবেই হোক খবরগুলো বাইরে এসেছিল। মনগড়া হলে হারিয়ে যেত। কোথাও কোন চিহ্ন নেই তবু দিল্লি ও আগ্রার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে যমুনা নদী আজও শোনায় রানাদিলের কথা।

ঔরঙ্গজেব ও হীরাবাঈ

প্রেমিক ঔরঙ্গজেবকে ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্রাট নিজেও ইতিহাস রক্ষায় যত্ন নেননি বরং চেষ্টা করেছিলেন সব কিছু মুছে ফেলতে। রাজনীতির সিঁড়িভাঙা অঙ্ক ছাড়া তাঁর জীবন জুড়েছিল শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামি। তবু তাঁর জীবনেও প্রেম এসেছিল অতর্কিতে। ইতিহাস সেই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি। ঔরঙ্গজেবের জীবনে হীরাবাঈ জয়নাবাদী যে স্বপ্ন নয়, ঐতিহাসিকদের স্তম্ভিত করে দিয়ে ইতিহাসই তার সাক্ষী হয়ে আছে।

ঔরঙ্গজেব তখন শাহজাদা। আগ্রার সিংহাসনে সম্রাট শাজাহান। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদার। দক্ষিণের শাসক হয়ে ঔরঙ্গজেব গিয়েছিলেন দুবার, ১৬৩৬ থেকে ১৬৪৪ এবং ১৬৫৩ থেকে ১৬৫৭ সাল পর্যন্ত। ঐতিহাসিকদের অনুমান, তাঁর হিসেবি জীবনে ওলট পালট ঘটেছিল ১৬৫৩ সালে। দিল্লি থেকে ফিরছিলেন ঔরঙ্গাবাদে। পথে বুরহানপুরে রইলেন কিছুদিন। ন মাস ছিলেন এখানে। তাপ্তী নদীর তীরে বুরহানপুর। নদী পেরোলে জয়নাবাদ। সেখানে রয়েছে আহুখানা। একটি বিশাল উদ্যান, পোষা হরিণ, আমবাগান, ফুলের বাগান—সব মিলে উদ্যান ও অরণ্যের মিলিত সংস্করণ। বুরহানপুরে কয়েক মাস বসে থাকার পর ঔরঙ্গজেব স্থির করলেন একদিন যাবেন উদ্যানবিহারে, পরিবারের মহিলাদের নিয়ে। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই বেগম ও পুত্রকন্যারা। কিন্তু উদ্যানবিহারে দিলরসবানু যোগ দিতে পারলেন না, তিনি আসন্ন প্রসবা, রহিমুন্নিসা গেলেন সঙ্গে আরও হারেমকন্যারা। ঔরঙ্গজেবের মাসি, মমতাজমহলের বোন সলিহাবানু মতান্তরে মালিকাবানু ছিলেন কাছেই, তিনি ধারুর মনসবদার খান-এ-জামান মীর খলিলের বেগম, তাঁকেও আমন্ত্রণ জানানা হল আহুখানায়। খুশি মনেই এলেন তিনি মীর খলিলের হারেমের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে। সাধারণত, একজনের হারেমকন্যারা অপর কোন পুরুষের সামনে বেরোতেন না। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে কখনও কোন দুর্বলতা দেখাননি বলে সকলেই আহুখানায় উপস্থিত হলেন। সেখানেই ঘটে গেল একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা।

নিজের পরিবারের মেয়েদের নিয়ে ঔরঙ্গজেব কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।। ফুলের বাগান থেকে দূরে, বড় বড় কয়েকটি গাছ যেখানে ছায়াবিস্তার করেছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল একটি গানের কলি। ঔরঙ্গজের গান ভালোবাসেন না বলে মীর খলিলের হারেমের সকলকেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, কেউ যেন

আহুখানায় গিয়ে গান না গায়। কিন্তু শাহজাদা যে ফুলের বাগানের পরিবর্তে আমবাগানের দিকে যাবেন তাই কে জানত? ঔরঙ্গজেব সেই গানের সুর অনুসরণ করেই হাজির হলেন সেখানে। দেখলেন একটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী আপনমনে গুণগুনিয়ে চলেছেন শাহজাদার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। নিষ্পাপ সারল্য তার চাহনিতে, শুচিস্মিত লাবণ্যে পূর্ণ তার দেহ। মেয়েটি যেন এ জগতের কেউ নয়। শাহজাদার চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল তার চোখদুটি, সেদিকে চেয়ে বুকের ভিতর হৃৎকম্প শুরু হল ঔরঙ্গজেবের। মেয়েটি এগিয়ে এসে তঁকে তসলিম করল না বরং ফলভারনত যে ডালটি সে ধরেছিল, সেখান থেকে একটি আম তুলে অবহেলাভরে। ঔরঙ্গজেব হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মাসির-আল-উমারার যথাযথ বর্ণনা হল, প্রথমে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন, তারপর সেই খোলা আকাশের নীচেই শুয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা হারিয়ে। মহিলারা হইচই বাঁধিয়ে ফেললেন। সলিহাবানু ছুটে এলেন, যে অবস্থায় ছিলেন সেভাবেই অর্থাৎ জুতো না পরে। আসলে জুতোয় পা গলাবার কথা তাঁর মনেই পড়েনি। এসেই সংজ্ঞাহীন শাহজাদার মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলে। পরিচর্যায় কোন ত্রুটি হল না তবু ঔরঙ্গজেবের জ্ঞান ফিরল তিন চার ঘণ্টা পরে।

সলিহাবানু বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'কি হয়েছে আমাকে বল? আগে কি এমন কোনদিন হয়েছে?' একে ওকে জিজ্ঞেস করেন। উৎসবের আমেজে মেশে বিষাদ। সলিহাবানু শধু 'হায় হায়' করেন। তাঁকে দেখতে এসেই যে শাহজাদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ জানতে পারলে যে নিজের প্রাণ দিয়েও বোনপোকে বাঁচাবেন। ঔরঙ্গজেব চুপ করে সবই শুনলেন, কোন কথা বললেন না।

মাঝরাতে ঔরঙ্গজেব তাঁর মাসির সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। সবাই ঘর থেকে চলে গেলে সলিহাবানু আবার বললেন, 'তোমার মনের কষ্ট কোথায় যদি জানতে পারি নিজের প্রাণ দিয়েও সারাবার চেষ্টা করব।'

ঔরঙ্গজেব বললেন, 'আমার অসুখের কথা যদি তোমায় বলি, তাহলে কি তুমি আমার কষ্ট দূর করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব। বলছি না, আমি আমার জীবন দিতেও রাজি।'

ঔরঙ্গজেব বললেন, 'আজ সকালে আমি একজনকে দেখেছি। খানজামানের হারেমের মেয়ে।'

'জানি। নিষেধ শোনেনি। গান গেয়ে ফেলেছে। তার নাম হীরাবাঈ। খানজামানের পরসতার।'

'তাকে আমি চাই। তাকে না পেলে আমি বাঁচব না খালাজান।'

ঔরঙ্গজেব মুখে একথা শুনেই এবার চেতনা হারিয়ে গড়িয়ে পড়লেন সলিহাবানু। তাঁর মূর্ছা শীঘ্রই ভাঙল। কিন্তু তিনি পাথর হয়ে বসে রইলেন। কী বলবেন তিনি? এর উত্তর তো তাঁর জানা নেই। বোবার মতো তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে ঔরঙ্গজেব বাঁকা সুরে বললেন, 'তুমিও অনর্থক এতক্ষণ আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার ভান করলে? তুমি যদি কোন উত্তরই না দাও তাহলে আর আমাকে সুস্থ করবে কি করে?'

সলিহাবানু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি নিজের প্রাণ দেবার কথাই বলেছিলাম। তুমি তো খানজামানকে চেনো। তিনি জঘন্য রক্তপিপাসু মানুষ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। খোদ বাদশাহকেই মানেন না। তোমাকেও মানবেন না। আমি যদি তাঁকে তোমার মনের কথা জানাই, তাহলে প্রথমেই হীরাবাঈকে খুন করবেন। তারপর হয়ত আমাকে মারবেন। আমি তোমার সুখের জন্য তবু এ অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি, কেন না তোমার জন্য মরতেও পারি। কিন্তু ওই গরিব মেয়েটার অকারণে প্রাণ যাবে। তোমারও কাজ হবে না।'

ঔরঙ্গজেব শুনে বললেন, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমাকে অন্যদিক থেকে কাজটা হাসিল করতে হবে। হীরাবাঈকে আমার চাই।'

অপরূপ রূপসী হীরাবাঈ ছিলেন খানজামানের পরসতার। তাপ্তীর তীরে ছোট্ট জায়গা জায়নাবাদ। সেখান থেকেই তিনি হারেমে এসেছিলেন। কেউ কেউ এই ছোট্ট জায়গাটিকে চিনতে না পেরে বলেছেন জৌনপুর। আসলে তা নয়। সম্রাট আকবর নিয়ম করে দিয়েছিলেন, হারেমকন্যাদের নামের সঙ্গে তাদের যে অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই জায়গার নামটি জুড়ে দিতে হবে। আসল নামে নয়, তারা পরিচিত হবে স্থাননাম দিয়ে। তাতে তাদের চেনা সহজ হবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মুঘল হারেমের আকবরাবাদী, ফতেপুরী, যোধপুরী (ইনি অবশ্য বেগম), ঔরঙ্গাবাদী, জয়নাবাদী, উদয়পুরী প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। উদয়পুরী পরে প্রধানা বেগম হয়েছিলেন তবু তাঁর আসল নাম কেউ জানতে পারেনি।

হীরাবাঈয়ের বাবা-মা-ভাই-বোন কারও কথা জানা যায়নি। দরিদ্রের সংসার থেকে অনেকেই আসতেন রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে। ধরে নেওয়া যেতে পারে হীরাবাঈও এমনই একটি পূর্বপরিচয়হারা ফুলের কুঁড়ি। রূপের সঙ্গে ছিল মোহিনী কণ্ঠ, উপযুক্ত তালিম পেয়ে তিনি খানজামানের নজর কেড়েছিলেন। তারপরে তো তিনি ইতিহাসের পাতাতেও স্থান করে নিতে পেরেছিলেন ঔরঙ্গজেবের ভালোবাসার জন্যে। শুধু কি ঔরঙ্গজেব তাঁকে ভালোবেসেছিলেন? প্রথম দেখাতেই হীরাবাঈ মন দিয়েছিলেন তাঁকে? অবশ্য হারেমকন্যাদের মন যদি থাকে! কেউ মূল্য দেয় না সেই মনের। হীরাবাঈ ভাগ্যবতী, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়েছিলেন।

পরদিনই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেব নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। কোন কিছু মুখে তোলার আগেই ডেকে পাঠালেন মুর্শিদ কুলি খানকে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত দেওয়ান, শাহজাদের অনুপস্থিতিতে দক্ষিণের শাসক। ঔরঙ্গজেব তাঁকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মনের অবস্থা বর্ণনা করলেন। মুর্শিদ কুলি খান এমন সঙ্কটের কথা আগে কখনও শোনেননি বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের মুখে। কিন্তু সেনাপতি সহজে বিচলিত হন না। প্রথমে তিনি সহজ সমাধানের কথাই বললেন, 'আপনি আমাকে আদেশ দিলেই আমি খানজামানকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারি। তারপর কেউ যদি আমার মাথাটা কেটেই নেয় তাহলেও আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি আপনার জন্য জীবন দিতে পারি।'

'আমি জানি আপনি আমার জন্য জীবন দিতে পারেন কিন্তু আমি চাই না এসব ঝামেলায় জড়াতে। খানজামান আমার মাসির স্বামী, তাঁর বৈধব্য আমার কাম্য নয়।'

'তাহলে কি হবে? খানজামান নিশ্চয় রাজি হবেন না।'

'সেজন্যই তো কাজটা আপনার হাতে দিচ্ছি। বুদ্ধি দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে আপনাকে।'

একটুও দেরি না করে মুর্শিদ কুলি খান চলে গেলেন খানজামানের কাছে। এরকম কাজ তিনি আগে কখনও করেননি। তবু প্রভুর আদেশ পালন করাই বীর সৈনিকের কাজ। খানজামান প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও শুধু বললেন, 'আপনি শাহজাদাকে আমার সেলাম জানাবেন। এর উত্তর আমি শাহজাদার মাসিকে দেব।'

খানজামান অসময়েই হারেমে এলেন। সলিহাবানুকে বললেন, 'যদি বদলাবদলি করে নিতে হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। তোমাকে যেতে হবে সেই প্রস্তাব নিয়ে। তুমি তোমার বোনপোকে বলবে তার হারেমের পরসতার ছত্তরবাঈকে পাঠিয়ে দিতে। তার বদলে আমি পাঠাব হীরবাঈকে।'

সলিহাবানু ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। এ যে শাহজাদার চরম অপমান। ছত্তরবাঈ ঔরঙ্গজেবের হারেমের সেরা সুন্দরী পরসতার। তিনি কি তাঁকে ছাড়বেন? বললেন, 'এ কাজ আমি পারব না।'

খানজামান গর্জে উঠলেন, 'পারতেই হবে। তোমার জন্যেই সে আমাকে অপমান করার সুযোগ পেয়েছে। তুমিই সব কিছুর জন্য দায়ী। যদি জীবনের ওপর কোন টান থাকে তাহলে শিগগির যাও।'

সলিহাবানু নিরুপায় হয়েই গেলেন এবং ঔরঙ্গজেবকে জানালেন খানজামানের প্রস্তাব। ঔরঙ্গজেব রাগ করলেন না। বললেন, 'আমার হারেম থেকে একজনকে দিতে হবে? বেশ। কাকে নিয়ে যেতে চাও এখনই তাকে তোমার পালকি করেই নিয়ে চলে যাও। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।' পরসতারেরা প্রভুর সম্পত্তি কাজেই ছত্তরবাঈ বা হীরাবাঈয়ের সম্মতির কথা কেউ চিন্তাই করলেন না।

সলিহাবানু ফিরে এসে খানজামানকে সব কিছু জানালে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েই হীরাবাঈকে পাঠিয়ে দেন ঔরঙ্গজেবের হারেমে। এ কথাও ইতিহাসে আছে। এতে বোঝা যায়, রূপ ছাড়াও হীরাবাঈয়ের আরও কোন আকর্ষণ ছিল এবং সে আকর্ষণ তীব্র নয়, অপ্রতিরোধ্য। সারল্য ছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল ঔদাসীন্য ও বিষণ্ণতা। না হলে ধরে নেওয়া যেত সুবেদারের হারেম থেকে শাহজাদার হারেমের পৌঁছোবার জন্যই তিনি আহুখানায় গান গেয়ে ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক কোন রচনাতেই হীরাবাঈকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে সারল্য ও সাহসের কথা। কাউকে ভয় পেতেন না তিনি। ঔরঙ্গজেবকেও না। হারেমের মধ্যে জীবন কাটলেও তাঁর চরিত্রের ভিত ছিল সত্য ও দৃঢ়তা। হীরাবাঈ স্বতন্ত্রভাবে নিজের কোন বাসনা চরিতার্থ করতে চাননি, আসক্তি ছিল একটি বিষয়ে। হীরাবাঈ মদ খেতেন। হারেমকন্যাদের অনেকেই পানাসক্ত ছিলেন। না হলে সব দুঃখ ভুলে থাকবেন কি

করে? হীরাবাঈও অনেক দুঃখ ভুলতে সুরাকে আপন করে নিয়েছিলেন। যখন দুঃখ আর রইল না তখনও সুরা তাঁর সঙ্গিনী হয়েই রইল।

ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল দুজনের জীবন। সবাই জানল শাহজাদার হৃদয় পাথরের মতো নয়। এখন তিনিও গান শোনেন। তাঁর হারেমের কেউ মদ খেত না কিন্তু হীরাবাঈয়ের সাতখুন মাফ। সুখে দুঃখে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটলে কিংবা বিনা কারণে সুরার পেয়ালায় চুমুক না দিলে তাঁর চলে না। ঔরঙ্গজেব তাঁকে অনুরোধ করেন, 'ছেড়ে দাও এই সর্বনেশে নেশা। কিসের দুঃখ তোমার?'

হীরাবাঈ হেসে ওঠেন, 'সকলেরই কোন না কোন নেশা আছে আলিজা। পেয়ালা ভরে শরাব না পেলে বাঁচব কি করে?'

'আমি কি করে বেঁচে আছি? আমার তো কোন নেশা নেই।' একটু হেসে বলেন, 'অবশ্য আমার নেশা তুমি।'

'না আলিজা, তখ্‌ত-এ-তাউসে বসবার স্বপ্নই আপনার সবচেয়ে বড় নেশা।'

'ভুল বললে, সিংহাসনের ওপরে আমার কোন লোভ নেই। তবে দারা শুকোহ্‌কে আমি সিংহাসনে বসতে দেব না। সে কাফের।'

আবার হেসে ওঠেন হীরাবাঈ, 'ভুল, কাউকেই আপনি সিংহাসনে বসতে দিতে চান না আলিজা।'

ঔরঙ্গজেব মনে মনে বিস্মিত হন। আর কেউ তাঁকে এভাবে পড়ে ফেলতে পারেন না। মনের কথাগুলো হীরাবাঈ টেনে বার করতে পারে। ব্যাখ্যা করতে পারে। মাঝে মাঝে অস্বস্তি হয়। প্রসঙ্গ পালটান, 'কি তোমার দুঃখ?'

'আমার অনেক দুঃখ। আপনি সে দুঃখ বুঝবেন না আলিজা। আমি কি শাহজাদার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছুঁতে পারি? কিংবা আপনার বেগমদের ভাবনা কিংবা দুর্ভাবনা?'

'তুমি পার।' আবেগে মিশিয়ে মৃদুস্বরে বলেন ঔরঙ্গজেব, 'অন্তত আমাকে তুমি পড়তে পার। তোমার মন আয়নার মতো স্বচ্ছ।'

হীরাবাঈয়ের হাসিতেও বিষণ্ণতার আভাস। ঔরঙ্গজেব ব্যাকুল হন, 'বলো, বলো তুমি কি চাও হীরাবাঈ।'

'আলিজা, আপনি তো না চাইতেই আমাকে সব কিছু দিয়েছেন। আর আমি কি চাইব?'

প্রতি সন্ধ্যারই এক রূপ, এক রঙ, তবু তাকে নতুন মনে হয়। প্রায়ই ঔরঙ্গজেব প্রশ্ন করেন হীরাবাঈকে, 'তুমি আমাকে ভালোবাস?' এ প্রশ্ন চিরকালের। এ প্রশ্ন সব প্রেমিক প্রেমিকার। এ প্রশ্নটাই হরিয়ে গিয়েছিল শাহজাদার জীবন থেকে। হারিয়ে যায় বলে শক্তি সম্পদে তাঁরা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে খরিদ করেন, উপভোগ করেন। কিন্তু বিকিকিনির হাটে প্রেমের সওদা হয় না। তামাম দুনিয়ার ঐশ্বর্য হাতে থাকলেও অধিকাংশ বাদশাহ কিংবা শাহজাদার জীবনে প্রেম অধরাই থেকে যায়। ঔরঙ্গজেব জানেন, সবই জানেন। সেজন্য একই প্রশ্ন বারবার করেন, 'তুমি আমাকে ভালোবাস হীরাবাঈ?'

'আলিজা, আপনি আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়।'

শুনতে খুব ভালো লাগে ঔরঙ্গজেবের। তাঁর চারপাশে মতলবি মানুষের ভিড়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউ তাঁকে ভালোবাসে না, হয়ত নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাঁর দীর্ঘ জীবন চায়। তারা সবাই চায় ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হোন। তিনি নিজেও সে স্বপ্ন দেখেন। মুখে যতই উদাসীন্য দেখান, আসলে যে তা নয়, সে তো তিনি জানেন। আর জানেন, হীরাবাঈ। এক আশ্চর্য নারী। কী গভীর তার জীবনবোধ!

একদিন মধুর হেসে হীরাবাঈ বলেন, 'আপনি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসেন আলিজা?'

'নিশ্চয়।'

'প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'বল কি প্রমাণ চাও?'

'এত উদারভাবে বলবেন না আলিজা। আগে ভালো করে ভেবে নিন।'

'ভাবতে হবে না। তোমাকে দিতে পারি না এমন কিছু নেই আমার।'

'সোনার পানপাত্রে হীরাবাঈ ঢাললেন তরল আগুন। ঔরঙ্গজেবের কোন আপত্তিতে কান না দিয়েই তিনি পান করেন। মাতাল হন কিংবা নিজেকে ভুলে থাকেন। কোন পরসতার তাঁর মতো দুঃসাহসী হতে পারে না। পানদোষ থাকলেও শাহজাদার সামনে কি পান করতে পারত তারা? আগে তো ঔরঙ্গজেবের হারেমের সুরার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। হীরাবাঈয়ের জন্য নিয়ম শিথিল করতে হয়েছে। ঔরঙ্গজেব মেনে নিয়েছেন। তাঁকে মানতে হয়েছে।

পানপত্র পূর্ণ করে হীরাবাঈ সেটি তুলে ধরলেন ঔরঙ্গজেবের দিকে। হেসে বললেন, 'তাহলে এই শরাব পান করুন আলিজা।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঔরঙ্গজেব। প্রাণের মায়া থাকলে কেউ তাঁকে এ অনুরোধ করতে সাহস পাবে না। তিনি শুধু ঘোর সুরাপানবিরোধী নন, সুরাকে ঘৃণা করেন। নিজের অজান্তেই মুখটা একটু বিকৃত করলেন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় ক্রোধ ও ঘৃণাকে দমন করলেন প্রাণপণে। শেষ পর্যন্ত জয় হল প্রেমেরই। তিনি তাকালেন হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে। হাসি মুখে তিনি চেয়ে আছেন তাঁর আলিজার মুখের দিকে। ভালোবাসার অন্তিম পরীক্ষায় ঔরঙ্গজেব জিতবেন না হারবেন? আন্তরিক অনিচ্ছাকে দমন করে হীরাবাঈয়ের হাত থেকে শরাবের পেয়ালাটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গ্রহণ করে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই পানপাত্রটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন হীরাবাঈ। বিস্মিত ঔরঙ্গজেবকে আরও অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি আপনার ভালোবাসার গভীরতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম আলিজা, এই বিষ খাইয়ে আপনাকে অপবিত্র করতে আমি চাইনি।'

বিস্মিত, মুগ্ধ ঔরঙ্গজের আবার বলেন, 'তাহলে তুমি এ বিষ খাও কেন?'

'আপনি জানেন না শাহজাদা আমার কত দুঃখ। সেসব ভোলার জন্যে বিষ চাই। অমৃত আমি পাবো কোথায় বলুন।'

ঔরঙ্গজেবের মনে হয়, তুচ্ছ পরসতারের জীবন হীরাবাঈয়ের ভাল লাগছে না। বললেন, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি হবে আমার প্রধান বেগম।'

হেসে ওঠেন হীরাবাঈ। বলেন, 'আমি বেগম হতে চাই না।'

'সে কি? তুমি আমার বেগম হতে চাও না? হয়ত আমি একদিন দিল্লির বাদশাহ হব...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হীরাবাঈ। নিজের মনের উত্তেজনা ছড়াতে দেন না তিনি। বেগম হবার শখ তাঁর নেই। শাহজাদা সবাইকে মেরে ধরে বাদশাহ হবেন ভাবতেও তাঁর মন গুলিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলেন, 'না শাহজাদা আমার কোন উচ্চাশা নেই। আমি আপনাকে ভালোবেসেই সুখী। বেগম হয়ে আমি আপনাকে কোন অন্যায় করতে দেব না।'

'তার মানে?'

'আমি অন্যায়ভাবে আপনাকে সিংহাসনে বসতে দেব না। আপনি কাউকে বঞ্চিত করে বাদশাহ হতে পারবেন না।'

ঔরঙ্গজেব কিছুটা অভিভূত হয়ে উঠে যান হীরাবাঈয়ের মহল থেকে। এসব চিন্তা তাঁর মনে কখনও ছায়া ফেলেনি। লোভ, হিংসার পরিবর্তে ত্যাগ, বঞ্চনা। এসব শব্দের সঙ্গে যেন তাঁর পরিচয়ই হয়নি। বাদশাহ হবার দুর্বার বাসনার নীচে পাথরচাপা হয়ে পড়েছিল অকিঞ্চন ফকির হবার সাধ। হীরাবাঈ যেন সেই সাধকেই উসকে দিলেন।

ঔরঙ্গজেব ও হীরাবাঈয়ের প্রেমের কথা সমকালীন সকলেই জানতেন। খবর পৌঁছে গিয়েছিল ঔরঙ্গাবাদ থেকে সুদূর আগ্রায়। তুচ্ছ এক পরসতারের সঙ্গে শাহজাদার প্রণয়চর্চা কতখানি আলোচিত হলে তবে তা বাদশাহের কানে তোলা হয়? দারা শুকোহ্ পর্যন্ত শুনে মুখ বেঁকিয়েছিলেন, 'ধার্মিক মিতাচারী ভণ্ডটার কাণ্ড দেখ। কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে মেসোর হারেমে পর্যন্ত ঢুকেছে।' সত্যিই তো শাহানশাহ আকবর নিয়ম করে দিয়েছিলেন অপরের হারেমের প্রতি নজর দেওয়া চলবে না। একমাত্র বিজিতের হারেমে বিজয়ীর অধিকার তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু প্রেম তো নিয়ম কানুন মেনে চলে না, তাই বারবার নিয়ম ভাঙে।

রাজনীতি বা হারেম ষড়যন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাননি হীরাবাঈ, তবু তিনি জড়িয়ে পড়ছিলেন। কেউ তাঁর সাহায্যে ঔরঙ্গজেবের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করছিলেন, কেউ তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইছিলেন পৃথিবী থেকে। বাইরে রটে গিয়েছিল, ঔরঙ্গজেব এখন বদলে গিয়েছেন। তিনি দিওয়ানখানায় বসে হীরাবাঈয়ের নাচ দেখেন, শরাব পান করেন, তখ্ত-এ-তাউস হাসিল করার কথা ভাবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবে এতটা পরিবর্তন হয়নি। তবে তাঁর ওপর হীরাবাঈয়ের প্রভাবের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহজাদা নিজেও স্বীকার করতেন সে কথা। বলতেন, 'তুমি আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছ হীরাবাঈ।'

'আপনি একটুও বদলাননি আলিজা, 'হীরাবাঈ হাসতে হাসতে বলেন।

'সত্যি হীরাবাঈ। মাঝে মাঝে তোমার মতো আমিও স্বপ্ন দেখি, সবাই সুখে আছে।

কোথাও বিদ্বেষ কিংবা হানাহানি নেই ... তুমি আমি অনেক দূরে সামান্য ফকিরের মতো দিন কাটাচ্ছি।'

'আমি কিন্তু ফকির হবার জন্যে আপনাকে সিংহাসনের যুদ্ধ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইনি। নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছি।'

ঔরঙ্গজেব বুঝতে পারেন হীরাবাঈয়ের মনের কথা। যুদ্ধ তো একতরফা হয় না, কোন পক্ষের জয় হবে কে বলতে পারে? অথচ তাঁর ভাল-মন্দের কথা এভাবে তাঁর কোন বেগম কখনও ভাবেন না। কেউ-ই কি ভাবে? সর্বশক্তিমান বাদশাহ আর শাহজাদারা চাইলেও কারও আন্তরিক ভালোবাসা পান না। বলেন, 'তুমি আমাকে এত ভালোবাস হীরাবাঈ? অথচ আমি তোমাকে কীই বা দিতে পেরেছি? বাদশাহ হয়ে নয় আমি তার আগেই তোমাকে বেগম করব।'

'বেগমদের অনেক সম্মান আলিজা। প্রত্যেক পরসতার বেগম হবার স্বপ্ন দেখে কিন্তু আমি আপনার ভালোবাসা পেয়েই সুখী। এর চেয়ে বড় সম্মান আমি চাই না। ভয় করে, বেগম হয়ে হয়ত আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাব।'

'কখনও এ কথা বোলো না। আমি তোমার পাশে চিরকাল থাকব। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব।'

'আপনি আমায় এত ভালোবাসেন? আলিজা আপনি আমাকে দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মতো নারীর জীবনে দুঃখ থাকেই। আমারও ছিল। আজ আর নেই। আপনি সব কিছু ভরে দিয়েছেন।'

এই সব মূল্যবান মুহূর্তগুলি ঔরঙ্গজেবকে পৌঁছে দেয় অনির্বচনীয় সুখের জগতে। কিন্তু তাঁর জীবনে এই অধ্যায়টি শেষ হল অল্পদিনের মধ্যেই। মাত্র দুটি বছর ঔরঙ্গজেবের জীবন সুধায় ভরে দিয়ে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন হীরাবাঈ। সম্ভবত হীরাবাঈয়ের মৃত্যু হয় ১৬৫৫ সালে। কেন ও কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল কোথাও তা জানানো হয়নি। অতিরিক্ত মদ্যপানই কি তার কারণ? ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে পানপাত্র ছিনিয়ে নিলেও হীরাবাঈ নিজে সেই বিষ ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর পরমপ্রিয় আলিজার শত অনুরোধেও না। আবার এই মৃত্যুর আড়ালে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি ছিল না তাও স্পষ্ট নয়। হীরাবাঈ অনেকেরই শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। এই শত্রুতা অবশ্য উচ্চাশার বিরুদ্ধে। ঔরঙ্গজেব তাঁর কথা শোনেন এবং তাঁর কথায় সিংহাসনের দাবি ছেড়ে ফকির হতে পারেন এমন একটা গুজব প্রায়ই শোনা যেত। বিদেশি পর্যটক মানুচিও শুনেছিলেন। কাজেই হীরাবাঈকে শাহজাদার জীবন থেকে সরিয়ে দেবার কথা হারেমের কেউ কেউ নিশ্চয় ভেবেছিলেন।

হীরাবাঈকে বাঁচবার চেষ্টা কম করেননি হাকিমেরা। সব কাজ ফেলে ঔরঙ্গজেব বসে থেকেছেন তাঁর শিয়রে। চোখের সামনে দেখেছেন একটি অম্লান কুসুমকে ঝরে পড়তে ম্লান হয়ে। বুকভাঙা কান্না চেপে অবিচলিত ভাবে তিনি হারেম থেকে বেরিয়ে চলে এলেন দিওয়ানখানায়। শুষ্ক কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'তাঁকে বেগমের মর্যাদায় সমাহিত করবে। বড় হৌসের পাশে, বাগিচার মধ্যে।' বলেই জানালেন, তিনি শিকারে

যাবেন। সঙ্গে থাকবেন শুধু তাঁর প্রিয় সঙ্গী আকিল খাঁ। সবাই বিস্মিত হল। আজ মৃগয়ায় যাবেন শাহজাদা? তার চেয়ে বরং ঘরে বসে যদি একান্তে.... কিন্তু শাহজাদা তো কারও কথা শুনবেন না। যাঁর কথা শুনতেন সেই আজ নেই।

ঘোড়া ছুটিয়ে বনের মধ্য প্রবেশ করলেন তাঁরা। ঔরঙ্গজেব শিকারে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। কতকটা আনমনেই গহন থেকে গহনতর অরণ্যে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। বিশ্বস্ত অনুচরের মতো পাশে পাশে আকিল খাঁ। যিনি শুধু বীর নন কবিও। এক সময়ে নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে আকিল খাঁ বলেই ফেললেন, 'আজ শিকারে না বেরোলেই ভাল হত।'

ঔরঙ্গজেব সেখান দাঁড়িয়েই স্বরচিত কবিতা শোনালেন আকিল খাঁকে। তিনি কবিতা লিখতেন খুব কম। কবিতা যে ভালোবাসতেন, পরবর্তীকালে তার প্রমাণ নেই। কিন্তু তাঁর দু চারটি বয়েৎ বা শেরের উল্লেখ আছে নানা জায়গায়। এমনই একটি আছে মাসির-উল-উমারায়। এই নির্জন অরণ্যে ঔরঙ্গজেব আকিল খাঁর প্রশ্নটিকে ধৃষ্টতা হিসেবে গণ্য করলেন না। কিছুক্ষণ উদাস হয়ে নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

না ল-হায় খানগী দিল-রা তসল্লী বর্খশ নীস্ত্
দর্ বয়াবাঁ মী তওআঁ ফর্য়াদ্ খাতির খাহ্ কর্দ।

...ঘরে বসে বিলাপ করলে মন হালকা হয় না, প্রাণ ভরে কাঁদা যায় শুধু নির্জনে।

হাউজের পাশে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন তাঁরা। বড়া হৌসের পাশে একটি নতুন সমাধি। ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা হীরাবাঈয়ের। মাটির দেহ মাটিতে মিশে যাবে। মাটিতে মিশবে অমর্ত্য সুষমা। চারপাশে প্রগাঢ় শান্তি। ঔরঙ্গজেবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আকিল খাঁ আত্মগতভাবেই তৎক্ষণাৎ রচনা করে ফেললেন একটি শের।

ইশ্‌ক্ চে-আঁসা নুমদ আহ্ চে-দুশওয়ার্ বুদ
হিজ্‌র চে-দুশওয়ার্ বুদ ইয়ার চে-আঁসা গিরফ্‌ত।

...প্রেমকে কত সহজ মনে হয়েছিল একদিন, কিন্তু কী কঠিন আজ সে, কী কঠিন এই বিচ্ছেদ বেদনা, কিন্তু কী মধুর শান্তি তাকে দিয়েছে।

মুগ্ধ হলেন ঔরঙ্গজেব। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। নিজেও বার দুয়েক আবৃত্তি করে আকিল খাঁকে বললেন, 'কী সুন্দর। কে লিখেছে এই কবিতা?'

আকিল খাঁ নিজেই 'রাজি' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তিনি বললেন না নিজের নাম, চুপ করেই রইলেন। ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন ঔরঙ্গজেব।

দিন কয়েক কেটে গেল। ঔরঙ্গজেবের জীবন থেকে মুছে গেল একটি অধ্যায়। হীরাবাঈয়ের সমাধিক্ষেত্রটি বোধহয় পরিণত হয়েছিল উদ্যানে আর লোকের মুখে মুখে তার নাম হয়ে যায়, রানী বেগম কা বাগ। কেউ কেউ বলেন হীরাবাঈ হিন্দু ছিলেন। মন্দিরেও যেতেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা নিবিয়ে এনেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, কোন অন্যায় করবেন না তিনি। হীরাবাঈকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, হিন্দু মতে সৎকার করার প্রসঙ্গ একেবারে ওঠেনি। হয়ত পরসতারদের জাত থাকে না, প্রভুর ধর্মই তাদের ধর্ম। এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

কয়েকদিন পরে ঔরঙ্গজেব নিজের ঘনিষ্ঠদের ডেকে জানিয়েছিলেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমার জীবন থেকে হীরাবাঈকে কেড়ে নিয়েছেন কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই। সে থাকলে আমি কোন অপরাধ, কোন অন্যায়, কোন অবিচার করতে পারতাম না। এমন কি সিংহাসনের দাবিও আমি ছাড়তে রাজি হয়েছিলাম। এ সবই ছিল সেই মহীয়সী নারীর ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহ্-র ইচ্ছা যে তা ছিল না, আজ বুঝতে পারছি। সেজন্যই তাকে অকালে চলে যেতে হল।' পর্যটক মানুচির বিবরণেও আছে একথা।

এর পরে ঔরঙ্গজেব কখনও পিছন ফিরে তাকাননি। ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকের প্রতিই ছিলেন সবচেয়ে নির্মম। জীবনে আর কোনদিন গান শোনেননি। সুরার প্রতি বিতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর সিংহাসনে বসার ইতিহাস সবারই জানা। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করেছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির বাতাবরণে। তাঁর প্রণয় কাহিনী সমসাময়িক বিবরণে গোপনে রক্ষিত ছিল বলেই এই অবিশ্বাস্য উপাখ্যান হারিয়ে যায়নি। প্রেমের মহান শক্তির এও এক পরিচয়। ঔরঙ্গাবাদের বড়া হৌসের পাশে এখনও আছে হীরাবাঈয়ের সমাধি। ভারতেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের শেষজীবন কাটে এই অঞ্চলেই। সেখানে দীন দরিদ্রের সমাধির মতোই তাঁর নিরাভরণ সমাধি। শেষ জীবনে ঔরঙ্গাবাদে এসে কি তাঁর মনে পড়েছিল সেই স্বপ্নোচ্ছল মধুযামিনীগুলির কথা? বাদশাহ হয়েও দিন গুজরান করতেন দরিদ্রের মতো। কোরান নকল করে ও টুপি সেলাই করে যা আয় করতেন তাতেই নিজের খরচ চালাতেন। শেষে ঘুমিয়ে রইলেন দরিদ্রের মতো। মাটির মানুষ মিশল মাটিতে। কিন্তু প্রেম কখনও হারায় না। ঔরঙ্গজেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা তাঁর কথা না লিখে পারেননি। বুরহানপুরের তাপ্তী নদী আজও শোনায় জয়নাবাদের আহুখানার কথা। বড় হৌসের নিস্তরঙ্গ জলে মিশে থাকে প্রেমিকের চোখের জলের নোনতা স্বাদ।

বাজীরাও ও মস্তানী

স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজী আর সেই স্বপ্নকে সম্ভাবনায় বদলে দিতে চেয়েছিলেন পেশোয়া বাজীরাও। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তাঁর নাম। শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি বাজীরাও, পুনের মানুষ এজন্য আজও দায়ী করেন মস্তানীকে। মস্তানীর প্রেমে না মজলে বাজীরাওকে কোন ঝামেলায় পড়তে হত না। জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব আর জাতপাতের চুলচেরা বিচারই সেই অসামান্য মানুষটিকে ঠেলে দিল চরম সর্বনাশের দিকে। মারাঠা শক্তির ঘোড়ার ক্ষুরের আগ্রাসী ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ে পুরোপুরি চাপা পড়ে গিয়েছেন মস্তানী। ঐতিহাসিকেরা সে ধুলো ঝেড়ে মস্তানীকে দেখার চেষ্টা করেননি কখনও। প্রয়োজনও ছিল না। সমস্তটাই তাঁরা হিন্দু সমাজের ছুৎমার্গের বাড়াবাড়ি বলে নিন্দা করেছেন। পুনের মানুষেরা জানেন, বাজীরাও মস্তানীকে প্রাণ ঢেলে ভালো না বাসলে দুজনেরই জীবন বইত ভিন্ন খাতে।

বাজীরাও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন চোখে নিয়েই জন্মেছিলেন, কিছুটা খাপছাড়া তাঁর অভ্যুত্থান। চিরকাল ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্রণা দিয়েছে। রাজা ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। ছত্রপতি শিবাজীর মন্ত্রী বা পেশোয়ারাও ব্রাহ্মণ, তবে এই পদের উত্তরাধিকার ছিল না। যোগ্য ব্রাহ্মণ পদাধিকারী হতে পারতেন। বাজীরাওয়ের পিতা বালাজী বিশ্বনাথ শিবাজীর আটজন পেশোয়ার একজন ছিলেন। কিন্তু শিবাজীর পৌত্র শাহু বালাজীর সাহায্যে গৃহবিবাদের জের মিটিয়ে সিংহাসনে বসার পর থেকে বালাজীর প্রতিপত্তি বাড়ে, পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদটিও উত্তরাধিকারসূত্রে পেশোয়া পুত্রের হাতে আসে। শাহুর সময়ে আটজন পেশোয়ার পরিবর্তে একজন পেশোয়া প্রাধান্য পেলেন। বালাজীর পরে পেশোয়া হন বাজীরাও। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে পেশোয়া ও সেনাপতির ঝগড়া লেগেই থাকত। আর রাজার কাছে দুজনেই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। বুদ্ধিমান বালাজী পুত্রদের শৈশবেই অস্ত্রশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। ফলে বাজীরাও হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ যোদ্ধা এবং সহজেই সেনাপতির পদটিও তিনি পেয়েছিলেন। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি পেশোয়া হলেন আবার তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। শাহু ছিলেন নামে মাত্র রাজা, বিলাসী এবং বাজীরাওয়ের প্রতি স্নেহবৎসল। পরম নিশ্চিন্তে শাহু তাঁর হাতে দেশের ভার সঁপে দিয়ে স্বস্তিতে ছিলেন। মুঘলশক্তির তীব্রতা ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল। বাজীরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, হিন্দু 'পাদপাদশাহী' স্থাপনের। অস্তগামী মুঘল শক্তি তখন সকালের চাঁদের মতো ম্লান। তাই

সে স্বপ্ন সঞ্চারিত হল অন্য রাজাদের মনে। বাজীরাওয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে লাগলেন গাইকোয়ড়, হোলকর, সিন্ধিয়া, ভোঁশলে এমনকি রাজপুত এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজারাও। একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হলেন বাজীরাও।

অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ছত্রশাল বুন্দেলা আমন্ত্রণ জানালেন বাজীরাওকে, নিজের দেশে। প্রায় সমবয়সী বীরসেনানীকে পরম বন্ধু বলে সম্বোধন করে লিখলেন, বীরপূজা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, দয়া করে আমাকে একবার সে সুযোগ দিন। পদার্পণ করুন আমার দেশে, ধন্য হব আমরা।'

খুশি হলেন বাজীরাও। ছত্রশাল বুন্দেলা তাঁর বন্ধু। বন্ধুর কাছে যাবেন বই কী। শাহুর অনুমতি নিয়ে বাজীরাও রওনা হলেন। ওদিকে সাজ সাজ সব পড়ে গেল। ছত্রশাল স্থির করলেন, এমন সব আয়োজন করবেন যা দেখে তাকে লেগে যাবে মারাঠাবীরের। হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসাহী অন্য রাজারাও এলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। অপূর্ব ব্যবস্থা। বাজীরাও এসব চোখেই দেখেননি। মহারাষ্ট্রের সেনাপতিরা সাদাসিধে জীবন কাটান। অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে কোথাও স্থায়ীভাবে বেশিদিন বাস করেন না, বিলাসী জীবন কাটাবার সুযোগও নেই। এক সন্ধ্যায় বাজীরাওয়ের সম্মানে নাচমহলের হাজার বাতি জ্বালা ঝাড়ের নীচে চান্দেরি চুনরির ঘোমটা সর্বসমক্ষে প্রথম তুললেন সপ্তদশী মস্তানী। কারোর চোখে যেন পলক পড়ে না। সকলেই মুগ্ধ, বাকরুদ্ধ। বাজীরাওয়ের মনে হল, স্বর্গ থেকে খসে পড়ল পারিজাতের একটি কুঁড়ি। এ যেন মর্ত্যের মানবী নয়, ইন্দ্রসভার নর্তকীদের কেউ। তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন তিনি। হাজার বাতির আলো ম্লান হয়ে গেল মস্তানীর পাশে।

নৃত্য শেষ হল। অপরূপ সেই নৃত্য, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন মস্তানী। আজ তাঁর জীবনের সেরা দিন। এতগুলি রাজার সামনে নিজের নৃত্যকলা প্রদর্শনের। হয়ত তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হবে এইখানেই। নৃত্য শেষ হল এক সময়ে। সবার উচ্ছ্বাস দেখে বোঝা যায়, তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন মস্তানী। নৃত্যগীত শেষ হল, ঘোর কাটল না শুধু বাজীরাওয়ের। অথচ অযথা নারীবিলাস কোনদিনই তাঁকে টানেনি। নারী বর্জিত জীবনও তাঁর নয়। মহারাষ্ট্রে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমাজে বাল্যবিবাহ সুপ্রচলিত। বাজীরাওয়ের বয়স যখন মাত্র ন বছর, তখনই বালাজী বিশ্বনাথ তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধুর চার বছরের অতি সুলক্ষণা কন্যা কাশীবাঈয়ের সঙ্গে অনেক ঠিকুজি কোষ্ঠী যোটক বিচার করে রাজপুরোহিত বলেছিলেন, 'রাজযোটক বিবাহ। অতি শুভ লক্ষণ।' খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল। খেলাঘরের বিয়ের মতো হলেও সত্যিকারের বিয়ে। বাজীরাও উপহারস্বরূপ পেলেন একটি তোপ। বালাজী সস্নেহে বললেন, 'এটি বাজীরাওকে উপহার দেওয়া হল।' আজও সেটি পুনের শনিবার প্রাসাদে সাজানো আছে। সেই কাশীবাঈ এখন পূর্ণ যুবতী। বাজীরাওয়ের সন্তানের জননী। না, প্রেমোন্মেষের অপরূপ মহিমার সঙ্গে বাজীরাওয়ের কখনও পরিচয় ঘটেনি। কোনও নারী কোনদিন তাঁর ঘুম কেড়ে নেননি। কাশীবাঈ তাঁর জীবনে পুরনো এবং পরিচিত অভ্যাসমাত্র। এই প্রথম তিনি সারা রাত ধরে একটি নারীর কথা ভাবলেন। শেষ রাতের আকাশে যখন শুকতারাটি দেখা দিল তখন বাজীরাও স্থির করলেন বিদায় নেবার আগে

আর একবার তিনি মস্তানীকে দেখতে চাইবেন। বন্ধুকে বলবেন, 'আমি আর একবার সেই অপরূপ রূপসী নর্তকীকে দেখতে চাই। নৃত্য নয়, শুধু তাকে দেখতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে নিরাশ করবেন না।' ছত্রশাল নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। তিনি আর একবার দেখবেন সেই স্থির প্রদীপশিখাটিকে।

বিদায়ের পালা এল। বাজীরাও বন্ধুর দুটি হাত ধরে জানালেন মনের কথা। 'বন্ধু, আপনার এখানে এসে আমি যে কত সুখী হয়েছি তা মুখের কথায় বোঝাতে পারব না। সারাজীবন আমার স্মৃতিতে থাকবে এই কটি দিনের অভিজ্ঞতার কথা। যদি ছোট একটি অনুরোধ করি রাগ করবেন না তো?'

ছত্রশাল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সে কি কথা পেশোয়াজি?' আপনি আমাকে আদেশ করুন।'

'আদেশ নয় বন্ধু, অনুরোধ। শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখতে চাই আপনার রঙমহলের সেরা সুন্দরীকে। আমার চোখে সে মর্ত্যের উর্বশী। সেই মস্তানীকে আমি একবার দেখতে চাই।'

'সে কি?' ছত্রশাল হেসে ফেলেন, 'এই সামান্য ব্যাপার। তুচ্ছ একটা কাঞ্চনীকে দেখতে চান আপনি?'

'তাকে কখনও তুচ্ছ মনে হয়নি আমার। এত রূপ আগে কখনও দেখিনি। জানি আমার প্রস্তাব আপনার কাছে অশোভন হয়ে উঠছে। তবু তাকে একবার দেখতে চাই। কথা দিচ্ছি নিভৃতে একা পেয়ে তার কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করব না আমি।'

ছত্রশাল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দরাজ হেসে বললেন, 'আজ থেকে মস্তানী আপনার।' তিনি বাজীরাওয়ের মনের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এতক্ষণ ভাবছিলেন, রাজকোষের কোন দামি রত্নটি দিয়ে তিনি বন্ধুর মান রাখবেন। এত সহজে সে সমস্যার সমাধান হবে কে জানত? এই রূপসী কাঞ্চনীটিকে বাজীরাওয়ের অভ্যর্থনার জন্যই বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল। তাকে যখন বাজীরাওয়ের এত পছন্দ তখন তাকে উপহার হিসেবে দান করলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। বন্ধুও কৃতজ্ঞ থাকবেন, রাজকোষের দামি পাথরগুলোও রক্ষা পাবে।

'আমি তো তা বলিনি। জোর করে কাউকে অধিকার করতেও চাইনি।'

ছত্রশাল বললেন, 'আমিও কি তা বলেছি? আপনার জন্যই মস্তানীকে সংগ্রহ করেছি। আমাদের দেশে এ রীতি চলে। মেয়েটির পরম সৌভাগ্য আপনি ওর প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরেছেন।'

'না বন্ধু, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা না জেনে তাকে আমি জোর করে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাব না।'

'যেমন আপনার ইচ্ছে তেমনই হবে। আমি এখনই মস্তানীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিজেই তাকে প্রশ্ন করুন।'

ছত্রশালের নির্দেশমত অল্পক্ষণ পরেই এলেন মস্তানী। তসলিম জানালেন বাজীরাওকে। অপরূপ রূপসী হলেও তিনি সামান্য এক কাঞ্চনী। ভূপালের এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবার নাম আলি জাফর, মায়ের নাম মেহেরউন্নিসা।

পাগল করা রূপ নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর গায়ের রঙ। তিনি যখন পান খেতেন, দেখা যেত তাঁর মর্মরশুভ্র কণ্ঠ বেয়ে একটি রক্তিম আভা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য রূপের অগ্নিশিখা চারদেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকার নয়। মস্তানীও নৃত্যগীতের তালিম নিতে নিতে হাজির হলেন বুন্দেলা ছত্রশালের নাচমহলে। কাঞ্চনমূল্যে কেনা বাঁদী, ছত্রশাল অতি সহজেই তাঁকে উপহার দিতে পারলেন বন্ধুকে। রূপের সমঝদার তিনিও। কিন্তু বাজীরাওয়ের মতো মোহাবিষ্ট হননি তিনি। মস্তানীর মতামত নেবার কথা তাঁর মনেও আসেনি।

স্বচ্ছ চান্দেরি মসলিনের অবগুণ্ঠনের আড়ালে আবার মস্তানীকে দেখে এক অনাস্বাদিত পুলকে কেঁপে উঠলেন বাজীরাও। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে দমন করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মস্তানী, আমি বন্ধু ছত্রশালের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম, তোমাকে একবার দেখতে চাই। তিনি সৌজন্যবশত উপহার হিসাবে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি ধন্য! কিন্তু আমি তোমার ওপর কোন অধিকার আরোপ করতে চাই না। আমি বিশ্বাস করি না, কাঞ্চনমূল্যে তোমার মতো নারীকে কেনা যায়, ইচ্ছে হলে বিলিয়ে দেওয়া যায়। সমস্ত ঘটনাটা আমাকে ব্যথিত করেছে। তুমি স্বাধীন। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি যেতে পার। ছত্রশালের রাওলায় থাকতে পার। আমার সঙ্গে পুনা যেতে পার। বল তুমি কি চাও?'

মস্তানী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। এমন কথা তিনি তাঁর সতের বছরের জীবনে কোনদিন শোনেননি। জ্ঞান হয়ে অবধি জেনে এসেছেন, তাঁর ইচ্ছের কোন দাম নেই। আজ শুনলেন নতুন কথা। আনত চোখ দুটি তুলে তাকালেন বাজীরাওয়ের দিকে। কৃশকায় মানুষটি। রাজপুত কিংবা মুসলিম শাসকদের মতো সুপুরুষ নন। কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য স্বপ্নময়। মস্তানী মুহূর্তের মধ্যে ভালোবেসে ফেললেন বাজীরাওকে। রূপবান নন তবুও মস্তানী তাঁকে দেখলেন প্রেমিকার চোখ দিয়ে। মহতের সৌন্দর্যও কম নয়। সামান্য নর্তকীকে এত সম্মান কে দেয়? তাই উত্তর দিতে একটুও ভাবতে হল না মস্তানীকে। পুনরায় তসলিম জানিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনার আশ্রয়ে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব মালিক।'

বাজীরাওয়ের খুব ভালো লাগল মস্তানীর উত্তর। তিনি তো মস্তানীকে দেখেই ভালোবেসে ফেলেছেন। এমন পাগল করা রূপ। সেই সঙ্গেই বুঝেছিলেন, জোর করে একে হয়ত অধিকার করা যায়, ভালোবাসা পাওয়া যায় না। আর ভালোবাসা না থাকলে এক নারীর সঙ্গে অন্য নারীর তফাত কি? তাই, যাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, একে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাকেও জোর খাটিয়ে ধরে রাখতে চাইলেন না, বরং পায়ের শিকল খুলে দিলেন। উড়ে যাবার অভিপ্রায় মস্তানীর ছিল না। কারোর না কারোর আশ্রয়ে তো থাকতে হবেই, বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাও তাঁকে দিয়েছেন দুর্লভ সম্মান, মুক্তির স্বাদ। এই তো যথেষ্ট। ভালোবাসার অধিকার নেই কাঞ্চনীদের। মস্তানীর ভাগ্য ভালো, তাঁর প্রভুই তাঁর প্রিয়তম।

বাজীরাও হেসে বললেন, 'আমরা মহারাষ্ট্রের লোক। বিলাসের মধ্যে বাস করি না। তোমার হয়ত কষ্ট হবে।'

মস্তানী মদির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমার মালিক আমাকে যেখানে রাখবেন সেখানেই আমি পরম সুখে থাকব।'

সুখে রোমাঞ্চিত হলেন বাজীরাও, 'এ কী তোমার মনের কথা?'

'এতদিন তো মনের কথা মুখে আনবার সুযোগ পাইনি। তাই কি চাই কোনদিন ভাবিওনি। আজই প্রথম নিজের ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ পেলাম।'

'তোমার রূপের মতো তোমার কথাও মাদকতাপূর্ণ।'

'তাহলে আমাকে পুরস্কার দিন।' হেসে বললেন মস্তানী।

'কী পুরস্কার দেব তোমাকে?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাজীরাও, কি দিতে পারেন তিনি? কি দেবেন এই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে? মোতির মালা? হিরের আংটি? সবই তো ওর রূপের বিভায় ম্লান।

বাজীরাওয়ের বিড়ম্বিত মুখ দেখে আর একবার হেসে ফেললেন মস্তানী, কাঞ্চনী-জীবনের সব নিয়ম ভুলে গিয়ে। এখন তিনি যেসব কথা বলছেন, সেগুলি তাঁর তালিমে ছিল না। তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি, তাঁর প্রভু হবেন এমন একজন পুরুষ, যিনি তাঁকে দেখবেন প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে। সবই তো হিসাবের বাইরে তবে আর একটু বেহিসাবি হলে ক্ষতি কী? বাজীরাওয়ের মনের কথা তিনি বুঝতে পেরে বললেন, 'আমি হিরে মোতি কিছু চাই না।'

বাজীরাও লজ্জিত হয়ে ভাবলেন, মস্তানী ভাবছেন হিরে-মোতির গয়না দেবার ভয়ে তিনি কাতর। হায়, মস্তানী যদি তাঁকে বুঝতে পারত। তিনি যে তাঁর সর্বস্ব ওকে দিয়ে দিতে রাজি। বললেন, 'আমি ভাবছিলাম এমন কি দেব, যা তোমার কাছে দামি মনে হবে। হিরে-মোতির গয়নার চেয়েও তুমি উজ্জ্বল।'

মস্তানী বললেন, 'হিরে-মোতির গয়না থাক আমাদের রানিসাহেবার জন্যে। আমি গরিব। গয়না নিয়ে আমি করবই বা কী? আমি চাই আপনার একটু খুশি, একটু ভালোবাসা। আর কিছু নয়। সেই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

'মস্তানী, তোমাকে দেখেই আমি ভালোবেসেছি। যতদিন বাঁচব, শুধু তোমাকেই ভালোবাসব।'

'মালিক আর আমার কিছু দরকার নেই।'

'আমার আরও কিছু জানানোর আছে।'

'আজ্ঞা করুন।'

'আমরা হিন্দু রক্ষণশীল। সকলে হয়ত তোমাকে ভালোভাবে নেবে না।'

'আমার তো আর কাউকে দরকার নেই।'

এর পরে আর কথা চলে না। বাজীরাও পুনা ফেরার তোড়জোড় শুরু করলেন। মুলা ও মুথা নদীর মাঝখানে পুনা। বাজীরাওয়ের প্রিয় শহর। শহরের প্রান্তে পাহাড়ি টিলা, এখন যেখানে পার্বতী মন্দির, তার কাছেই তৈরি হল একটি ছোট বাড়ি, মস্তানীর জন্য। আবার এমনও হতে পারে, মস্তানী মহল তৈরি হয়েছিল পুনার মস্তানী মহল নির্মাণের আগে কোঠারডে। পরবর্তীকালে দুটি মস্তানী মহলের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। একটি বাজীরাও পরিকল্পিত শনিবার প্রাসাদের মধ্যে। অপরটি কোঠারডে। অনুমান করা

হয়, শনিবার প্রাসাদে আসার আগে মস্তানী এখানেই থাকতেন। কোঠারডে মস্তানী যে কোঠা বা ঘরে থাকতেন সেটি রক্ষা পেয়েছে অলৌকিক উপায়ে। আসলে মস্তানী এখানে থাকতেন ১৭৩৪ সালে। অর্থাৎ শনিবার প্রাসাদের মস্তানী মহলে যাবার আগে। কোঠাঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল দীর্ঘকাল। সৌভাগ্যক্রমে সে খবর পান পুনের বিখ্যাত সংগ্রাহক কাকা কেলকর। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে গোটা ঘরটাই আসবাবসমেত নীলামে কিনে নেন। তারপর পুরো কোঠাটি তুলে আনেন নিজের কেলকর সংগ্রহশালায়। কাঠের ঘর বলে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। কোঠারডে ঘরটি যেমন ছিল, ঠিক সেভাবেই ঘরটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে কাঠের ঝরোখা পেরিয়ে জালি কাটা দরজায় পা রাখলেই এক বিশেষ অনুভূতি আগন্তুককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই গদি, সেই তানপুরা, সেই ঝাড়, সেই বাতিদান, সেই আয়না—সব ঠিক আছে। কেলকরসাহেব পুরনো পর্দা, গালিচা আর দেয়ালচিত্রের নমুনা সংগ্রহ করে নতুন হলেও মানানসই পর্দা, চিত্র ও গালিচা দিয়ে ঘরটি সাজিয়ে দিয়েছেন। এখনই যেন আসবেন বাজীরাও, মস্তানীর শরীরী ছাড়া পড়বে আয়নায়, কেঁপে উঠবে তানপুরার তার। একটি সুখস্মৃতির স্বপ্ন রোমাঞ্চিত করবে আগন্তুককে। কেলকরসাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন, নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করলেও এই মস্তানী মহলই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। বাজীরাও এক ফরাসি চিত্রকরকে দিয়ে মস্তানীর একটি ছবি আঁকিয়েছিলেন। কাচের পরে আঁকা রঙিন ছবি। মসলিনের পোশাক পরা। টুপি পরে, পাখি হাতে বেগমের মতো সালঙ্কারা মস্তানী। এই ছবিটিও সংগ্রহশালায় আছে। শনিবার প্রাসাদেও আছে তবে আসল ছবিটি কেলকরসাহেব কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানা নেই।

তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে পেশোয়ার মতো ধনী ব্যক্তির জীবনে এক বা একাধিক উপপত্নী থাকা দোষের ব্যাপার মনে করা হত না। বহুবিবাহের চল ছিল। শিবাজীর নজন পত্নী ছিলেন। কাজেই মস্তানীকে নিয়ে বাজীরাও প্রথম থেকেই বিপদে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরং মস্তানীর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন। শাহু বাজীরাওকে পুনা শহরটিই উপহার দিলেন। নিজের প্রমোদভবনে এসে বাজীরাও মস্তানীকে শোনালেন সেই সংবাদ। আনন্দে উচ্ছ্বাসে সুরে ও সুরায় সন্ধ্যাটিকে রঙিন করে তুললেন মস্তানী। বাজীরাও বললেন, 'তুমি আমার সৌভাগ্যকে চতুর্গুণ করে তুলেছ মস্তানী।'

'আজ তবে আরও শরাব পেয়ালায় ঢালি?'

'তুমি তো জান আমি বেশি পান করি না।'

'মাতাল না হলে যে আমি থাকতে পারি না প্রিয়তম।'

'তুমি তো নিজেই মস্তানী, তোমার আবার সুরার প্রয়োজন কি?'

'কোন প্রয়োজন থাকত না, যদি তুমি আমার কাছে থাকতে।'

'ঠিক বলেছ মস্তানী, এবার আমি তোমায় আমার প্রাসাদে নিয়ে যাব।'

'সেখানে প্রতিদিন আমি তোমার দর্শন পাব?'

'পুনায় থাকলে আমি শুধু তোমার কাছেই থাকব।'

'এখন তোমাকে প্রতিদিন দেখতে পাই না। কবে তুমি আসবে বলে ঝরোখার পাশে সারাদিন বসে থাকি।'

এক অনির্বচনীয় রসে বাজীরাওয়ের মন ভরে ওঠে। মনে হয় সুখের কোন সীমা নেই। শুধু মস্তানীর সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না। সেজন্যই পুনা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন, আর দেরি নয়, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে তুলে আনবেন মস্তানীকে। প্রতিটি সন্ধ্যাই রঙিন হয়ে উঠবে প্রিয়তমার সান্নিধ্যে। ১৭২৬ সালে বাজীরাও পেলেন পুনা, তার এক বছর আগে এসেছেন মস্তানী। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তখনই প্রাসাদ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া গেল না। জায়গা বাছাবাছি চলল। সেইসঙ্গে মতান্তর ও মনান্তর। কী হবে বড় প্রাসাদ তৈরি করে। শত্রু আক্রমণ করতে পারে...আমরা সৈনিক দুর্গম পাহাড়ই আমাদের ঘরবাড়ি। আরও তিনটি বছর কেটে গেল। শেষে শিবাজীর লালমহলের পাশে বাজীরাওয়ের প্রাসাদের ভিত খোঁড়া হল। প্রাসাদের নাম শেষ পর্যন্ত কি হত কে জানে? শুরু এবং শেষ দুটোই শনিবার হয়েছিল বলে এর নাম নাকি শনিবার প্রাসাদ। সাধারণ মানুষের দেওয়া, কেন না, বাজীরাও তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর সময়ে কতখানি কাজ এগিয়েছিল সে কথাও কেউ বলতে পারে না। তবে একটি মহল নিয়ে কল্পনার কোন অবকাশ নেই, সেটি হল মস্তানী মহল। ষোল কামরার একটি দোতলা কোঠা তৈরি হয়েছিল প্রাসাদের এক প্রান্তে, তার প্রবেশ পথও আলাদা। ভৃত্যমহল ও গোশালার কাছে এই মহলের অবস্থান দেখে বোঝা যায়, পেশোয়া পরিবার ও ব্রাহ্মণ সমাজ বিধর্মী নর্তকীকে প্রাসাদে স্থান দিতে নিশ্চয় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কাশীবাঈ বলেছিলেন, 'এ অন্যায় আমি হতে দেব না।'

পরিবারের সবাই কাশীবাঈয়ের পক্ষে। বাজীরাওয়ের ভাই চিমাজী আপারও প্রবল আপত্তি। 'কোথায় আমরা হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছি আর সেখানে জাঁকিয়ে আসর সাজিয়ে বসবে কি না যবনী পতিতা। আমাদের সকলেরই জাত যাবে যে।'

বাজীরাও যত বড় বীর ছিলেন ততবড় কূটনীতিক ছিলেন না। বালাজীর ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল, বাজীরাওয়ের ছিল না। সংগ্রামে তাঁর জয় অব্যাহত থাকলেও সংসারের জটিলতা তিনি বুঝতে পারেননি। ব্রাহ্মণ সমাজের জাত পাতের বড়াই বড় বেশি কাজেই তাঁরাও চেঁচামেচি শুরু করলেন।

কারও কথা শুনলেন না বাজীরাও। তাঁর মস্তানীর একমাত্র সাধ পুনায় বাস করবার, বাজীরাও কি তাঁর সাধ পূর্ণ করতে পারবেন না? এখন আর মস্তানী শুধু নর্তকী নন, এখন তিনি বাজীরাওয়ের প্রিয়তমা সঙ্গিনী। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি। অনেক লুব্ধ ভ্রমর চেষ্টা করেছেন গোপনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার। মস্তানী হতাশ করেছেন সকলকে। তিনি তাঁর মালিকের আশ্রয়েই থাকতে চান। বাজীরাওয়ের বুকে মাথা রেখে বলেন, 'আমাকে পুনায় নিয়ে চল। আমি আর পর্দার বাইরে বেরোব না।'

বাজীরাও বলেন, 'তোমার এত রূপ, দেখাতে চাও না কাউকে?'

'না, আমি শুধু তোমাকে চাই। শুধু তুমি দেখবে আমাকে।'

'আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

এতদিন যে যুদ্ধটা পেশোয়া পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল, এবার তা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। মারাঠি সমাজে জাতপাত সবচেয়ে বড়। ব্রাহ্মণরা বলতে শুরু করলেন, 'বাজীরাওয়ের জন্যে আমাদের মান সম্মান সব গেল। আমরা তোমাদের সমাজ থেকে পতিত করব।' তাঁদের অভিযোগও গুরুতর। বাজীরাও যবনীর ছোঁয়া খাবার খান। তার হাতে জল খান।

এরকমই একটা সঙ্কটের সময়ে বাজীরাও মস্তানীকে নিয়ে এলেন শনিবার প্রাসাদের মস্তানী মহলে। না, প্রধান দরজা দিয়ে মাথা উঁচু করে নয়, তিনি প্রবেশ করেছেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে। আজও সেই দরজার নাম আলি দরোয়াজা। ষোল কক্ষের মহলটি ভারি পছন্দ হল মস্তানীর। চার পাশেই ঘর, মধ্যের ফাঁকা জায়গাটা যেন নাচমহল। মাটির নীচে আর একসার ঘর, যাতে পুনার প্রচণ্ড গরমে মস্তানীর কষ্ট না হয়। বলা বাহুল্য বাজীরাওকে মস্তানী এখানে এসে আরও আপন করে পেলেন। মস্তানীর একটি পুত্রও হল, সমশের বাহাদুর। তাঁর পুত্রলাভের খবর পেয়ে চমকে উঠলেন পেশোয়া পরিবারের সকলে। আত্মহারা প্রেমিক বাজীরাও এবার নিশ্চয় যবনীর পুত্রকেই পেশোয়া পদে বসাবেন। জ্ঞাতিরা বললেন, 'আমরা আর পেশোয়া পরিবারের সঙ্গে যোগ রাখব না।' প্রতিকার চেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন চিমাজী আপা আর বাজীরাওয়ের প্রাণের বন্ধু মহাদেব অম্বাজী পুরন্দর।

বাজীরাও বললেন, 'পুরন্দর তুমিও?'

পুরন্দর বললেন, 'আর তোমাকে বিশ্বাস করি না। খোঁজ নিয়ে দেখ তোমার পরিবারের সকলেই তোমাকে ত্যাগ করতে চলেছে।'

বাজীরাও ম্লান হাসেন, 'তারা কি কোনদিন আমার পাশে ছিল?'

'আজ তোমাকে সবাই ছেড়েছে। তোমার মা, তোমার স্ত্রী, সন্তানেরা। ব্রাহ্মণ সমাজ তোমার পাশে না থাকুক তোমার ভাইয়েরা তো ছিল। তুমি দোষ দিতে পার না চিমাজী আপাকে।'

'আমি কাউকে দোষ দিই না। সবই ভবিতব্য।'

'ভবিতব্য নয়। ওই সর্বনাশী মস্তানীকে বিদায় করলেই তুমি আবার সব কিছু ফিরে পেতে পার।'

'মস্তানী তো কিছু করেনি। তাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন? তার অপরাধ কি?'

'সে একটি মায়াবিনী। তোমার সর্বনাশ করতে এসেছে। এই অনাচার আমরা সইব না।'

'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

মস্তানী মহলের দেয়ালেরও কান আছে। মস্তানী শুনলেন বাজীরাওয়ের বিপদের কথা। আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন তিনি। নিজের জন্য তাঁর কোন ভয় নেই। ভয় বাজীরাওকে নিয়ে। অপরাহ্নে তিনি যখন এলেন মস্তানী অনেক সাহস সঞ্চয় করে চোখের জল চেপে বিদায় চাইলেন, 'আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা জানাব প্রিয়তম।'

বাজীরাও নীরবে চোখ তুললেন। মস্তানী দেখলেন, সেই চোখে অপরিসীম

বেদনার ছায়া টলমল করছে। বুকটা মুচড়ে উঠল তাঁর। তবু বললেন, 'আমি সবই শুনেছি। আমার কথা ভেব না। আমি চিরকাল তোমাকেই ভালোবাসব। তোমার হয়েই থাকব। কিন্তু সবার যখন আপত্তি তখন আমাকে বিদায় দাও।'

'না মস্তানী, তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।' বাজীরাওয়ের সোজা সাপ্টা উত্তরে মস্তানীর চোখ সজল হয়ে উঠল।

'একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। আজ আমি তোমার সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।'

'কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? কার আশ্রয়ে? গত চোদ্দ বছরে তোমার রূপ চাঁদের মতো ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। কেউ তো তোমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

মস্তানী নিজেও জানেন সেকথা। এই পুনাতেই কত মানুষ আছে। ব্রাহ্মণ সমাজের আঁচ লাগে না তাদের গায়ে। লাগবে কি করে? শাস্ত্র মেনে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে তারা। যবনী উপপত্নীকে ভোগ করে, পানাহারে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে। হায়, বাজীরাও যদি তাঁর ছোঁয়া খাদ্য গ্রহণ না করতেন। তাহলে এই দিন দেখতে হত না। শুধু বললেন, 'তা হোক, তোমার সমাজকে তুমি ছেড়ো না।'

'আমি অন্য কথা ভেবেছি মস্তানী।'

'কি?'

'তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে। গোপনে। যেখানে হোক লুকিয়ে রাখব। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। শুধু কথা দাও আমাকে ভুল বুঝবে না কোনদিন।'

চোখের জলে ভেসে মস্তানী বললেন, 'কোনদিন না।'

'পরে তোমাকে জানিয়ে যাব, কি করতে হবে।'

পরদিনই বাজীরাওকে দাঁড়াতে হল আসামির কাঠগড়ায়। দেশের আদর্শ মানুষটির বিচার চায় ব্রাহ্মণ সমাজ। তাঁরা ভুলে গেলেন, এই মানুষটির জন্য তাঁরা নিরুপদ্রব জীবন যাপন করছেন। তাঁরা ভুলে গেলেন, এই মানুষটিই দিগ্বিজয় করে সব সময় ফিরে এসেছেন মাথা উঁচু করে। এখন তাঁরাই বাজীরাওয়ের শাস্তি চান। না হলে তাঁর পরিবারের সবাইকে পতিত করা হবে।

বাজীরাও বললেন, 'আমি কোন অপরাধ করিনি।'

সবাই গর্জে উঠলেন, 'যবনীর হাতে ভোজন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা তোমাকে জাতিচ্যুত করতে পারি কিন্তু তোমার পূর্ব গৌরব স্মরণ করে শুধু শাস্তি দিতে চাই।'

'কি শাস্তি?'

'তোমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ করতে হবে, মস্তানীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।'

কেঁপে উঠলেন বাজীরাও। এ কেমন প্রতিজ্ঞা? এ কেমন বিচার? এ কেমন ধর্ম? হৃদয়ের যেখানে কোন দাম নেই। প্রেম যেখানে মূল্যহীন। উপভোগে আপত্তি নেই, একত্রে পানাহার করলেই সর্বনাশ। এর চেয়ে মৃত্যুও অনেক সহজ। অর্থহীন বাকবিতণ্ডা হল, কোন ফল হল না। বাজীরাও প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হলেন। এটি তাঁর

দূরদর্শিতার অভাব বলাই ভালো। কেন না প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা যে তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে তা তিনি বোঝেননি। তবে তিনি মস্তানীর নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, 'তাহলে আপনাদেরও প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মস্তানীর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'তথাস্তু। কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না।'

বাজীরাও, নির্ভীক বীর যেমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিপদের সামনে এগিয়ে যায়, তেমনই শান্ত কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করলেন। তৎক্ষণাৎ মস্তানী মহল ঘিরে ফেলল চিমাজী আপার সশস্ত্র সৈন্যেরা। নিজের মহলে বন্দিনী হয়ে রইলেন মস্তানী। বাজীরাও একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে উঠলেন, 'এ কী?'

ব্রাহ্মণেরা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মস্তানী যেখানেই থাকুন নিরাপদে আছেন। আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন।' এ ঘটনা ১৭৩৯ সালের। যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। সময় নেই। বীর সৈনিক সুসজ্জিত হয়ে চলে গেলেন। অন্তঃপুরিকারা মঙ্গলদীপ সাজিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সর্বাগ্রে কাশীবাঈ। বিমনা বাজীরাও কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র যোগ না দিয়েই চলে গেলেন যুদ্ধে। কাশীবাঈয়ের হাত থেকে সোনার প্রদীপ মাটিতে পড়ে গেল। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বাজীরাও বিদায় নিলেন পুনা থেকে। কোথায়ই বা ফিরবেন? মস্তানীহারা জীবনে কী-ই বা আছে? বছর খানেক যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে সেখানেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। বুকে রইল মস্তানীর অমলিন স্মৃতি।

মস্তানী ছিলেন পুনাতেই। ইতিহাসে তাঁর কথা আর পাওয়া যায় না। কল্পনার ঘরে দেয়াল নেই কোনও। তাই নানা কথা ভেসে বেড়ায়। কেউ বলেন, বাজীরাও পুনা ত্যাগ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তানী মহলে আগুন লাগিয়ে দেন চিমাজী আপা। যদি দুর্ঘটনায় মারা যান মস্তানী তাতেই বা ক্ষতি কি? কেউ বলেন, মস্তানী অগ্নিকাণ্ডের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই চেয়েছিল তাঁকে। পায়নি। সূর্যমুখী ফুলের মতো মস্তানীর প্রেম ছিল শুধু বাজীরাওকে ঘিরে। তিনি সবাইকেই প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময়ে যাতে কেউ তাঁকে আশ্রয় না দেয় সেজন্য সবাইকে ভয়ানক শাস্তির ভয় দেখানো হয়। মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয় একটি কুসংস্কার। আজও মারাঠি মেয়েরা নাকি মস্তানীর মুখ দেখতে চান না, সঙ্গে নিতে চান না মস্তানীর সেই ছবি। কারণ কিংবদন্তি বলে, তোমার ঘরে ঠাঁই দিও না মস্তানীকে, তাহলেই চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসবে তোমার জীবনে। তোমার স্বামী যে মুহূর্তে দেখবেন মস্তানীকে, অমনি সে হবে তাঁর প্রিয়তমা আর তুমি স্ত্রী হয়েও হেরে যাবে সেই অদ্বিতীয়ার কাছে। নারীজীবনে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ আর কি আছে?

ধরে নিতে কষ্ট হয় না, মস্তানীর জন্য একটি বাড়ির দরজা এতটুকু ফাঁক হয়নি সেদিন। সমস্ত শহরের প্রভু বাজীরাওয়ের হৃদয়েশ্বরী পালিয়ে বেড়ালেন পুনা থেকে কোঠারডে, সেখান থেকে পালখেরে ও আরও অনেক জায়গায়। মনে তখনও আশা বাজীরাও তাঁর কাছে ফিরে আসবেনই আসবেন। কথা দিয়েছেন তিনি। সে সময়েই কেউ তাঁকে খবর দেয়, 'বাজীরাও আর বেঁচে নেই, তাঁর কথা ভেবে লাভ কি?' বাজীরাও নেই? তবে আর থেকে কি হবে? মারাঠি পুরুষের দৃষ্টিতে শুধু লোভ, মারাঠি

মেয়েদের চোখে তিনি বিষকন্যা। শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়েই জীবনের সব জ্বালা জুড়োলেন মস্তানী। ১৭৩৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে বিষপান করলেন মস্তানী। কোথায় তাঁর মৃত্যু হল জানা যায়নি। তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হল তাও কেউ জানে না। তিনি কি ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন? না আত্মঘাতী হলেন সে উত্তরও বোধহয় পাওয়া যাবে না কোনদিন।

বাজীরাও তখন যুদ্ধক্ষেত্রে, ১৭৩৯ সালে পর্তুগীজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন সালসেট আর বেসিন। মস্তানীর কোন খবর তিনি আর পাননি, মস্তানীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া সম্ভব ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৪০ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ। তাঁর সঙ্গেই হারিয়ে গেল হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। ছারখার হয়ে গেল মারাঠা নেতৃত্ব। মস্তানী আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে বাজীরাওয়ের মৃত্যুর কি কোন পার্থক্য আছে? এও কি আত্মহত্যা নয়? প্রায় দুটি বছর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাটালেন, একটিবারের জন্যও ফিরে এলেন না তাঁর প্রিয় শহর পুনায়। একদিন শেষ হল সব কিছু। কোথায় কোন যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন পরবর্তীকালের কাছে তাও স্পষ্ট নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই নিহত হলেন চিমাজী আপা। চিমাজীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে ওঙ্কালেশ্বরে সতী হলেন অন্নপূর্ণাবাঈ। বারবার কারণে অকারণে আগুন লাগল শনিবার প্রাসাদে। তারই মধ্যে রইলেন শুধু কাশীবাঈ। ভক্তিমতী কাশীবাঈ কেন সতী হলেন না? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তিনি কি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলেন? বাজীরাওয়ের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিলেন? না, বাজীরাও ও মস্তানীর অকালমৃত্যু গভীরভাবে তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। পরিবার ও সমাজের বিরূপতা যতই থাক এই ষড়যন্ত্রে কাশীবাঈয়ের নিজের ভূমিকাটিও তো কম ছিল না। তাই সবচেয়ে কঠিন কাজটি তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে।

মস্তানী নেই কিন্তু তাঁর পুত্র সমশের তো আছে। তাঁর স্বামীই সমশেরের পিতা। তাকে তিনি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেবেন না, স্থির করেছিলেন কাশীবাঈ। তাঁর নির্দেশেই বাজীরাওয়ের তিন পুত্র সমশেরকে ছোট ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মস্তানী মহলেই সমশের থাকতেন এবং পানিপথের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হলে মস্তানী মহলের মালিক হলেন আলি বহাদুর। আলি বহাদুর মস্তানীর পৌত্র এবং বাঁধার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর আসা-যাওয়ার পথটির নাম আজও আলি দরোয়াজা। কাশীবাঈ চেষ্টা না করলে বোধহয় সমশের ও আলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। বিস্মৃতির আড়ালে এঁরা সকলেই হারিয়ে গিয়েছেন। হারায়নি প্রেম। হারাননি বাজীরাও আর মস্তানী। পুনের মানুষ শিবাজীর শৌর্যবীর্যের গল্প বলতে ভুলে যায়, মস্তানী ও বাজীরাওয়ের ভালোবাসার কথা বলতে ভোলে না। মুথা ও মুলা নদী সেসব দিনকে ভুলতে দেয় না, নতুন কেউ শহরে এলেই প্রেমিকযুগলের গল্প শোনায়।

মানসিংহ তোমর ও মৃগনয়না

মধ্যভারতের শিল্প ও সঙ্গীতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মানসিংহ ও মৃগনয়নার প্রেমোপাখ্যান। ঘটনার ঘনঘটায় মানবিক সম্পর্ক ইতিহাসের গভীরে দাগ কাটে না, গোয়ালিয়রের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোধহয় তা মনে হবে না। বহু যুগ পেরিয়ে এলেও গোয়ালিয়র আজও মানসিংহ ও মৃগনয়নার যুগল প্রেমের পরিচয় বহন করছে। প্রাসাদ, মন্দির, মহলের পর মহল, চিত্রশালা, সঙ্গীতভবন সর্বত্র শুধু যুগলের উপস্থিতি, তাঁদের ঘিরে অজস্র কিংবদন্তি। সেই কিংবদন্তি বলে, কে মৃগনয়না? ওর আসল নাম তো নিন্নি।

মানসিংহ তোমরের সঙ্গে নিন্নির প্রথম দেখা হওয়াটা গল্পের মতোই। মানসিংহ যখন গোয়ালিয়রের রাজা তখনও পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়নি। তোমর বংশীয় রাজপুত বীর যতদিন গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আসীন ছিলেন কোন বিদেশি আক্রমণের আঁচ তার গায়ে লাগেনি। বাহলোল লোদি পাঁচবার আক্রমণ করেও মানসিংহের রাজ্য থেকে একফালি মাটি কখনও কেড়ে নিতে পারেননি। সম্মুখ যুদ্ধে না হোক কূটকৌশলে মানসিংহ প্রতিবারই তাঁকে হারিয়েছিলেন। বাহলোলের পরে সিংহাসনে বসেন সিকন্দর লোদি, তিনি মানসিংহকে জব্দ করার জন্য একটি নগর পত্তন করেন (১৫০৫)। সেই নগরটি হল আগ্রা। মানসিংহের তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৭ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সিকন্দর শুধু নরবরের দুর্গ ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। নরবর আসলে ছিল কাছোরার বংশীয় রাজসিংহের দুর্গ। মানসিংহ সেটা দখল করেছিলেন একসময়ে। এই সদা সতর্ক যোদ্ধা রাজার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল নিন্নির।

সাক নদীর তীরে ছোট রাই গ্রামে বাস করতেন গুর্জরীরা। প্রধানত শিকারজীবী এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর ঘরের মেয়ে নিন্নি। একসময়ে ভারতের বাইরে থেকে এলেও কয়েক পুরুষে গুর্জররা আর্যদের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে। একই সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব একটি সাধনা ও সমাজধারাও ছিল। বিশেষ করে শিল্প ও সঙ্গীতে তাঁদের ছিল অসামান্য উত্তরাধিকার। দৈনন্দিন জীবনকে তাঁরা ভরে রাখতেন হাস্যে, লাস্যে, নৃত্যে, সঙ্গীতে। গুর্জরীরাগ গুর্জরীদেরই জাতীয় সুরের শুদ্ধিকৃত রূপ। সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে আসবার সময় এই সুর এসেছিল যাযাবর গুর্জরদের কণ্ঠে ভর দিয়ে। পরে ভারতীয় সঙ্গীতভাণ্ডারের

সঙ্গে মিশে যায় ও নতুন রূপ লাভ করে। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। সাক নদীর ধারে বনে জঙ্গলে যে নিন্নি কাঠ কুড়িয়ে আনতেন, তীর ধনুক নিয়ে শিকার করে আনতেন। তিনি জানতেন না রাগ-রাগিণীর রূপতত্ত্ব। শুধু তাঁর কণ্ঠে সাতটি সুর সাতটি পোষা পাখির মতই খেলা করত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মেয়েটিকে গ্রামের সবাই ভালোবাসতেন। তিনি যোগ না দিলে সব উৎসবই ম্লান হয়ে যেত। মধ্যভারতের বীরগাথা রাসোতে অবশ্য নিন্নির সখী লাখির কথাও আছে। দুই সখী গলাগলি ঘুরে বেড়াতেন নির্ভয়ে। লাখি মন দিয়েছিলেন নিন্নির দাদা অটল সিংহকে। রূপসী নিন্নির মন বাঁধা পড়েনি কোথাও। এমনই কোন এক দিনের কথা।

মানসিংহ বেরিয়েছিলেন গোয়ালিয়র থেকে। মাত্র আঠের মাইল পথ তাঁর শিক্ষিত ঘোড়া পেরিয়ে গেল সহজেই। সাখ নদীর ধারে, বনের মধ্যে পৌঁছেই রাজা চমকে উঠলেন, ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। বনের মধ্যে নিন্নি তীর ধনুক নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে শিকারকে ধাওয়া করে এগিয়ে চলেছেন। মানসিংহ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর নিন্নি সুকৌশলে শিকারকে পরাস্ত করে যখন ঘুরে দাঁড়ালেন, মানসিংহের মুগ্ধ চোখে তখন শুধুই বিস্ময়। কে এই রূপসী? তন্বী, শ্যামা, সুকেশী, সুস্তনী যেন মূর্তিমতী গুর্জরী রাগিণী। তাঁর অন্তঃপুরে দু'শ জন রানি রয়েছেন, প্রধানা রানি আটজন, সকলেই সদ্বংশজাতা অতি সুন্দরী। কিন্তু এমন মেয়ে তো তিনি আগে কখনও দেখেননি। মেয়েটির পোশাক অতি সাধারণ রঙচঙে ঘাঘরা ও কাঁচুলি, হাতে পায়ে সামান্য রুপোর গয়না। কালভুজঙ্গিনীর মতো দীর্ঘ বেণীটি রুক্ষ, চূর্ণ কুন্তলগুলি ঘামে ভিজে কপালে, গালে, পিঠে লেপটে আছে। একটা ছোট টিপ ছাড়া মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই তবু মানসিংহ সেই অনন্ত যৌবনা মেয়েটিকে পলক না ফেলে দেখলেন। পরক্ষণেই বললেন, 'শাবাশ, তোমার হাতের টিপ অসাধারণ।'

নিন্নির ভ্রূদুটো ধনুকের মতো বেঁকল। সন্দেহ চোখের পাতায়। কে এই সুদর্শন পুরুষ? যে-ই হোক, তিনি অত সহজে ভয় পান না। কিছু বলার আগেই শুনলেন রূপবান মানুষটি গভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'তোমাকে দেখেই আহত হয়েছি গুজরী, দৃষ্টি বাণে আর বিঁধো না। রাজহত্যার পাপ হবে।'

রাজা! চমকে উঠলেন নিন্নি। হাতের শিকার মাটিতে রেখে খাটো ওড়না একটু টেনেটুনে চেহারায় সভ্য ভব্য ভাব আনবার চেষ্টা করেন নিন্নি। বন্য হরিণীর টানা টানা চোখে লজ্জার মায়াকাজল নেমেছে। রাজার মনে হল, তাঁর রাওলায় যে সৌন্দর্য বন্দি হয়ে নেই, সেই সৌন্দর্য উপচে পড়ছে এই গুর্জরী মেয়েটির সর্বাঙ্গে। প্রচলিত ধারার রূপসী হয়ত নয়, কিন্তু ঘন অরণ্যের মতো নিবিড় চুল আর হরিণীর মতো কাজলটানা দুটি কালো গহিন চোখ ইতিপূর্বে দেখেছেন বলে মনে হয় না। এক অনাস্বাদিত পুলকে তাঁর মন ভরে উঠল।

মেয়েটি ততক্ষণে মাথা নিচু করে বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছে, 'আমার নাম নিন্নি। এই নদীর ধারে রাই গ্রামে আমার বাড়ি।'

'বাড়িতে তোমার কে কে আছে?'

'আমার বাবা-মা নেই। পুরোহিতজী আমাদের মানুষ করেছেন।'

'তোমাদের মানে?'

'আমাকে আর আমার দাদা অটল সিংহকে।'

মানসিংহ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। নিন্নি যদি অন্য কারোর হত, তাঁর বুক ফেটে যেত। বলেই ফেললেন সে কথা, 'তোমাকে দেখেই আমি নিজেকে হারিয়েছি। নিন্নি তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

নিন্নি উত্তর দিতে পারেন না। এমনিতে তো কাউকে তাঁর মনেই ধরে না। তবে সেদিন এক যাযাবরী হাত দেখে বলেছিল বটে, নিন্নি রানি হবে। কিন্তু সত্যিকারের কোন রাজা বিশেষ করে এত রূপবান যুবক রাজা যে তাঁকে বিয়ে করতে চাইবেন, নিন্নি তা স্বপ্নেও ভাবেননি। মনের খুশি চেপে মুখে ছদ্ম রাগ ফুটিয়ে শিকারটি হাতে তুলে নিয়ে নিন্নি বলেন, 'আমি কি বলব? পুরোহিতজী আছেন...দাদা আছেন...'

মানসিংহ ইঙ্গিত বুঝে হেসে ফেললেন, 'যাব তোমাদের গ্রামে পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা করতে।'

ফিরে যেতে যেতে নিন্নি বারবার ফিরে চাইলেন। যতদূর গেলেন দেখলেন রাজা একভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। মনটি যেন নিজের কাছে নেই। সেই মুহূর্তে নিন্নিও ভালোবাসলেন তাঁকে। লাখি শুধু জানলেন, তাঁর সখী বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে মন হারিয়ে এসেছেন। আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর মন। রাজা শেষকালে ভুলে যাবেন না তো? নিন্নি আগের মতোই। কখনও বল্লম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বরাহ শিকার করতে ছোটেন, কখনও দুরন্ত উল্লাসে ঝাঁপ দেন সাক নদীর বুকে।

কদিন পরেই মানসিংহ এলেন রাই গ্রামে। রাজা আসছেন খবর পেয়ে গ্রামের সবাই জড় হলেন মন্দিরের সামনে। সেখানেই রাজা থামবেন। গ্রামের লোকের আনন্দ ধরে না। রাজার ব্যাকুল চোখ দুটি অবাধ্য হয়ে খুঁজে বেড়ায় নিন্নিকে। পুরোহিতজী যেন বুঝতে পারেন। তাঁর শকুন্তলার জন্যে দুষ্মন্ত এসেছেন রাই গ্রামে। রাজরানির মতো রূপ নিন্নির। পালিতা কন্যাকে ডাকলেন তিনি। রাজার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন্নি হচ্ছে গ্রামের সেরা মেয়ে। ওর হাতে তীর ধনুক থাকলে শিকার হার মানবেই।'

মানসিংহ জানেন সেকথা। শুধু হাতের তীর ধনুক কেন, নয়ন বাণেও নিন্নি বধ করেছেন তাঁকে। সেজন্যই তো এখানে আসা। সে কথা না বলে বললেন, 'তাই নাকি? আমি সেই শিকার দেখবার সুযোগ পাব কি?

হই হই করে উঠল গ্রামবাসীরা। নিশ্চয়, নিশ্চয়। নিন্নি তো প্রতিদিনই শিকারে যায়। একটি তীর আর ধনুক নিয়ে নিন্নি বেরোলেন শিকারে। অনেক পরে পড়লেন এক বুনো মোষের সামনে। সেদিন তাঁর কপাল মন্দ কিংবা মন চঞ্চল থাকায় তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। মহিষ এল তেড়ে। মুহূর্তের মধ্যে নিন্নির চোখের সামনে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া উঁকি মেরে গেল। তারপরই তিনি ধেয়ে আসা মহিষের শিং ধরে বনবিড়ালীর মতো ঝুলে পড়লেন। উভয়ের মরণপণ যুদ্ধ শেষ হল মানসিংহের হস্তক্ষেপে। নিন্নিকে বাঁচালেন তিনি। দেখলেন নারীর নতুন রূপ। বীর্যবতী নারীর জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রমোদক্লান্ত পুরুষের মন। নিজের গলা থেকে মোতির মালা খুলে নিয়ে সবার সামনে

তুলে দিলেন নিন্নির হাতে। বললেন, 'আশা করি পুরোহিতজী একদিন এই মালা পরিয়ে দেবার অনুমতি আমাকে দেবেন।'

রাই গ্রামের মানুষরা খুশি হল। এত বড় রাজা যদি তাদের মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতেন, তারা কীই বা করত?

পুরোহিতজী সস্নেহে বললেন, 'বল নিন্নি তোর মনের কথা? মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি আছে তোর?'

গুর্জরী সমাজে মেয়েরা স্বাধীন, নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা নিজেরাই বলে। রাজপুতানী কিংবা উচ্চবর্ণের কন্যাদের মতো অভিভাবকদের পছন্দকে নীরবে মেনে নেয় না। নিন্নি তো মানসিংহকে মন দিয়েছেন সেই প্রথম দেখার দিনটিতেই কিন্তু সে কথা সবার সামনে স্বীকার করা যায় না কি? পুরোহিতজীর কথায় নিন্নি বললেন, 'মহারাজ যদি আমার শর্তে রাজি হন তবেই আমি সম্মতি দেব।'

'কি শর্ত?' শঙ্কিত হলেন পুরোহিতজী।

প্রশ্ন রাজার মনেও। এই গ্রাম্য কিশোরী কি মৎস্যগন্ধার মতো তাঁকে দিয়ে কোন কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চায়? কিংবা পেতে চায় পাটরানির আসনটি।

নিন্নি এসবের ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'আমার বিয়ে এই রাই গ্রামেই হবে। মহারাজকে আসতে হবে বর সেজে।'

দরিদ্র রাই গ্রামের অধিবাসীরা প্রমাদ গণেন। নিন্নি কি জানেন না, রাজপুত রাজাদের বিয়েতে কনেই আসেন বরের বাড়ি। এদেশে সেটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে।

মানসিংহ অবশ্য হেসে ওঠেন, 'এই কথা। বেশ তাই হবে। আসব বরের বেশে। বিয়ে করে নিয়ে যাব রাই গ্রামের মেয়েকে।'

প্রজারা খুশিতে ধন্য ধন্য করে উঠল। তাদের আদরের মেয়েটি গ্রামের নাম রেখেছে। রাজা যদি জোর করে নিন্নিকে আজই নিয়ে যেতে চাইতেন, তাদের সাধ্য ছিল কি তাঁকে বাধা দেবার?

ফিরে গেলেন মানসিংহ। মন্ত্রী, পাত্র-মিত্রদের ডেকে বললেন, 'গোয়ালিয়র থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে যেতে হবে রাই গ্রামে। আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন।'

সবাই অবাক। মন্ত্রী বললেন, 'সে কি মহারাজ? সুরক্ষিত রাজধানী ছেড়ে সীমান্তের একটি গ্রামে .. '

মানসিংহ হেসে বললেন, 'সাতদিনের জন্য।'

রাজার হাসি দেখে মন্ত্রী বুঝলেন কিছু। তিনিও হাসলেন, 'কেন মহারাজ?'

রাজাও রহস্যময় হাসলেন, 'রাই গ্রামের রাজকন্যের হুকুম।'

অন্য কারোর হুকুম মানবার পাত্র নন মানসিংহ। কিন্তু প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে। সামান্য এক নারীর সামান্য ইচ্ছাপূরণের জন্য মানসিংহ রাজধানী তুলে আনলেন রাই গ্রামে। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিলেন অখ্যাত গ্রামখানিকে, চিরকালের মতো।

নিন্নিকে সাজাল সখীরা, গান গেয়ে গেয়ে। গান তো গুর্জরীদের জীবনের অঙ্গ। রাই গ্রামে আনন্দের ঢেউ। পুরোহিতজী নিন্নির কপোতির মতো কোমল হাতখানি তুলে দিলেন মানসিংহের হাতে। আর নিন্নি দুরন্ত গ্রাম্য কিশোরী নন, গোয়ালিয়রের রাজবধূ।

তাঁর নতুন নাম হল। হয়ত রাজাই রাখলেন সে নাম, নিন্নি রূপের সঙ্গে মিলিয়ে, মৃগনয়না মতান্তরে মৃগনয়নী। সেই নামের আড়ালে চিরকালের মতো হারিয়ে গেল নিন্নির আসল নামটি।

রাজা মানসিংহ পেলেন তাঁর প্রিয়তমাকে, মৃগনয়না পেলেন তাঁর প্রেমাস্পদকে। দুজনেরই মনে হল, এই পরম প্রাপ্তির পরে আর কিছুই চাওয়ার নেই। তাঁরা প্রতিদিন প্রেমকে আবিষ্কার করতেন নব নব রূপে। ফিরে এলেন গোয়ালিয়রে। হয়ত রাই গ্রাম ছাড়বার সময়ই অটল সিংয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নরবর দুর্গের ভার। গ্রামের সবাই চোখের জল মুছে সৌভাগ্যবতী মেয়েকে বললেন, 'আমাদের ভুলে যেও না।'

প্রকৃতির কোলে বড় হয়ে মৃগনয়না এসে পড়লেন রাজপুত রাওলায়। বনের পাখি এলেন খাঁচায় পাখি হয়ে। গোয়ালিয়র রাজ অন্তঃপুরে পর্দাপ্রথা ছিল। রাজা জানতেন, মৃগনয়না চার দেয়ালের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকতে পারবেন না। তাই বললেন, 'এখানকার রাওলার নিয়ম তোমায় মেনে চলতে হবে না। তোমার যেমন খুশি তেমনই থেকো।'

'তাহলে কথা দাও, আমার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। আমাদের মনে কোন আড়াল থাকবে না।'

মানসিংহ চমৎকৃত হন, 'আর কেউ তো এমন কথা বলেনি। তুমি কোথা থেকে শিখলে?'

'মনের কথা মুখে বলছি। এ তো শেখানো বুলি নয় মহারাজ।'

'ঠিক। তুমি শিক্ষা পেয়েছ প্রকৃতির কাছে। জীবনের কাছে। তোমার সঙ্গে কার তুলনা।'

অন্তঃপুরের রানিরা কিন্তু মৃগনয়নাকে এত সহজে মেনে নিতে পারলেন না, যদিও রাজার রাওলায় দুশো রানি, তাঁদের মধ্যে আটজন প্রধান মহিষী। নতুন আর একজন রানিকে নিয়ে তাঁদের এত ভাবনা-চিন্তা করার দরকার ছিল না। তবু মৃগনয়নাকে নিয়ে সকলেই মুখর হলেন। রানিরা সকলেই এসেছেন কোন না কোন রাজপরিবার থেকে। তাঁরা সামান্যা এক গুজরী মেয়েকে নিজের সমপর্যায়ভুক্ত করতে নারাজ। সকলেরই চোখে অবজ্ঞা, মুখে ছি ছি। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন মানসিংহের তৃতীয় রানি। তিনি রূপসী এবং মানসিংহের প্রিয় পত্নী বলেই বোধহয় নতুন রানিকে অপমান করার তীব্র আকাঙক্ষা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মৃগনয়না অবশ্য কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন না। দমেও গেলেন না। মেয়েমহলের ষড়যন্ত্রে কানও দিলেন না। রাজার ভালোবাসায় নিজেকে শুধু উজাড় করে দিলেন তাও নয়। তিনি মহারাজার শিল্পরুচির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব কল্পনাকে।

রাজপ্রাসাদে আসবার সময় মৃগনয়না এনেছিলেন গুর্জরী রাগিণীর ঐশ্বর্য। সঙ্গীতরসিক রাজা সে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'তোমার গান শোনাব আমার সভাগায়ক বৈজনাথ নায়েককে। মস্ত বড় সুরসাধক।'

মৃগনয়না বলেন, 'আমার গান শুধু তোমার জন্য। আমি তো ওঁদের মতো সঙ্গীতসাধনা করিনি।'

মানসিংহ শুনলেন না। বললেন, 'তোমার গান তাঁকে হয়ত নতুন রাগ-রাগিণীর সন্ধান দেবে।'

তাঁর অনুমানই সত্য হল। মৃগনয়নার কণ্ঠ, মৃগনয়নার গান প্রেরণা জাগায় বৈজনাথকে। আমরা তাঁকে চিনি বৈজু বাওরা নামে। বৈজনাথ দেখলেন, মূর্তিমতী সঙ্গীতকে। তাঁর কণ্ঠে টোরি নতুন রূপ লাভ করল গুর্জরী টোরি রাগিণীর মধ্যে। গুর্জরী রাগে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। বৈজনাথ মঙ্গল ও কৌশিকী কানাড়াকেও বাঁধলেন মৃগনয়নার নামে। অন্দরমহলে কানাকানি হয় : ষড়যন্ত্র হয়। গুজরী রানি স্বেচ্ছাচারিণী। পরদা মানেন না। রাজার প্রেয়সী আবার গায়কের প্রেরণদাত্রী হতে পারে না কি? সবই ছলাকলা। গুজরীরা যাযাবর। বশীকরণ বিদ্যা জানে। রাজাকে বশ করে গায়কের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ নিচ্ছে। মৃগনয়না সব শোনেন, কান দেন না। সভাগায়কের কণ্ঠে নতুন সুর শোনেন সাগ্রহে, কখনও তাঁকে গেয়ে শোনান তাঁদের পুরুষানুক্রমিকভাবে পাওয়া গুর্জরী রাগিণীর অপ্রচলিত কোন রূপ। বৈজনাথ আবার সেই সুর ভেঙে গড়ে সৃষ্টি করেন নতুন রাগ। মৃগনয়নী নামে একটি স্বতন্ত্র রাগের খোঁজ পাওয়া যায়, মারবা ঠাটের অন্তর্গত এই রাগ রাত্রি চতুর্থ প্রহরের বক্রগতির মিশ্ররাগ। শুধু কি বৈজনাথ? আশ্চর্য বালক তানসেনের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কর্ত্রীও তো মৃগনয়না। জনশ্রুতি মাত্র দশ বছর বয়সে তানসেন এসেছিলেন গোয়ালিয়রে। তাঁর সঠিক জন্মসাল জানা যায় না, প্রচলিত তারিখ ১৫০৬ সাল। মানসিংহের রাজত্বকালের একেবারে শেষ এসেছিলেন তিনি। গোয়ালিয়র রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি ধ্রুপদী আঙ্গিকে মৃগনয়নার বন্দনাগান রচনা করে শুনিয়ে সকলের প্রশংসালাভ করেছিলেন।

সঙ্গীতের সঙ্গে স্থাপত্যে অসাধারণ আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন মানসিংহ। স্থানীয় মানুষেরা যদিও বলেন, মহারাজ ছিলেন বড় যোদ্ধা তাঁকে শিল্পী করেছিলেন মৃগনয়না। আসলে মানসিংহ ভেবে পাচ্ছিলেন না, কিভাবে মৃগনয়নাকে সুখী করবেন। সেজন্য তিনি গোয়ালিয়রকে সাজিয়ে তুলেছিলেন প্রাসাদ, মন্দির, উদ্যানে। নতুন নতুন উপহার দিয়ে মৃগনয়নাকে সুখী করতে চেয়েছিলেন তিনি। খুশি হয়ে মৃগনয়না রাজাকে পরামর্শ দেন কিভাবে পাথরে ফুটে উঠবে প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ। ভাস্কর্য হয়ে উঠবে কবিতা। তৈরি হল একটি অপরূপ মহল। রানি মৃগনয়নার জন্য। নাম হল গুজরীমহল। পাথর ভালোবাসেন মৃগনয়না, পাথরের কারুকাজ তাই সর্বত্র। রাজা সেই মহলের সামনে নিয়ে এলেন তাঁর প্রিয়তমা রানিকে। বললেন, 'আজ থেকে এই মহল তোমার।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। এই মহল আমি তোমার জন্য তৈরি করেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে কি?'

'অনবদ্য। কিন্তু আমার জন্য এত কেন? আমি তো আমার নিজের জন্য কিছু চাইনি।'

'তুমি চাও না বলেই তো আমি বুকতে পারি না তুমি কি চাও।'

'আমার তো কিছু চাইবার নেই মহারাজ। তোমায় পেয়ে আমি সব কিছু পেয়েছি।' হেসে হেসে বলেন মৃগনয়না। তারপর গুজরিমহলের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে

বলেন, 'ইস, এখানে যদি সাক নদী বইত তাহলে কি ভালোই না হত। আমি সেই জলে স্নান করতে পারতাম।'

মানসিংহ বললেন, 'তাই হবে।'

মৃগনয়নার একটা সাধের কথা অন্তত জানা গিয়েছে। দীর্ঘ আঠারো মাইল পাথুরে পথ কেটে রাই গ্রামের পাশ থেকে সাক নদীকে গোয়ালিয়রে নিয়ে এলেন রাজা। গুজরীমহলের পাশে। মৃগনয়নাকে গুজরীমহলে তুলে এনে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন মানসিংহ। ইতিমধ্যে মৃগনয়না দুটি পুত্র উপহার দিয়েছেন রাজকে। একজনের নাম রাজসিংহ, অপরজনের নাম বলসিংহ। তাতে বড়রানির মনের শান্তি আর রাতের ঘুম গেল ঘুচে। তাঁর খুব ভয় মৃগনয়নাকে। রাজা তাঁর কথায় ওঠেন বসেন। নিজের ছেলেদের জন্যে সিংহাসনটি নিশ্চয় দাবি করবেন মৃগনয়না। বড় রানির ছেলে বিক্রমাদিত্য কি আর পিতার সিংহাসনে বসতে পারবে? কাজেই তিনি ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। প্রথমে রাজার কাছে মৃগনয়নাকে অবিশ্বাসিনী প্রমাণ করার ও তারপরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার। রাজা সেই ষড়যন্ত্রে আভাস পেয়েই নতুন মহলে মৃগনয়নাকে সরিয়ে আনলেন।

মৃগনয়না বললেন, 'মহারাজ, মন্দির না হলে নগর মানায় না। কয়েকটা মন্দির তৈরি করতে হবে।'

'তুমি যেমনটি বলবে তেমনই হবে।'

একে একে তৈরি হল সহস্রবাহুর মন্দির, ত্রৈলোক্য মন্দির। অপূর্ব সুন্দর। গোয়ালিয়রের প্রতিটি স্থাপত্যে যেন মৃগনয়নার কোমল স্পর্শ লেগে রয়েছে। ইতিহাসও স্বীকার করে, মানসিংহ তাঁর রাজধানী গোয়ালিয়রকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন প্রিয়তমা রানি মৃগনয়নাকে পাশে নিয়ে। তৈরি হল মানমন্দির, চিত্রশালা, সঙ্গীতমহল। একা রাজা বা রানির অস্তিত্ব নেই, সর্বত্র তাঁরা দুজনে একত্রে, একসঙ্গে। যুগল প্রেমের স্রোতে ভাসতে লাগল গোয়ালিয়র।

অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র অব্যাহত চলতে থাকে। মানমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মৃগনয়নাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা হয়। পানের মধ্যে সেঁকো বিষ দিয়ে। আগেই খবর পেয়েছিলেন মৃগনয়না, তাই পান মুখে দিতে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। খবরটা পৌঁছলো মানসিংহের কানে। বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন, মৃগনয়না একবারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন না তাঁকে। কেন? তবে কি তিনি সন্দেহ করেন রাজাকেও? মানসিংহ এলেন গুজরীমহলে। বললেন, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি মৃগনয়না, সকলের হয়ে।'

'কেন মহারাজ?' দুটি উদাস চোখ তুলে তাকান মানসিংহের গুজরী রানি, 'আমি তো আপনার কাছে কোন অভিযোগ জানাইনি।'

'সে তোমার মহত্ত্ব। আমি জেনেছি অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রে তোমার প্রাণসংশয় হয়েছিল। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ। ক্ষমা করো তুমি ওদের।'

মৃগনয়না হাসেন। কোন উত্তর দেন না, অভিযোগও করেন না। কৌতূহলও প্রকাশ করেন না। বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসেন মানসিংহ। ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। তবে এবার

আর বড় রানি বিষ প্রয়োগ করে মৃগনয়নাকে হত্যা করার কথা ভাবেন না, মহারাজকে আরজি জানালেন, 'উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা কর।'

'কি বলতে চাও?' রাজা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

'সব মানুষই বয়স হলে উত্তরাধিকারীর কথা ভাবে। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, কিন্তু তোমার পরে যে তোমার রাজ্য শাসন করতে পারবে তার নাম ঘোষণা করতে ক্ষতি কি?'

বিরক্ত হয়ে রাজা মানসিংহ বললেন, 'আমার রাজ্য শাসন করতে পারে শুধু মৃগনয়না।'

উত্তরটা এত প্রাঞ্জল যে বড়রানি পর্যন্ত আর একটা কথা বলতে পারেন না।

খবরটা মৃগনয়নার কাছেও এল। তিনি রাজাকে নিজের মহলে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজা এলে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'রাজ্যসুদ্ধু লোক কত কি বলছে। সত্যিই কি এসব তোমার নিজের কথা।'

'সব কথাই সত্যি। যা শুনেছ, আমি তা-ই বলেছি।'

'কি বলছ তুমি? আমি শুধু তোমার কল্পনার রূপকার মহারাজ। রাজ্যশাসনের আমি কি জানি? তোমার স্বপ্নই গোয়ালিয়র রাজ্যকে সুন্দর করেছে।'

'সবই হয়েছে তোমার জন্য।' মানসিংহ হেসে বলেন, 'আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছ তুমি। আমার স্বপ্নকে সাকার করেছ তুমি।'

'তুমি বীর।'

'আমি যোদ্ধা। পাথরের বুকে কবিতা লেখা সম্ভব হত না কোনদিন, তুমি যদি না আমার পাশে থাকতে।'

'শুধু এইটুকুই চাই মহারাজ।'

'আরও অনেক বেশি যোগ্যতা তোমার আছে।'

হঠাৎ ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো মৃগনয়না বলে উঠলেন, 'যার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, সে কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি। মহারাজ, চল আমার চিত্রশালায়।'

'নিশ্চয় যাব। তুমি যখন চিত্রশালায় নিয়ে যেতে চাইছ তখন নিশ্চয় কোন দুর্লভ চিত্র দেখতে পাব।'

'সেটা আগে বলব না।'

রাজাকে নিয়ে মৃগনয়না এলেন গুর্জরীমহল সংলগ্ন চিত্রশালায়। ছবি দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেকটা সময়। মানসিংহ মুখে যাই বলুন না কেন, প্রকৃত শিল্পরসিক তিনিও। এক সময়ে রাজার হাতে রানি তুলে দেন একটি তুলট কাগজের চিঠি। গোল করে পাকানো। রাজা ভাবলেন, কোন নতুন ছবি। খুলে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হল না, আবার পড়লেন। চিঠিখানি লিখেছেন তাঁর গুর্জরী রানি মৃগনয়না নিজের হাতে। তিনি লিখেছেন,

> চিরকালের প্রথা আমার জন্য বদলাতে পারে না। গোয়ালিয়রের মহারাজার অভিলাষ যাই হোক, আমার সিদ্ধান্ত, আমার পুত্র রাজসিংহ বা বলসিংহ কোনদিন

গোয়ালিয়র রাজ্যের সিংহাসনে বসবার অধিকারী হবে না। সে অধিকার একমাত্র মহারাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠা মহিষীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমাদিত্যের।'

মানসিংহ চিঠিখানি বারবার পড়ে তাকালেন মৃগনয়নার দিকে। সে দৃষ্টিতে শুধু বিস্ময় আর প্রেম নয় মিশে রইল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এই আশ্চর্য নারী কি করে জানল, ভিতরে ভিতরে তিনি ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন ভাবনা ও চিন্তায়। একদিকে চিরকালের নিয়মের অপমান করা, অন্যদিকে বড়-রানির ষড়যন্ত্র, নিরপরাধ বিক্রমকে পিতার সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে তাঁর মন সায় দেয়নি অথচ মৃগনয়নাকে সুখী করতেও চাইছিলেন। যদিও মৃগনয়না নিজের ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন কথাই তাঁকে বলেননি। প্রশ্ন করলেন, 'সত্যই কি এই তোমার মনের কথা?'

মৃগনয়না বললেন, 'হ্যাঁ। এর প্রতিলিপি এতক্ষণে বড়রানিও পেয়ে গিয়েছেন।'

'কেন? তোমার সাজানো রাজ্যপাটে নিজের ছেলেকে বসাতে চাও না?'

'আমি যা কিছু করেছি মহারাজ, তোমাকে ভালোবেসে করেছি। তোমার কল্পনাকে সাধ্যমত রূপ দিয়েছি। আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ গড়বার জন্যে নয়।'

'আমিও তো তোমায় ভালোবেসেই ...'

'মহারাজ, আমি তোমাকে সবরকম চিন্তা, পারিবারিক ষড়যন্ত্র, এবং সব ধরনের অন্যায় কর্ম থেকেও মুক্ত রাখতে চাই। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে।'

মানসিংহ দুহাতে মৃগনয়নাকে বুকে টেনে নিলেন।

কেউ কেউ বলেন, মৃগনয়না তাঁর ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজের সমাজে। তারপর নিজেও চলে গিয়েছিলেন রাজ্যসুদ্ধ সকলকে কাঁদিয়ে। তবে এই স্বেচ্ছানির্বাসন নিশ্চয় মানসিংহের মৃত্যুর আগে নয়। পার্থিব জীবনে কেউ তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। মধ্যভারতের কবিরা ভুলতে পারেননি সেসব দিনের কথা। মনে রেখেছেন শুধু সেই আশ্চর্য রানিকে। আজও শুধু সাক নদী নয় গোয়ালিয়র দুর্গও রাজা মানসিংহ ও মৃগনয়নার প্রেমের গল্প শোনায়।

কৃষ্ণদেবরায় ও চিন্নাদেবী

একজন জীবন কাটিয়েছিলেন সবার চোখের সামনে, অপরজনকে ভালোবাসার মাশুল যোগাতে জীবন কাটাতে হল সবার চোখের আড়ালে। এমন বিপরীত ঘটেছিল বিজয়নগরে। ইতিহাসে কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, তাঁর মতো ভালো শাসক বিজয়নগরের দুশো বছরের ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সামান্য নর্তকী চিন্নার তো ইতিহাসে স্থান পাওয়ার কথাই নয় স্বাভাবিক নিয়মে। তবু পরস্পরের প্রগাঢ় প্রেম রাজতন্ত্রের কঠোর নিয়ম-কানুনের আড়ালে, নিজস্ব নিয়ম পূর্ণতা লাভ করেছিল। সনাতন ভারতীয় রীতি মেনে যে বংশপঞ্জী বা রাজকাহিনী লেখা হয়েছিল তাতে কোথাও চিন্নার নাম নেই বরং মুছে ফেলার চেষ্টা ছিল প্রথম থেকেই। প্রেম কি কখনও হারায়? কিংবদন্তি থেকেই যায়। বিজয়নগরের পর্যটকেরা শুনেছিলেন চিন্নাদেবীর কথা। কৌতূহলে কলমবন্দী করেছিলেন কিছু কিছু চিত্র। আজও যা হাম্পির ধ্বংসস্তূপের আড়ালে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।

বিজয়নগরে তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, সঙ্গম সালুম ও তুলুভ। কি করে যে এক বংশের হাত থেকে রাজ্য আর এক বংশের হাতে গেল তার অনুপুঙ্খ বিবরণের বড়ই অভাব। যুদ্ধ না হোক, সিংহাসনের হাতবদলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, শিশুহত্যা লেগেই থাকত। শিশুর অভিভাবক হিসাবে যিনি এলেন, শিশুর অপমৃত্যুতে তিনিই রাজা হয়ে বসলেন এ ঘটনা দুর্লভ নয়। রাজকীয় প্রথাতেও ছিল অভিনবত্ব। রাজা মাত্রেই বহু রানি। প্রথম বা প্রধান তিন রানির সন্তানেরা সিংহাসনে বসবার অধিকারী হতেন। তাঁদের তিনজনের পুত্র না থাকলে অন্য রানিদের পুত্র রাজা হতে পারত। অনেক সময় দেখা গিয়েছে রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র এবং রাজভ্রাতা সিংহাসনের সমান দাবিদার। বুঝতে অসুবিধে হয় না, রাজবাড়িতে শিশুদের জীবন কাটত অনিশ্চয়তার মধ্যে। এমনই পরিবেশে কৃষ্ণরায় বড় হয়েছিলেন। কোনদিনই তিনি সিংহাসনে বসার কথা ভাবতেন বলে শোনা যায়নি। রাজা হয়েছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় দাদা বীর নরসিংহ। তিনি আবার শেষ সালুভ রাজা ইমদাদি নরসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই রাজা হন ১৫০৫ সালে। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বাসবরায়। রায় বোধহয় রাজা থেকে এসেছে।

নবযুবক কৃষ্ণরায়ের চোখে তখন অন্য স্বপ্ন। রাজার ছেলে না হলেও তাঁর পিতা ধনী সামন্ত ছিলেন। সেখানেও রাজবংশের মতোই নিয়ম-কানুন। বৈমাত্রেয় দাদার সঙ্গে

দূরত্ব বজায় রেখেই বড় হয়েছেন। যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। ঠিক করেছেন সৈন্যদলে যোগ দেবেন। তাই অবসর সময়ে ঘোড়ায় চড়ে নানাদিকে ঘুরে বেড়াতেই তাঁর ভাল লাগে, নগর-দুর্গ এবং চারপাশটা নিজের হাতে রেখার মতোই চেনা হয়ে যায়। এমনই একটা দিন, প্রতিদিনের সঙ্গে আলাদা করে দেখা যায় না হয়ত, কৃষ্ণরায় যাচ্ছিলেন কোদণ্ডরামের মন্দিরের দিকে, সুলাইবাজারের মাঝখানে সোজা সিঁথির মতো বাঁধানো পথ। দুধারে সার সার পাথরের ঘর। নগরের সেরা নর্তকীদের বাস এখানে। প্রত্যেকের এক একটি ঘর দেখা যাচ্ছে, পিছনে আরও ঘর-বাড়ির আভাস। সম্পন্নাদের প্রচুর সম্পত্তি আছে। বিজয়নগরে দেবদাসীদের সঙ্গে নগরটীরাও মন্দিরে উৎসবের দিন নাচে গায়, সামাজিক উৎসবে যোগ দেয়, সবার সঙ্গে কথা বলে এমন কি রানিদের সামনেও রাজার সঙ্গে কথা বলতে পারে। এই রূপসীদের পাড়া দিয়ে যেতে যেতে কৃষ্ণরায়ের কুড়ি বছরের তরতাজা মনটা আনমনা হয়ে ওঠে। ফুলের গন্ধ, অলঙ্কারের রিনিঠিনি, মিষ্টি হাসির ঝলকানির মধ্যে তিনি হঠাৎ শুনলেন দুটি মধুর কণ্ঠের রসালাপ, 'ওই যুবকটি কে বল তো?' কৃষ্ণরায় চমকে তাকালেন মেয়েটির দিকে। মনে হল, এত রূপ তিনি আগে কখনও দেখেননি। অথচ তিনি প্রচুর রূপসী দেখেছেন, বিজয়নগরে নারীরা অসূর্যম্পশ্যা অবগুণ্ঠনবতী নন, দেবদাসীরা তো স্বর্গের পারিজাত। তবু সদ্য তরুণী এই মেয়েটি যেন একেবারে অন্যরকম। পাকা সোনার মতো রং, টানা টানা দুটি চোখ, কালভুজঙ্গের মতো দীর্ঘ বেণী, তাতেই ফুল সাজ পরাচ্ছে তার সখী বা সমব্যবসায়িনী। সে পরিহাসতরল কণ্ঠে বলল, 'কার কথা বলছ?'

রূপসী রসে টইটুম্বুর কণ্ঠে উত্তর দিল, 'ওই তো ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। উনি কি রাজা?'

সঙ্গিনী হেসে উঠল, 'দূর রাজা হবেন কেন? রাজার সঙ্গে কত লোক লস্কর থাকে। উনি রাজার ভাই।'

পথে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, বিশেষ করে ঘোড়ায় চেপে। অথচ অদম্য কৌতূহল কৃষ্ণরায়কে টানছিল। মেয়েটিকে তিনি আগে দেখেননি। সব নর্তকীকে তো তিনি চেনেনও না। খুব ইচ্ছে করল, যে মেয়েটি তাঁকে রাজা ভেবেছে তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে। নর্তকীদের সঙ্গে ডেকে কথা বলায় তো কোন বাধা নেই। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি দেবদাসী?'

খিলখিল করে হেসে উঠল তারা। সুলাই বাজারের নর্তকীদের প্রতিপত্তি কম নয়। তারা যেমন কাউকে ভয় পায় না, আলাপেও সমান পটু। রূপসী কৃষ্ণরায়ের চোখে চোখ রেখে হাসল, 'আমার দেবদাসী নই আর্য, আমারা রাজার দাসী।'

'ওরকম কোন পদ বিজয়নগরে আছে বলে তো শুনিনি।'

'রাজপথে দাঁড়িয়েই কি আমাদের আলাপ চলবে? 'মেয়েটি তাঁকে তার ঘরে আহ্বান জানাচ্ছে দেখে কৃষ্ণরায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তীব্র আকর্ষণ বোধ করলেন মেয়েটির প্রতি। নাগরিক বিলাসিতার প্রতি এতদিন তিনি আলাদাভাবে কোন আকর্ষণ বোধ করেননি, তরুণ মনের কৌতূহল অবশ্য ছিল, আজ প্রথম সুলাই বাজারের একটি কক্ষ তাঁকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করল। মনের ভাব মুখে ফুটতে দিলেন না,

আভিজাত্য তাঁর ধমনীতে প্রবহমান। হেসে বললেন, 'আমি তো রাজা নই। তবে তুমি রাজনটী, শুধু রাজনটী কেন, রানি হবার যোগ্য।'

বিস্মিত কৃষ্ণরায় দেখলেন, মেয়েটি তাঁর কথার উত্তর দিতে পারল না। তার সোনা-মুখটি সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে উঠল। জনপদবধূ হবার জন্য সুলাই বাজারে যে পদার্পণ করেছে তার তো এত লজ্জিত হবার কথা নয়। মেয়েটি লজ্জা পেল কেন? তিনি তার রূপের প্রশংসা করেছেন বলে? না, রানির ভূমিকায় সে বেমানান নয়, বলেছেন বলে? সব মেয়েই বোধহয় রানি হতে চায়। করুণা বোধ করলেন কৃষ্ণরায় মেয়েটির জন্য। আহা, ওর সাধ যেন কোনদিন পূর্ণ হয়। তিনি আবার রাশ ছেড়ে দিলেন। ঘোড়া চলল নিজের নিয়মে।

ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেন কৃষ্ণরায়। পম্পাপতির দেউল থেকে হেমকূট পর্যন্ত। সন্ধ্যা নামল। দেউলে দেউলে আরতির ঘণ্টা শুনতে পেলেন তিনি। দেবদাসীরা তালে তালে পা মিলিয়ে .... ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল সেই রূপসী নটীকে। রাজনর্তকী হবার যোগ্যতা মেয়েটির আছে। তার আহ্বান উপেক্ষা করে চলে না এসে তার নাচ দেখাই উচিত ছিল। তার নামটাও জেনে নেওয়া হয়নি। কৃষ্ণরায় ফেরার সময় সুলাই বাজারের পথই ধরলেন। নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে চমকে উঠে দেখলেন, মেয়েটি তার ঘরের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন একটি দীপলক্ষ্মী। এর ঘরে অতিথি আসেনি কেন? অন্যদের ঘরে তো মৃদঙ্গ মন্দিরা ও নূপুরের সম্মিলিত ঝঙ্কার। কৃষ্ণরায়কে দেখে তার চোখদুটি যেন প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই প্রদীপ জ্বলা চোখ তার পেশার অঙ্গীভূত নয়। এ তার একান্ত নিজস্ব। অস্ফুটে সে বলল, 'আমি জানতাম, আপনি ফিরে আসবেন।'

কৃষ্ণরায় অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমি তোমার নামটি জানতে এলাম।'

'আসুন।'

নর্তকীর কক্ষে আলো জ্বলে উঠল। মৃদঙ্গ-মন্দিরা-বাঁশি নিয়ে সখীরা উপস্থিত। বয়সে তরুণ হলেও কৃষ্ণরায় প্রকৃতই শিল্পের মূল্য বোঝেন। নৃত্য গীত খুবই ভালোবাসেন। দেউলে গিয়ে দেখেছেন দেবাদাসীদের নাচ। আজ মেয়েটির নাচ দেখে বুঝতে পারলেন, তাঁরই কোথাও ভুল হয়েছিল। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করলেও এ মেয়ে নৃত্যকলায় পারঙ্গমা। রাজসভায় ইতিমধ্যেই হয়ত নৃত্য প্রদর্শন করেছে। অকপটে প্রশংসা করলেন নৃত্যের। বললেন, 'মদগর্বে আত্মহারা হয়ে আমিই ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি রাজনর্তকী হতে চাও। এখন বুঝেছি, তুমি প্রকৃতই রাজনটী, হয়ত বা নটীশ্রেষ্ঠা। আসলে রাজসভায় আমি কমই যাই। তোমাকে আমি চিরদিন মনে রাখব। এমন সুন্দর নৃত্য আমি কখনও দেখিনি।'

মেয়েটি অত্যন্ত খুশি হল। সে আজ জীবনের সেরা নাচ পরিবেশন করেছে। কৃষ্ণরায় ঝোঁকের মাথায় যাই বলুন না কেন, আসলে সে রাজসভায় নাচেনি, একদিন সেই পদটি পাবে আশা করেই নৃত্যচর্চা শুরু করেছিল। কিন্তু আজ মনে হল, তার কোন প্রয়োজন নেই। প্রণাম জানিয়ে বলল, 'তাহলে প্রভু আবার কবে দেখা হবে?'

'প্রতিদিন আমার তো নাচ দেখতে ভালোই লাগবে কিন্তু তাতে তোমার কি করে

চলবে বল তো?' কৃষ্ণরায় হাসতে হাসতে বললেন, 'এখন নিশ্চয় তোমার ভুল ভেঙেছে, বুঝতে পেরেছো, আমি রাজা নই।'

'না, ভুল আমি করিনি। আপনিই রাজা। আপনাকে দেখে আমার রাজা ছাড়া কিছু মনে হয় না।'

'আমার কিন্তু রাজা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'সে আমি জানি না।' মেয়েটি জোর দিয়ে বলল, 'আমার মন কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আপনি নিশ্চয় কোন একদিন রাজা হবেন।'

'আমি যদি কোনদিন রাজা হই তবে তোমাকে রানি করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাব।' কথার পিঠে কথার মতো হাসতে হাসতে বললেন কৃষ্ণরায়, 'তবে আমার রাজা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। বীর নরসিংহ অপুত্রক নন আর কোন পিতাই চায় না তার সিংহাসনে পুত্রের পরিবর্তে বৈমাত্রেয় ভাই বসুক। অবান্তর কথা ভেবে আমি নিজের সুখ শান্তি হারাতে চাই না।'

'আপনি রাজার উপযুক্ত কথাই বললেন।' মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি দেশের রাজার কথা বলিনি। আমার হৃদয়ের দিকে তাকিয়েই বলেছিলাম। আমার হৃদয় সিংহাসনে আপনিই একমাত্র রাজা।'

'তুমি শুধু নৃত্যপটিয়সী নও, বাকপটিয়সী বললেও কম বলা হবে। এখন তোমার নামটি কি যদি বল, কৃতার্থ হয়ে ফিরতে পারি।'

'বড়সড় একটা নাম এক সময়ে ছিল, কেউ সে নামে কোনদিন আমাকে ডাকে না। সবাই আমাকে বলে চিন্না।'

'এমন সার্থক নাম আগে কখনও শুনিনি।'

চিন্না চোখ নত করলেন। চিন্ন শব্দের অর্থ সুন্দর। চিন্না নিজেও জানেন তিনি অত্যন্ত রূপসী। তবু সে কথাটি কৃষ্ণরায়ের মুখে শুনে যত ভালো লাগল, তত আর কোনদিন লাগেনি। প্রথম দেখেই কৃষ্ণরায়কে তাঁর ভালো লেগেছিল, সেই ভালোলাগা যে একটি সন্ধ্যাতেই অনুরাগে পরিণত হয়েছে সে কথা তখনও তাঁর অজানা। শুধু কৃষ্ণরায় যখন ফিরে গেলেন দুর্গের দিকে তখন দুজনেই বুঝতে পেরেছেন এক বিশেষ আবেগ তাঁদের আপ্লুত করেছে।

দিন যায়। কৃষ্ণরায় দিনের কোন এক সময়ে একবার দেখে যান চিন্নাকে। এই দেখা হবার নির্দিষ্ট কোন স্থান থাকে না। কখনও কোদণ্ডরামের মন্দির, কখনও তুঙ্গভদ্রার তীর, কখনও রাজপথে দেখা হয় তাঁদের। সুলাই বাজারেও চিন্নার কক্ষে মাঝে মাঝে আসেন কৃষ্ণরায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সামান্য কটি মুহূর্ত প্রগাঢ় রসে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। চিন্না জানেন, তাঁর কোন স্বপ্নই সফল হবার নয়, তিনি নগরনটী, জনপদবধূ। কৃষ্ণরায় কি ভাবেন বলা শক্ত। বাইশ বছরের যুবক তখনও ভাবছেন সৈনিক হবার কথা। কিন্তু চিন্নার সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাতের সুযোগ তো সৈনিক জীবনে নেই। তাহলে কি করবেন? হঠাৎ তাঁর সব ভাবনা ওলটপালট হয়ে গেল।

বীর নরসিংহের অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছিল। মাত্র পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করেছেন। কিন্তু মৃত্যু যে তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তা অনেকেই বুঝতে পারেননি। কৃষ্ণরায়

তো কিছুই জানতেন না। মৃত্যুর আগে বীর নরসিংহ ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী সালুভ তিম্মাকে। বললেন, 'আমি তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে যেতে চাই।'

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

'শোনো, আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি আমার ছেলেকে রাজা হিসাবে দেখতে চাই। তুমি তার ব্যবস্থা করবে।'

'যে আজ্ঞা', মন্ত্রী মাথা নিচু করলেন। তিনি বিজয়নগরের নিয়ম জানেন। রাজার যদি উপযুক্ত পুত্র না থাকে তবে সিংহাসনে বসেন রাজার ভাই। অবশ্য সে নিয়ম কেই বা মানে? বীর নরসিংহের ছেলের বয়স মাত্র আট বছর।

বীর নরসিংহ বললেন, 'তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। আমার ভাই কৃষ্ণরায়কে খুঁজে এনে তার চোখদুটোকে উপড়ে এনে আমাকে দেখাও। এ কাজের ভার অন্য কাউকে দেবে না, পাঁচ কানও করবে না।'

সালুভ তিম্মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কৃষ্ণরায়কে তিনি চিনতেন। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যাকে পাঠালেন কৃষ্ণরায়কে আস্তাবলে ছল করে ডেকে নিয়ে আসার জন্য। কৃষ্ণরায় সরল মনেই এলেন। আড়াল থেকে তাঁকে দেখে মন্ত্রী মুগ্ধ হলেন। অত্যন্ত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, কচি শালগাছের মতো চেহারা, যদিও খুব লম্বা নয়, দৃঢ় ললাট, স্বপ্নময় দুটি চোখ, নির্ভীক ভাবভঙ্গি। এত ভালো করে কৃষ্ণরায়কে তিনি আগে কখনও দেখেননি। রাজার ভাই হলেও কৃষ্ণরায় দূরেই থাকতেন। কৃষ্ণরায় সালুভ তিম্মাকে বিনীতভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমাকে এখানে ডেকেছেন কেন?'

মন্ত্রী স্মিত মুখে বললেন, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'আপনাকে সবাই চেনে।'

'সবার সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখবেন না কুমার। আপনার সামনে মহা বিপদ।'

'কি রকম?'

'মহারাজ চান তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে সিংহাসনে বসুক।'

'সব পিতাই তাই চান মহামন্ত্রী। এতে আমার দাদার কোন দোষ নেই।'

'তা হয়ত নেই।' সালুভ স্মিত হাসলেন, 'সেজন্যই তিনি তাঁর শিশুপুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আপনার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাতে।'

কৃষ্ণরায়ের শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত নেমে এল। কি ভয়ঙ্কর বিপদ তাঁর সামনে, তিনি বুঝতে পারলেন। ঈষৎ কাঁপল তাঁর কণ্ঠ, 'আমি তো কোনদিন রাজা হতে চাইনি। ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে রাজা হবার স্বপ্নও দেখিনি। সারাজীবন আমি সৈনিক হতে চেয়েছিলাম।'

'আপনার তো জীবন পড়ে আছে। সারাজীবন। কত বয়স আপনার বলুন তো?'

'বাইশ বছর। কিন্তু আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। সত্যিই আমি সেনাদলে যোগ দেবার জন্য সব ধরনের অস্ত্রচালনা শিখেছি। এই নগরের সুরক্ষার কথা ভেবে কিভাবে সৈন্য সমাবেশ করা যায় ভেবেছি। কোনদিন রাজা হতে চাইনি।'

'উত্তরাধিকারসূত্রে সত্যিই যদি আপনার হাতে গোটা রাজ্যের ভার দেওয়া হয়, আপনি কি করবেন?'

'সত্যিই যদি আমি রাজা হই, কোন রকম চেষ্টা না করেও, তাহলে আমি রাজা হব হয়ত। কিন্তু আমার জীবনের লক্ষ্য হবে যোগী হওয়া। আমি যেমন করে সৈনিক হবার কথা ভাবি তেমনই যোগী হবার কথাও ভাবি।'

সালুভ তিম্মা উত্তর শুনে খুশি হলেন। কৃষ্ণরায় কোন রকম ষড়যন্ত্র করেননি। গুপ্তচরের মাধ্যমে তাহলে তিনি খবর পেতেন। অথচ তিনি যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, বয়সেও রাজা হবার উপযুক্ত। মন্ত্রী হিসাবে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনে করেন কৃষ্ণরায়কে, রাজার ভাই এবং যোগ্যতাও বেশি। এখন আট বছরের শিশুকে সিংহাসনে বসালে কবে সে বড় হবে এবং যোগ্য রাজা হবে কি না কে বলতে পার? তিনি মনস্থির করে ফেললেন। কৃষ্ণরায়কে বললেন, 'আপনি কয়েক দিন আমার সঙ্গে আড়ালে যোগাযোগ রেখে সাবধানে থাকবেন। আমার দিকে থেকে আপনার কোন ভয় নেই।'

অনন্ত কৃতজ্ঞতায় কৃষ্ণরায় মহামন্ত্রীর হাতদুটি ধরলেন। বললেন, 'আপনি আমার প্রাণভিক্ষা দিলেন।'

সালুভ তিম্মা একটি ছাগলের চোখদুটি তুলে নিয়ে গিয়ে মুমূর্ষু বীর নরসিংহকে দেখালেন। রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন। তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। মহামন্ত্রী ঘোষণা করলেন, 'মহারাজের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছেন কৃষ্ণরায়, তিনি রাজভ্রাতা, যুবক ও সিংহাসনের উপযুক্ত।' বিজয়নগরের নিয়ম অনুযায়ী রাজপুত্র বা রাজভ্রাতা সিংহাসনে বসতে পারেন বলে কারোর মনে সন্দেহ জাগল না, মহারাজের অন্তিম ইচ্ছা কি ছিল। আর তাঁর ইচ্ছা যা-ই হোক না কেন, মানুষ চায় রাজবংশীয় একজনকে। সেখানে কৃষ্ণরায়কে সবারই ভালো লাগল। মহারাজা কৃষ্ণদেবরায় নাম নিয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে, শকাব্দ ১৪৩১-এ (৪ ফেব্রুয়ারি ১৫০৯)। কৃষ্ণরায়ের কাছে সবটাই স্বপ্নের মতো ঘটে গেল।

মহামন্ত্রী অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আদেশ করুন।'

কৃষ্ণদেবরায় সামনে এসে তাঁর হাতদুটি জড়িয়ে ধরলেন, 'ও কথা বলবেন না। আপনি আমার গুরুজন। আপনার নির্দেশ নিয়েই আমি সব কাজ করব।'

সুলাই বাজারে সব খবরই আসে। প্রিয় সখী এসে চিন্নাকে বলেন, 'চিন্না শুনেছিস?'

কদিন ধরেই চিন্নার মন ভালো নেই। তিনি কৃষ্ণরায়ের দেখা পাচ্ছিলেন না, দেশের রাজাকে নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল না। তিনি তো সভানর্তকী হতে পারেননি, যে রাজার খবর নিয়মিত রাখবেন। ইদানীং কৃষ্ণরায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, মন দেয়া-নেয়ার খেলায় মেতে থাকায় তাঁর গুণগ্রাহী দর্শকদের সঙ্গেও বার্তালাপ কমে গিয়েছিল। তাই নতুন খবরটি তখনও তাঁর কাছে পৌঁছোয়নি। বললেন, 'কি শুনব?'

সখী নিজেই এসে তাঁর দীর্ঘ বেণী খুলে দিতে লাগলেন। এখন তাঁদের স্নানের সময়। হেসে বললেন, 'আহা যেন কিছুই জানো না, তোমার নাগর যে সত্যিকারের রাজা হয়েছেন।'

চিন্না নির্বাক বিস্ময়ে সখীর দিকে তাঁর বড় বড় চোখদুটি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

যেন দুর্বোধ্য কোন ভাষা শুনছেন। সখী বুঝতে পারলেন চিন্নার কথা। এবার সাবধানে বললেন, 'মহারাজা বীর নরসিংহ আজ স্বর্গে গিয়েছেন। সিংহাসনে তাঁর আসনে বসেছেন মহারাজা কৃষ্ণদেবরায়।' চিন্নার চিবুকটি তুলে ধরে সখী হাসলেন, 'তুমি তাঁকে চেন।'

চিন্না নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রিয়তম, সেই স্বপ্ন দেখা ভাবুক যুবক এখন দেশের রাজা। একদিন যাঁকে দেখে তাঁর ভুল হয়েছিল রাজা বলে, তারপর যাঁকে বসিয়েছেন তাঁর হৃদয় সিংহাসনে, তিনি আজ সত্যিই রাজা। আনন্দে তাঁর মন ময়ূরের মতো নৃত্য করে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় হল, এর পরে কৃষ্ণরায় তাঁকে মনে রাখবেন কি?

চিন্নার ভাবান্তর সখীর নজর এড়াল না। বললেন, 'কি ভাবছ বল দেখি। তুমি কি সুখী হওনি?'

চিন্না বললেন, 'আমাদের মতো তুচ্ছ নারীর সুখ দুঃখের সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণরায় রাজা হয়েছেন এ যে কত আনন্দের সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি আমাকে ভুলে যাবেন না তো।'

আশঙ্কা অমূলক নয় কাজেই সখী কিছু বলতে পারলেন না। তাঁরা সুলাই বাজারের বাসিন্দা। উৎসবের সময় রাজপ্রাসাদে, দেবমন্দিরে তাঁদের ডাক পড়ে। সভায় নৃত্যগীতের আসরেও কোন কোন সৌভাগ্যবতী নিয়মিত যায় কিন্তু রাজার জীবনের সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই। সান্ত্বনা দেবার জন্য চিন্নাকে বললেন, 'মহারাজকে আগে থেকেই ভুল বুঝো না। তোমাকে তিনি ভালোবাসেন। তোমার নৃত্য তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি নিশ্চয় তোমাকে রাজনর্তকীর পদটি দেবেন। তুমি নাচবে। দেশের বিদেশের সেরা রাজ অতিথিদের সামনে।'

চিন্না বললেন, 'ভালোবাসা না ছাই। তিনি যে দেশের রাজা হতে চলেছেন এই সুসংবাদটি কি পূর্বাহ্নে আমাকে দিতে পারতেন না? পুরুষের জীবনে নারী শুধুই খেলার পুতুল। গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার কথা তারা আমাদের বলে না।'

'তা যদি জানো, তাহলে আর দুঃখ করছ কেন?'

'আর করব না। চল পম্পাপতির মন্দিরে যাই।'

'যেতে তো হবেই। তোমাকে আসল কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি। আজ পম্পাপতির মন্দিরে মহারাজের অভিষেক উপলক্ষে বিশেষ পুজো হবে। আমাদের সবাইকে দেবদাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।'

অভিষেক উৎসবে সারা বিজয়নগরই নতুন করে সেজেছে। সব মন্দিরেই বিশেষ পূজা হচ্ছে। পম্পাপতির মন্দির তো জনসমুদ্রে পরিণত। পথের দুধারে পরীর মতো রূপসীরা নাচছে। তাদের সর্বাঙ্গে গয়নার আলো ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধাচ্ছে। অভিভূত কৃষ্ণদেবরায় ভাবছিলেন, এই উৎসবে তাঁর থাকার কথা ছিল দর্শকের ভূমিকায়। তার বদলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি বসেছেন সিংহাসনে। দিন দশেক কেটে গিয়েছে স্বপ্নের মতো। দেখা করতে পারেননি চিন্নার সঙ্গে। সেদিন তো চিন্নার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন। দেখা হল মহামন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর

আদেশে গা ঢাকা দিতে হল। চলে গিয়েছিলেন বিপরীত প্রান্তে, পাহাড়ের গুহায়। প্রতি রাত্রে এসে দেখা করেছেন মন্ত্রীর নির্দেশিত জায়গায়। মাত্র দুদিন অবশ্য। তারপরেই দাদার মৃত্যু ও মহামন্ত্রীর ঘোষণা। স্বস্তিতে হলেও এ কদিনও ঘরবন্দী হয়েই থাকতে হয়েছে। বীর নরসিংহের শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই আর একটা কঠিন কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। আট বছরের ভাইপো ও নিজের তিন ভাইকে পাঠাতে হয়েছে চন্দ্রগিরি দুর্গে। আত্মীয়দের রক্তে হাত রাঙা করতে চাননি তিনি, তাদের অন্ধ খঞ্জ করতেও চাননি। শুধু নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে নজরবন্দি করে রাখার জন্য চন্দ্রগিরি দুর্গে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিচক্ষণতায় সালুভ তিম্মা, যদিও বুদ্ধিটা তিনিই দিয়েছিলেন, খুশি হয়ে উৎসবের আদেশ দিলেন। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে কৃষ্ণদেবরায় মন্দিরে উপস্থিত হলেন। এই উৎসবে নিশ্চয় আসবেন চিন্না।

সার বেঁধে দুপাশ দিয়ে চলেছে নর্তকীরা, মাথায় সোনার ঘট, তার চারপাশে মুক্তোর ঝারি, পূর্ণঘটের মুখে মাপসই সোনার প্রদীপ জ্বলছে। চাতালে উঠে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর প্রিয়তমা চিন্নাকে। রক্তরাঙা পট্টবস্ত্র, সুশোভন কাঁচুলিতে চিন্নাকে বড় মানিয়েছে। সর্বাঙ্গে হিরে মুক্তোর আভরণ, কানে দুলছে পম্পাদাম। কেন? চিন্না তো দেবদাসী নয়। সে বলেছিল, আমি রাজার দাসী। দুবছর পরে কথাটা মনে পড়ল আচম্বিতে। আর একটি কথাও মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন, কোনদিন রাজা হলে তাকে তিনি রানি করবেন। তাঁর কথা তিনি নিশ্চয় রাখবেন। কিন্তু চিন্নার মানানসই সাজে যেন অন্য ইঙ্গিত। চঞ্চল হয়ে উঠলেন কৃষ্ণদেবরায়।

অভিষেকের ঝঞ্ঝাট মিটলে কৃষ্ণদেবরায় স্থির করলেন, তিনি যাবেন চিন্নার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু রাজার জীবন যে এত নিশ্ছিদ্র প্রহরায় বন্দী, আগে তিনি তা জানতেন না। এদের কাউকেই বলা চলে না, তিনি সুলাই বাজারে এক নর্তকীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। রাজার জীবনে অনেক বাধা, অনেক নিয়ম। রাত্রের অন্ধকারে একদিন ব্যর্থ হবার পর, দ্বিতীয় দিন তিনি প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদ থেকে, দুর্গ অতিক্রম করতেও সময় লাগল না। তিনি চলেছেন ছদ্মবেশে। তিনি বুঝতেও পারলেন না মহারাজের সব আচরণই গোপনে লক্ষ করেছে বিজয়নগরের প্রতিহারিণীরা। রাজপ্রাসাদ রক্ষা করে নারীরক্ষীরা, অসিচালনায় তারা নিপুণ। মহামন্ত্রীকে তারা খবর দিয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশেই শিথিল হয়েছে সব প্রহরা। কৃষ্ণদেবরায় কিছুই জানেন না কিন্তু মন্ত্রী নীরবে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন। বিস্ময় চরমে পৌঁছেছে তাঁর। কোথায় যাচ্ছেন এই যুবক? সম্পূর্ণ একা, নিরস্ত্র অবস্থায়? যেখানে গুপ্তহত্যার আশঙ্কা পদে পদে। কুমার অচ্যুতরায় কিংবা তাঁর ভাইয়েরা না হয় চন্দ্রগিরিতে নজরবন্দি হয়েছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-পরিজনরা কি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই? পাশের রাজ্যগুলির সুলতানরাও বিজয়নগরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। নতুন রাজার বিক্রম বোঝার আগেই কিছু একটা করে ফেলতে পারেন তাঁরাও। এ সবই কৃষ্ণদেবরায় জানেন। গত কয়েকদিন ধরে মহামন্ত্রী তাঁকে বুঝিয়েছেন এবং খুশি হয়ে লক্ষ করেছেন, অতি দ্রুত মহারাজ সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। তাহলে এই নৈশাভিসার?

মহামন্ত্রী বুঝলেন, তাঁর অনুমান ঠিক, যুবকরাজা অভিসারেই যাচ্ছেন। মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল তাঁর। যৌবনের মত্ততা মহারাজাকে কোথায় নিয়ে যায় সেদিকে লক্ষ রেখে সাবধানে অগ্রসর হলেন। অভিষেকের সময়েই স্থির হয়েছে শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজার শুভ পরিণয় হবে। দেখা যাক মহারাজের গতি কোনদিকে? কিন্তু কৃষ্ণদেবরায় যখন সুলাই বাজারের দিকে অগ্রসর হলেন তখন মহামন্ত্রী প্রমাদ গুণলেন। বিরক্তও হলেন। গণিকাসক্ত রাজা দেশের কল্যাণ করে না।

নির্দিষ্ট ঘরটির সামনে গিয়ে কৃষ্ণদেবরায় দাঁড়ালেন। মধ্যবর্তী ঝোড়ো দিনগুলি পেরিয়ে এসেছেন তিনি। স্বস্তি বোধ করলেন, চিন্নার ঘরে আজ কোন অতিথি নেই দেখে। দাসী এল প্রদীপ হাতে। কৃষ্ণদেবরায়কে দেখেই নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। পথ দেখবার দরকার ছিল না, কৃষ্ণদেবরায় এখানে বহুবার এসেছেন। সখীরা এল মৃদঙ্গ মন্দিরা হাতে। বলল, 'আমাদের কি সৌভাগ্য।'

কৃষ্ণদেবরায় হাসলেন, 'নতুন করে সৌভাগ্যের উদয় হল কিভাবে? আমি তো নবীন আগন্তুক নই।'

'তা হবে না। আজ আমরা দ্বার খুলব না। রাইকিশোরীর মান হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলেছেন।'

'ভুলিনি বলেই তো এসেছি।' গলা থেকে মুক্তোর মালাটি খুলে উৎকোচ দিলেন সখীকে।

'আপনি এসে ভালোই করেছেন মহারাজ। আমরা ভেবে পাচ্ছি না, চিন্নাদেবী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন দেবমন্দিরে। কিভাবে তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করব।' চিন্নার প্রিয় সখী রাজাকে বললেন।

বিস্মিত কৃষ্ণদেবরায় চিন্নার ঘরে গেলেন। মনে যতই কষ্ট জমে থাকুক, চিন্না অপরূপ ভঙ্গিতে মহারাজের চরণ বন্দনা করলেন। কৃষ্ণদেবরায় তাঁর হাতদুটি ধরে নিজের বুকে টেনে আনলেন। সস্নেহে বললেন, 'এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না, আমি তো নতুন কেউ নই।'

গভীর কণ্ঠে চিন্না বললেন, 'না মহারাজ, আপনি দয়া করে এই প্রথম আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।'

'তাহলে আগে যে আসত সে কে?'

'সে আমার হৃদয়ের রাজা, আমার প্রিয়তম।'

'আমার খুব হিংসে হচ্ছে তাকে।'

'হিংসে করবেন না মহারাজ,' মদির কণ্ঠে চিন্না বললেন, 'আপনার অনেক কিছু আছে। আগামী পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজকন্যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। আরও পরে কত রানি আসবেন। আমার প্রিয়তমের জীবনে আর কেউ ছিল না।'

'এখনও কেউ নেই চিন্না। রানিরা আসেন রাজনীতির নিয়মে। সেখানে প্রেম কোথায়?'

'তাই বুঝি?' ঈষৎ ব্যঙ্গ চলকে পড়ল যেন। কদিন মাত্র রাজা হয়েছেন কৃষ্ণদেবরায়,

এরই মধ্যে সাবধান হয়ে গিয়েছেন, পাছে চিন্না পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রানি হতে চায়।

'হ্যাঁ। এই কদিনে আমি বুঝেছি রাজা হওয়া কি কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু আমি কি শুনছি, তুমি নাকি নিজেকে উৎসর্গ করতে চাও দেবমন্দিরে?'

মন্দিরে যে দাসী নিজেকে উৎসর্গ করে সে হয় দত্তা। দেবদাসী হিসাবে তার সম্মান অনেক। কিন্তু চিন্না নিজেকে মন্দিরে উৎসর্গ করতে চান তাঁর ভালোবাসার ধন আকাশের চাঁদের মতো হাতের বাইরে চলে গিয়েছেন বলে। এবার তিনি এমন একজনকে ভালোবাসতে চান যাঁকে হারাবার ভয় নেই। চিন্না বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। নিজের ভালো সকলেই চায়। দেবতার চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় আনন্দ আছে।'

'না তুমি দেবদাসী হবে না। প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মনে আছে, তুমি বলেছিলে আমি দেবদাসী নই, রাজার দাসী।'

'মনে আছে মহারাজ। আপনি বলেছিলেন ওই নামে কোন দাসীর পদ এ রাজ্যে নেই। নতুন পদ কি সৃষ্টি হয়েছে?'

আহত হলেন কৃষ্ণদেবরায়, 'ও কথা বলছ কেন? আমি তো তা বলিনি।'

'তাহলে আপনি কি বলছেন মহারাজ?'

'আমি তোমাকে রানি করে নিয়ে যাব। মনে আছে, তোমায় আমি বলেছিলাম, যদি কোনদিন রাজা হই তাহলে...'

'মনে আছে মহারাজ, 'মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন চিন্না। তাঁর দুচোখে জল, কৃতজ্ঞতায়, ভালোবাসায়। সত্যিকারের রানি হবার লোভ চিন্নার কতটা তা নিক্তিতে বিচার করতে হবে। কিন্তু প্রেমাস্পদ যখন ভালোবাসার স্বীকৃতি দিয়ে নারীকে গ্রহণ করতে চায়, নারী তখন সব কিছু ভুলে যায়। বহু যুগ ধরে নারী এই ছলনার স্বীকার হয়েছে তবু চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু বদলায়নি।

কৃষ্ণদেবরায় অবশ্য ছলনা করেননি। মানুষ হিসাবে তিনি অসাধারণ। ভালোবাসার প্রগাঢ়তাও কম নয়। চিন্নাকে ছলনা তিনি করেননি। প্রকৃত ভালোবাসার স্বাদ তিনি পেয়েছেন চিন্নাকে ভালোবেসেই। চিন্নার রূপান্তর লক্ষ্য করে হেসে বললেন, 'তাহলে আর দেবদাসী হবার সংকল্প নেই তো?'

চিন্না রাজার প্রশস্ত অনাবৃত বুকে মাথা রাখলেন, 'না, আমি রাজার দাসী।'

দুজনেই হেসে উঠলেন। চিন্না শুনলেন কৃষ্ণদেবরায়ের রাজা হবার কথা। তাঁর হাতে হাত রেখে শিউরে উঠলেন ভয়ানক সম্ভাবনার কথা ভেবে। যদি মহামন্ত্রী ক্ষমতালোভী হতেন...। অপরের উদারতার কথা শুনে মাঝে মাঝে চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। চিন্না বললেন, 'প্রিয়তম, আমি আর তোমাকে আমার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইব না। আমাকে রানি হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে আবার হয়ত তোমাকে বিরূপ সমালোচনার মধ্যে পড়তে হবে। সদ্য বিপদমুক্ত হয়েছ। আর দুশ্চিন্তায় কাজ নেই।'

কৃষ্ণদেবরায় সস্নেহে চিন্নার কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন, 'তুমি কোনও চিন্তা কোরো না। আমার কথা আমি রাখবই। শুধু কিছুটা সময় দাও।

নীরবে কৃষ্ণদেবরায় যখন ফিরে চলেছেন, মনে খুশির জোয়ার, মহামন্ত্রী এসে তাঁর পিঠে হাত দিলেন। চমকে উঠলেন কৃষ্ণদেবরায়। তারপর মন্ত্রীকে দেখে বললেন, 'আপনি এখানে?'

সালুভ তিম্মা বললেন, 'সেই প্রশ্ন তো আমারও। বিজয়নগর রাজ্যের সম্মানিত রাজাধিরাজকে তো সুলাই বাজারের পথে দেখতে পাবার কথা প্রজারা ভাবতেই পারবে না। আমিও পারছি না। আপনি শিবিকায় উঠুন।'

মহামন্ত্রী সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। কৃষ্ণদেবরায় চুপচাপ তাঁর আদেশ পালন করলেন। রাজপুরীতে এসে দুজনে বসলেন মুখোমুখি। তীব্র ভর্ৎসনা করে মহামন্ত্রী বললেন, 'আপনার কাছে এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। আপনি কি বলে সুলাই বাজারের এক সামান্যা গণিকার গৃহে গেলেন?'

মুহূর্তের মধ্যে রেগে আগুন হয়ে গেলেন কৃষ্ণদেবরায়। যদিও সে ভাব প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'আমি যার গৃহে গিয়েছিলাম সে নর্তকী, গণিকা নয়।'

'ওই হল', সালুভ তিম্মা হাত তুলে বললেন, 'ওদের সবাই নৃত্যগীতপটিয়সী সুদর্শনা। নাগরিকদের মনোরঞ্জন করাই ওদের পেশা। তাতে তাদের কোন দোষ নেই। অর্থের বিনিময়ের প্রশ্ন না থাকলে তারা বাঁচবেই বা কি করে। কিন্তু মহারাজ, মানুষ রাজাকে তাদের চেয়ে উঁচু আসনে বসাতে চায়। তাতেই রাজ্যের মঙ্গল। রাজারও মঙ্গল। আজ যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়! আপনি আর কোনদিন সুলাই বাজারে যাবেন না।'

'সাধারণ মানুষ না জানুক, আপনি তো জানেন রাজা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তারও জীবনে ইচ্ছা অনিচ্ছা, অনুরাগ-বিরাগ আছে।'

সালুভ তিম্মা বললেন, 'নিশ্চয় আছে। তার রীতিনীতি আলাদা। আমি এখনই খবর দিচ্ছি, নৃত্যশালার আলো জ্বেলে দিতে, আপনি নৃত্য দেখবেন। সঙ্গীতশালায় যেতে চাইলে সে ব্যবস্থায় ত্রুটি হবে না। যদি প্রয়োজন হয় দাসীরা অঙ্গ সংবাহন করবে।' বলে তিনি প্রতিহারিণীকে ডাকতে উদ্যত হলেন।

কৃষ্ণদেবরায় বললেন, 'থাক। তার কোন দরকার হবে না। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি বিলাসে নিমগ্ন হয়ে জীবন কাটাবার কথা ভাবি না। আমি সৈনিক হবার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আমি একজনকে ভালোবাসি। সে নর্তকী এবং সুলাই বাজারে বাস করে।'

'সামান্য নর্তকীর সঙ্গে মহারাজের প্রণয়?'

'চিন্না সামান্য নর্তকী নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি তাকে না দেখে থাকতে পারি না। যখন আমার রাজা হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তখন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি কোনদিন রাজা হই তবে আমি তাকে রানির আসনে বসাব।'

সালুভ তিম্মা মাথা নাড়লেন। রাগের পরিবর্তে তাঁর হাসি পেল। যৌবনের ধর্ম যাবে কোথায়? বললেন, 'যৌবনের ধর্মে এরকম প্রতিজ্ঞা অনেকেই করে, সে প্রতিজ্ঞা

কেউ পালন করে বলে তো শুনিনি। প্রত্যেক নবীন জননী তার শিশুকে অন্তত ঘুম পাড়াবার সময় আকাশের চাঁদ এনে দেবার প্রতিজ্ঞা করে। সে প্রতিজ্ঞা কোনদিন পালন করা হয় না। এখানেও আপনার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আশঙ্কা নেই। আমার ধারণা এ ব্যাপারে মেয়েটি কোন ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস পাবে না।'

'কিন্তু আমি পারব তাই না?' ব্যঙ্গ করে বললেন, কৃষ্ণদেবরায়, 'শুনুন মহামন্ত্রী, আমি তাকে বিবাহ করবই। কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যোগ্য শাসক হতে পারব না।'

সালুভ তিম্মা মন দিয়ে কথাগুলি শুনলেন, মুখে তর্ক করলেও তাঁর শ্রদ্ধা হচ্ছিল নবীন রাজার প্রতি। কোন ভুল তিনি করেননি, যোগ্য মানুষকেই সিংহাসনে বসিয়েছেন। বহুদিন সুখে থাকবে দেশের মানুষ। গুরুদায়িত্বের অহেতুক বোঝা নিয়ে তাঁর চিন্তা করবার দরকার নেই। এই যুবক নিজেই তা সামলাতে পারবেন। তারপর বটুয়া থেকে ছোট জাঁতি বার করে একখণ্ড সুপুরি কেটে মুখে দিলেন। তাঁর সামান্য একটি ইশারায় চিন্না নাম্নী রাজার প্রেয়সী চিরকালের মতো অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু নরহত্যায় তাঁর রুচি নেই। বিশেষ করে তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। চিন্নাকে হারিয়ে নবীন রাজা যে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন সে ভয় না থাকলেও রাজার চরিত্রের এই কোমল, প্রজাবৎসল, সত্যনিষ্ঠ দিকটি হারিয়ে যেতে পারে। তারপর বললেন, 'আমাকে একটু সময় দিন। যাতে কোন জনরব না ঘটিয়ে কার্যসিদ্ধ করা যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আপনি কোন কারণেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন না। কথা দিন।'

'আপনাকেও কথা দিতে হবে, আপনি তার কোন ক্ষতি করবেন না।'

'নিশ্চয়। ক্ষতি করতে চাইলে আপনার সঙ্গে এত কথা বলার প্রয়োজনই হত না।'

মন্ত্রী মনে মনে বললেন, আমিও দেখব প্রেমের গভীরতা। যদি এতেই মহারাজ সুলাই বাজার যাওয়া বন্ধ করেন তাহলে, নতুন বিবাহের পরে নিশ্চিন্ত, আর তা যদি না হয় কিছু করতেই হবে।

প্রতিজ্ঞা করার পরেই কৃষ্ণদেবরায় বুঝলেন, তিনি মহামন্ত্রীর ফাঁদে পা দিয়েছেন, অন্তত একবার চিন্নার সঙ্গে দেখা করে প্রকৃত অবস্থা জানাতেই হবে। তাকে না পেলে তাঁর জীবনই বৃথা। কাজেই মহামন্ত্রীর চোখ এড়িয়ে মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা হতে লাগল। কখনও পম্পাপতির মন্দিরে, কখনও বিঠলস্বামীর পরিত্যক্ত দেউলে। কেন এই মন্দিরটি পরিত্যক্ত তার কারণ খোঁজেন কৃষ্ণদেবরায়। তাঁর আদেশে তৈরি হচ্ছে নতুন গোপুরম। অন্তঃপুরে এসেছেন একাধিক রানি কিন্তু তাঁরা জড়িয়ে আছেন রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে, তাঁর জীবনের সঙ্গে নয়। যে রাজার যত পত্নী, তাঁর তত সম্মান কেন না রাজকন্যারা সঙ্গে নিয়ে আসেন বৈভব, কখনও পরাজিত পিতার সন্ধিবার্তা এবং আরও অনেক কিছু।

কিছুদিন পরে মহামন্ত্রী জানতে পারলেন রাজা আবার বেরিয়েছেন অভিসারে, কারণ কয়েক দিন হল তিনি চিন্নাদেবীর সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না। মহামন্ত্রী নীরবে রাজাকে অনুসরণ করে চিন্নার দরজা থেকেই রাজাকে ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'আপনি আপনার কথা রাখেননি মহারাজ।'

'এ জীবন আমার কাছে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে মহামন্ত্রী। আপনিও তো কথা রাখেননি। কোন উপায় খুঁজে পাননি।'

'ভেবেছি মহারাজ। আমি শুধু আপনার প্রেমের গভীরতা লক্ষ করছিলাম। শুধু আপনার নয়, চিন্নাদেবীর কথাও ভাবছিলাম।'

'তার মানে?'

'আপনার বিবাহ স্থির করা হয়েছে নরসিংহ রাজার বংশে, এক অপরূপ রূপসী কন্যার সঙ্গে।'

'আবার বিবাহ?'

'হ্যাঁ। আর সেই অনুষ্ঠানের মধ্যেই এক ফাঁকে কনে বদল করে চিন্নাদেবীকে পাঠিয়ে দেব তাঁর নতুন মহলে। কেউ বুঝতেও পারবে না।'

'এর কোন প্রয়োজন আছে?'

'আছে বইকি। চিন্নাদেবী আপনার প্রণয়াস্পদ হতে পারেন, বাস্তবে তাঁর পরিচয় তিনি নর্তকী। সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে হয়ত তাঁর নাচ দেখেছেন অনেকে। সুতরাং প্রজার চোখে আপনি ছোট হয়ে যাবেন। অন্যান্য রাজবধূরাও অপমানিত বোধ করতে পারেন। কাজ কি মিছে ঝামেলায়। রানি হতে গেলে লোকসমাজ থেকে চিন্নাদেবীকে চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে হবে।'

'তা কি করে সম্ভব? চিন্না তো অবগুণ্ঠনবতী নয়। এদেশে তার চল্ নেই।'

'তবু তাঁকে তা মেনে চলতে হবে। তাছাড়া আমি অবগুণ্ঠনের কথা বলিনি। বলেছি অন্তরালবর্তিনী হতে হবে। এবং তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন।'

'তাহলে ঘোষণা করুন রাজবধূরা সকলেই সাধারণের চোখের আড়ালে থাকবেন।'

'আপনি রাজা আপনার অন্তঃপুরে কি নিয়ম চলবে তা আপনিই স্থির করবেন। কিন্তু চিন্নাদেবীকে তাঁর মহলেই আটক থাকতে হবে। সপত্নীদের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না। মেয়েরা বড্ড কথা ছড়ায়।'

মহামন্ত্রীর ব্যবস্থামতোই সব কিছু হল। সুলাই বাজার থেকে সখীদের সঙ্গে নিয়ে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন নর্তকী চিন্না। রাজ অন্তঃপুরের সবচেয়ে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা মহলে রানি হয়ে এলেন তিরুমালা দেবী।

মহারাজ কৃষ্ণদেবরায়ের বহুদিনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল এতদিনে, চিন্না এলেন রাজমহিষী হয়ে। এতদিনের চেনা, তবু যেন অচেনা। তাই হয় বোধহয়, প্রিয়া যখন পত্নী হয়, তখন সে কি আগের মতো থাকে? চিন্নাদেবী বন্দি হলেন চিরকালের জন্য কিন্তু হারিয়ে গেলেন না। তাঁর নামটি সব সময়ই মহারাজার প্রিয়তমা এবং প্রধানা রানিদের সঙ্গে শোনা গিয়েছে। কৃষ্ণদেবরায় বিবাহ ক'রেছিলেন বারোবার। এঁদের মধ্যে প্রধানা তিন মহিষী হলেন শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজকন্যা, ওড়িশার রাজকন্যা ও তিরুমালাদেবী বা নর্তকী চিন্নাদেবী। কৃষ্ণদেবরায়ের অপর নয় রানির নাম জানা যায়নি। কয়েকটি পুত্রকন্যা উপহার দেওয়া ছাড়া রাজার জীবনে তাঁদের কোন ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। যদিও তাঁদের সকলেরই আলাদা মহল ছিল, প্রচুর অলঙ্কার ও

অসংখ্য সখী ও দাসী ছিল। তবে রাজার নির্দেশে তাঁদেরও থাকতে হত লোকলোচনের বাইরে। অবশ্য ইচ্ছে হলে তাঁরা হয়ত একে অপরের মহলে যেতে পারতেন বা অন্তঃপুরের উৎসবে যোগ দিতে পারতেন। সে ইচ্ছে তাঁদের হত কি না তা জানবার কোন উপায় নেই। মহারাজা যেদিন যাঁর মহলে যেতেন তাতার নারী রক্ষী সে খবর সেই মহলে গোপনে দিয়ে আসত। আবার রাজা কাউকে নিজের মহলেও আহ্বান জানাতে পারতেন। এই সতর্কতার কারণ ছিল গুপ্ত শত্রুর হাত থেকে বাঁচা।

যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক, সুলাই বাজারের একটি ফুল যে রাজার উদ্যানে চলে গিয়েছেন, বিজয়নগরের মানুষ তা জানতেন। কেউ ঘটনাটিকে অকারণ গুরুত্ব দিয়ে মাথায় যেমন তোলেননি, তেমনই ছি ছি-ও করেননি। কৃষ্ণদেবরায়ের ব্যক্তিত্বই তার প্রধান কারণ। চিন্নাদেবীকে বললেন, 'বিজয়নগরে তোমার প্রকাশ্যে আসা বারণ কেন না, তোমার সুন্দর মুখটি অনেক প্রেমিকেরই রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তোমাকে এমন করে লুকিয়ে রাখতে ভালো লাগে না।'

চিন্না বললেন, 'কিছু চাই না। তুমি যে মুক্তি দিতে চেয়েছ এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'আমি স্থির করেছি, একটা নতুন নগর পত্তন করব তোমার নামে। তুমি কি বল?'

'আমি সেই সৌভাগ্য কল্পনাই করতে পারছি না।'

'সেখানকার উদ্যানে তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারবে।'

ইতিহাসে আছে কৃষ্ণদেবরায় তাঁর এই নর্তকী পত্নীর নামে একটি নগরের পরিকল্পনা করেন। বিদেশি পর্যটকেরা লিখেছেন, সেই নগরের নাম নাগালাপুর, বর্তমানে তাকেই বলা হয় হসপেট, মূল বিজয়নগর থেকে নাগালাপুরের দূরত্ব তেরো মাইল। বস্তুত নগরের প্রসারণের প্রয়োজনেই একাধিক শহর তৈরি হয়েছিল এই অঞ্চলে, অন্য তিন দিকে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু উৎখননের পরে জানা গিয়েছে অন্য কথা। কিছু প্রস্তরলিপিতে রয়েছে এই নগরের নাম তিরুমালাদেবী-পত্তন। এর অর্থ চিন্নার নাম নাগালাদেবী ছিল না, বরং প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে নাগালাপুর নির্মিত হয়েছিল কৃষ্ণদেবরায়ের জননীর সম্মানে। তাঁরা কি প্রমাণ পেয়েছেন বা পাননি সে খোঁজ এখানে অবান্তর। তিরুমালাদেবী-পত্তনে বড় বড় বাড়ি ছিল, বাজার ছিল, বড় বড় গাছে ভরা বাগান, তাও ছিল। তিরুমালাকে নিয়ে মহারাজ কখনও বাগান দেখাতে এসেছিলেন নিশ্চয়।

কৃষ্ণদেবরায় আরও একটি কাজ করেছিলেন। তিরুপতি মন্দিরে তাঁর যে মূর্তিটি আছে তার দুপাশে দুজন রানি, একজন উৎকল রাজকুমারী অপরজন অবশ্যই তিরুমালাদেবী। বিজয়নগরে তাঁকে কেউ কখনও দেখতে না পেলেও তিরুপতি মন্দিরে হয়ত সত্যিই চিন্নাদেবী গিয়েছিলেন। ১৫২৪ সালে কৃষ্ণদেবরায় আর একটি নগরের পত্তনে মন দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর নবজাত পুত্রর কথা ভেবে (সালে তিরুমালা মহারাজপুর), অনন্তপদ্মনাভের মন্দিরও তৈরি হয়। বলা বাহুল্য এই রাজপুত্রের জননী তিরুমালাদেবী।

শিশুকে মাঝে মাঝে বুকে নিয়ে কৃষ্ণদেবরায় চিন্নাকে বলেন, 'তোমার ছেলেই সিংহাসনে বসবে চিন্না, আমার জীবন বোধহয় শেষ হয়ে এল।'

'ও কথা বলবেন না মহারাজ,' চিন্না তাঁর কাঁধে মাথা রেখে বলেন, 'আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করে। আপনাকে ভালোবেসে আমার সাধ মেটেনি।'

কৃষ্ণদেবরায় হেসে বললেন, 'জান, মাঝখানে কতগুলো বছর কেটে গিয়েছে। কুড়িটা বছর।'

'আপনি অনেক দিন বাঁচবেন মহারাজ। এই দুধের শিশুকে সিংহাসনে বসাবেন কি করে? কে ওকে দেখবে?'

'জানি না চিন্না তবে মহামন্ত্রীকে আমি ভার দিয়ে যাব।'

সালুভ তিম্মা বৃদ্ধ হলেও শক্ত ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণদেবরায়ের জীবন মাত্র বিয়াল্লিশ বছরেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর বছরখানেক আগে তিনি তাঁর ছয় বছরের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তার অভিভাবক-প্রতিনিধি হয়ে রাজকাজ চালাবেন ঠিক করেছিলেন। মহামন্ত্রীকে ডেকে জানালেন নিজের মনের কথা। 'মহামন্ত্রী, বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমার শেষ ইচ্ছা আপনাকেই পালন করতে হবে।'

'বলুন মহারাজ।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মহামন্ত্রী। বিজয়নগর এত যোগ্য সুশাসক আগে কখনও পায়নি। সম্পদে-সম্মানে-সুখে প্রজারা ভালো আছে। কিন্তু মহারাজের শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তিনি জানালেন তাঁর ইচ্ছের কথা। কিন্তু সিংহাসনে শিশু রাজা সালুভ তিম্মার একেবারেই পছন্দ নয়। অবশ্য কৃষ্ণদেবরায় তাঁকে কোন হৃদয়হীন কাজের আদেশ দিলেন না। শুধু বললেন, 'ওর ভার আপনার ওপরেই রইল।'

মহামন্ত্রী নীরবে সম্মতি জানালেন।

শিশু রাজাকে বসানো হল সিংহাসনে। মহারাজা স্বয়ং বসলেন তাঁকে কোলে নিয়ে। সকলেরই চোখে জল এল মহারাজের ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে। এই বিষণ্ণ পরিমণ্ডলকে আনন্দে ভরে দেবার জন্য মহারাজ বললেন, 'শরীর থাকলেই মৃত্যু আছে। সে কথা না ভেবে আপনারা সবাই উৎসব করুন। শীতের পাতাঝরার দিনে যেমন থাকে নব বসন্তের ইঙ্গিত, তেমনই বিজয়নগরেও শুরু হোক নবীনের বন্দনা।'

প্রজারা মহারাজের জয়ধ্বনি দিলেন। এমনিতেই বিজয়নগরে উৎসব লেগেই থাকে। মহানবমী ডিব্বা (পরবর্তীকালে দেওয়া নাম) সাজানো হল নতুন করে, সেই কলিঙ্গ বিজয়ের সময় নবনির্মিত ভবনটি যেমন সাজানো হয়েছিল। দীর্ঘ আট মাস বিজয়নগর মেতে রইল সেই উৎসব নিয়ে। অন্য রানিরা কে কিভাবে নিলেন এই উৎসব কে জানে? হঠাৎ শিশু রাজা বা রাজপুত্র মারা গেলেন। বিষে নীল হয়ে যাওয়া শিশুকে দেখে জ্ঞান হারালেন চিন্নাদেবী। আর শেষবারের মতো ক্রোধে জ্বলে উঠলেন কৃষ্ণদেবরায়। তিনি বুঝতে পারলেন সালুভ তিম্মা আবার ষড়যন্ত্র করেছেন। অনুসন্ধান করে প্রমাণও পেলেন মহামন্ত্রীর পুত্রই তাঁর পুত্রের হত্যাকারী। পিতা-পুত্রকে কারাগারে বন্দি করে আদেশ দিলেন তাঁদের অন্ধ করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। যদিও পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখে মনে হয়, সালুভ তিম্মাকে তিনি অন্ধ করেননি। ব্রাহ্মণ হত্যার অপরাধ

হবে বলে শুধু বন্দিই করেছিলেন। নিজের অপর এক পুত্র যার বয়স মাত্র আঠার মাস, তাকে আর সিংহাসনে বসিয়ে মৃত্যুমুখে পাঠাননি, ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে ইচ্ছাপত্রে ঘোষণা করেন তাঁর মৃত্যুর পরে বিজয়নগরের ভার নেবেন তাঁর ভাই অচ্যুত রায়। ১৫৩০ সালের মাঝামাঝি কৃষ্ণ দেবরায়ের মৃত্যু হয়। বিজয়নগরে নারীরা সতী হতেন। রানিরা সতী হবেন বলাই বাহুল্য। মরণে সবাই সমান। অন্যদের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে চিন্নাদেবীও স্বামীর সহগামিনী হলেন।

বিজয়নগর রাজ্য কবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছেন অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে অজস্র নাম। কিন্তু প্রেমের আয়ু অনেক বেশি। চেষ্টা করেও চিন্নাদেবীকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যায়নি। তুঙ্গভদ্রা আজও কৃষ্ণ দেবরায় ও চিন্নাদেবীর গল্প হাম্পির পর্যটকদের শোনায়।

জাহান্দার শাহ ও লালকুঁয়র

জনমানসে চিরকালের জন্য বেঁচে থাকার যোগ্যতা দুজনের কারোরই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসে আছে তাঁদের ভালোবাসার কথা। তীক্ষ্ণ ভাষায় মুঘল বাদশাহের সেই আসক্তির নিন্দা করেছেন সমসাময়িক লেখক। কেন না প্রেম জাহান্দার শাহের জীবনে এনেছিল সর্বনাশ। লালকুঁয়রের ক্ষমতালিপ্সা তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। কিন্তু একতরফা বিচারই তো সব নয়। অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল। যা সেতু রচনা করেছিল শাহজাদা ও নর্তকীর মধ্যে। অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল জাহান্দার শাহ ও লালকুঁয়রকে।

মুইজ উদ্দিন তখনও জাহান্দার শাহ হননি। তাঁর দিন কাটছে আরও পাঁচজন মুঘল শাহজাদার মতো। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নাতি, প্রথম বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুইজ উদ্দিন বহু গুণের আধকারী আবার কোনভাবেই সিংহাসনের উপযুক্ত নন। মুঘল তখ্ত বা সিংহাসন তখন ওমরাহদের হাতে। তাঁরা যাঁকে নির্বাচন করবেন তিনিই বসবেন সিংহাসনে। এমনই পঙ্কিল আবর্তে সময় কাটছিল মুইজ উদ্দিনের। ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে। বন্ধুরাই খবর দিলেন, 'চকে এক তওয়াএফ এসেছে। যেন বেহেস্তের হুরি আর তার নাচ...'

মুইজ উদ্দিন বললেন, 'তাহলে চলে দেখে আসি।'

'... আর খুব তেজী মেয়ে। কাউকে পাত্তা দেয় না।'

দিনে দিনে শাহজাদার কৌতূহল বাড়ে। রংমহলে ডেকে পাঠিয়ে নাচ দেখেন বাদশাহ। শাহজাদারা যেতে পারেন যত্রতত্র। একরাত্রে তাঁকে দেখা গেল চকের গলিতে। কোঠিওয়ালি তসলিম জানিয়ে বলল, 'আমার কি সৌভাগ্য আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল এ বাড়িতে।'

মুইজ উদ্দিন হেসে বললেন, 'তুমি নাকি একটা হিরের টুকরো লুকিয়ে রেখেছ তোমার বাড়িতে। তাই দেখতে এলাম।'

'সে তো আপনাদেরই খিতমদের জন্য হুজুর। কিন্তু সত্যিই সে সাচ্চা হিরে।'

'দেখা যাক।'

হঠাৎ মুইজ উদ্দিনের মনে হল ঝড়ের উজ্জ্বল বাতিগুলো ম্লান হয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখলেন, তা নয়, ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নর্তকী। মুঘল

শাহজাদা তিনি। অজস্র রূপসী দেখেছেন কিন্তু এই মেয়েটির সমতুল্য কোন মেয়ে কখনও চোখে পড়েনি। বন্ধুরা ঠিকই বলেছিল। তারা সাবধান করে বলে দিয়েছিল, মেয়েটি দারুণ নাচে ঠিকই কিন্তু ধরা দেয় না, কোমরে জড়িয়ে রাখে লিকলিকে সরু চাবুক। কেউ বেতমিজ হলে তাকে চাবুক মারে। লালকুঁয়রকে দেখে সব কথাই একসঙ্গে মনে পড়ে গেল।

কোঠিওয়ালি বলল, 'লাল, আজ শাহজাদা আমাদের মেহমান। তোমার নাচ দেখতে এসেছেন। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তুমি ওঁকে খুশি করতে পারবে বেটি।'

শাহজাদা? মুঘল শাহজাদা এসেছেন? বহুদিন ধরে লালকুঁয়রের স্বপ্ন কোন শাহজাদার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা। তারপর সেই সোপান বেয়ে ক্রমশ ওপরে ওঠা। লালকুমারীর পূর্ব ইতিহাস একেবারে অন্ধকার নয়। সঙ্গীত ছিল তাঁর রক্তে। জনশ্রুতি সঙ্গীত সম্রাট তানসেন তাঁর পূর্বপুরুষ। পিতার নাম গোলাম আলি, সঙ্গীত ঘরানার আভিজাত্যে ছিল তাঁর স্বভাবিক অধিকার। কিন্তু তিনি কিভাবে পেশাদার নর্তকী হয়ে কোঠিতে এলেন কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেন, অন্যান্য নর্তকীদের মতো কোন দুঃখের স্মৃতি, অপহরণ, হাতবদলের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি তাঁর ছিল না। অপরূপ রূপসী বলে শৈশবেই তাঁর মনে উচ্চাশা জেগেছিল, তাঁকে পৌঁছোতে হবে সিংহাসনের কাছাকাছি, হতে হবে বেগম কিংবা বাদশাহের প্রিয়তমা সঙ্গিনী। এই দুরাশাই তাঁকে টেনে এনেছিল নর্তকী-জীবনে। ইচ্ছে করেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এক নর্তকী শিক্ষয়িত্রীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেছে নিয়েছিলেন কষ্টের জীবন। সত্য-মিথ্যা জানার কোন উপায় নেই।

লালকুঁয়রের স্বপ্ন বুঝি সাফল্যের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তিনি সেদিন নাচলেন। অমন নাচ শাহজাদা মুইজ উদ্দিন কোনদিন দেখেননি। লালকুঁয়রের নাচ দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল, এই নারীটির জন্যই তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। একে পেলে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে তিনি লালকুঁয়রকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললেন। নাচ শেষ হলে মুগ্ধ হৃদয়টিকে ছুঁড়ে দিলেন লালকুঁয়রের পায়ে। বললেন, 'ফিরিয়ে দিয়ো না আমায়।'

মধুর হেসে মুইজ উদ্দিনকে বিভোর করে দিয়ে লালকুঁয়র বললেন, 'জাঁহাপনা, আমি আপনার খাদিমা।'

ভুল শুধরে দিলেন মুইজ উদ্দিন, 'আমি জাঁহাপনা নই প্রিয়া। আমি শাহজাদা।'

আরও মধুর হেসেছিলেন লালকুঁয়র, 'আমার জাঁহাপনা আপনিই।'

মুইজ উদ্দিনের মনে হল, এই নারী যদি তাঁর সিংহাসন এমন কি জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলে তবুও তিনি কোন আপত্তি জানাবেন না। বললেন, 'শাহী তখ্‌তের চেয়েও তুমি অনেক দামি।'

লালকুঁয়র হিসাব করে চলতে জানেন। উচ্চাশা তাঁর প্রচণ্ড। কিন্তু তাঁরও শাহজাদাকে খুব ভালো লেগে গেল। তিনি হেসে বললেন, 'আপনার অনুগ্রহ যতদিন আমার ওপর থাকবে জাঁহাপনা, ততদিন এই খাদিমা আপনার সেবা করবে।'

'যতদিন? আমার আনুগত্য সারা জীবনের লালকুঁয়র।'

'আমিও আপনার সেবা করব জাঁহাপনা। সারাজীবন আমি আপনার খদিমা।'

কোঠির সকলে অবাক হয়ে গেল। কি হল মেয়েটার? তেজস্বিনী হঠাৎ শাহজাদার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসল কেন? এর নামই কি প্রেম? গভীর ভালোবাসায় নিজেদের নিয়ে সব কিছু ভুলে যান দুজনে। মুইজ উদ্দিনের বেগম ও পুত্রেরা আর তাঁর দর্শন পান না। যদিও শাহজাদারা এরকমই তবু শাহী হারেমে মেঘ জমে ওঠে লালকুঁয়রের অজ্ঞাতে।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে শুরু হয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। মধ্যম ভ্রাতা আজিম-উস-শান অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন মুইজ উদ্দিনের চেয়ে। তবু আমির-ওমরাহরা বিশেষ করে সেনাপতি জুলফিকর খাঁয়ের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মুইজ উদ্দিনই জিতলেন। লাহোরের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন লালকুঁয়র। বলেছিলেন, 'আমিও যাব প্রিয়তম।'

'নিশ্চয়, তোমাকে না দেখে যে আমিও থাকতে পারি না। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে যে।'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

'হলেও আমার যুদ্ধে না গিয়ে উপায় নেই। শাহজাদা হয়ে জন্মানোর অভিশাপ থাকবেই।'

'ওকথা বলছেন কেন? মানুষ বহু ভাগ্যে রাজার ঘরে জন্মায়। আর আপনি তো বাদশাহের বড় ছেলে। শাহী তখ্‌তে বসবেন।'

'শাহী তখ্‌ত আমাকে টানে না লালকুঁয়র, যতটা টানো তুমি।'

'আমার সৌভাগ্য।' লালকুঁয়র মনে মনে হয়ত ভাবেন, 'এই সিংহাসনের টানেই তো আমি আজ এখানে।'

'তোমার জন্যে আমি তখ্‌ত-এ-তাউস ছাড়তে পারি প্রিয়তমা।'

'আমি বুঝি জাঁহাপনার জীবনে উন্নতির পথে বাধা?'

'তা কেন হবে? আমি শুধু বলছি, আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে ভালোবাসব।'

লালকুঁয়রের সুর্মা পরা চোখে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। দুষ্টু হেসে বলেন, 'যদি প্রমাণ চাই?'

'কি প্রমাণ দেব বল?'

'যখন যা চাইব দেবেন তো?'

'জান কবুল।'

লাহোরে শেষ পর্যন্ত মুইজ উদ্দিন জিতেছিলেন তাঁর সেনাপতির জন্য। কিন্তু লালকুঁয়র তিক্ত স্মৃতি নিয়ে ফিরেছিলেন। মুইজ উদ্দিনের হাতির পাশাপাশি একটা ছোট হাতিতে সওয়ার হয়েছিলেন। পর্দাঢাকা হাওদায় বসেছিলেন তিনি। একা। হঠাৎ কী যে হল, শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলল তাঁদের। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লালকুঁয়র পর্দা,

বোরখা ফেলেই ছুটে পালাতে গেলেন, ধরা পড়লেন রুস্তম দিল খাঁর হাতে। অত্যন্ত দুর্বৃত্ত প্রকৃতির রুস্তম কেড়ে নিয়েছিল তাঁর গয়না, এমনকি যখন তাঁর পাজামার মুক্তোবসানো নায়ার বা দড়ির দিকেও সে হাত বাড়াল তখন বড়ই অসহায় বোধ করলেন লালকুঁয়র। সেই অপ্রত্যাশিত বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই তাঁকে উদ্ধার করে মুইজ উদ্দিনের দলের সৈন্যরা।

মুইজ উদ্দিন সব কিছু ফেলে ছুটে এলেন লালকুঁয়রের কাছে। শাহজাদাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন লালকুঁয়র। যুদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল না। সান্ত্বনা দিলেন শাহজাদা, 'আর ভয় নেই। আমরা জিতেছি।' বাকি রাতটুকু তাঁরা কাটালেন খুশির মেজাজে।

সম্রাট হয়ে মুইজ উদ্দিন হলেন জাহান্দার শাহ অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের মালিক। আনন্দে আপ্লুত হয়ে লালকুঁয়র সম্রাটকে অভিবাদন জানালেন, 'আজ আমার স্বপ্ন সফল হল জাঁহাপনা। আজ আপনি তখ্‌ত-এ-তাউসের অধিকারী হয়েছেন।'

'পিয়ারী তুমি কি চাও?'

'আপনার খাদিমা হয়ে থাকতে চাই জাঁহাপনা।'

'খাদিমা'? অবাক হয়ে যান জাহান্দার শাহ, তিনি যে প্রিয়তমাকে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত আর লালকুঁয়র শুধু চান তাঁর দাসী হয়ে থাকতে? এত ভালোবাসেন তাঁকে? তিনি ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় মোটেই হারতে চান না। বললেন, 'আজ থেকে তুমি হলে বেগম ইমতিয়াজ মহল।'

'জাঁহাপনা। কী বলছেন আপনি? আমি বেগম?

'ই-ম-তি-য়া-জ ম-হ-ল। জেনান হারেমের সর্বেসর্বা হলে তুমি। বছরে তোমার মহলের জন্য বরাদ্দ থাকবে দু কোটি টাকা। বল আর কি চাও?'

'আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি না তো জাঁহাপনা? সত্যিই আপনি আমার স-ব ইচ্ছে পূর্ণ করবেন?'

'ইচ্ছে প্রকাশ কর আগে। তারপর দেখ, পূর্ণ হয় কি না।'

'আপনি আমার বন্ধু-বান্ধব ভাইয়েদেরও মেহেরবানি করে সুখে রাখবেন।'

হেসে উঠলেন নবীন সম্রাট। তাঁর প্রিয়তমা বড় বোকা, বড় ভলোমানুষ। সব সময় পরের কথা ভাবে। ওকে খুশি করে দেবেন তিনি। ও যা চায় তাই দেবেন। যখন তিনি সর্বস্ব দিতে রাজি তখনও ও চাইছে সামান্য অনুগ্রহ। বললেন, 'যা চাও সবই পাবে। তোমার বন্ধুদের ডাক। আর তুমি কি চাও তাও বলো।'

একে একে নতুন বাদশাহের চারপাশে জমা হলেন কিছু মামুলি মানুষ—সারেঙ্গি বাদক, তবলচি, সবজিওয়ালি, বেশ্যাদের নৃত্যশিক্ষক, কোঠেওয়ালি শিক্ষিকা এবং এদের সমগোত্রীয় আরও অনেকে। বেগম ইমতিয়াজ মহল সবার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'এরা সবাই আমার বন্ধু।'

জাহান্দার শাহ বললেন, 'আমি এঁদের কোন অভাব রাখব না।'

পরদিনই কথা রাখলেন জাহন্দার শাহ। প্রচুর পারিতোষিক, হাতি, ঘোড়া, নালকি,

পালকি, উপাধি এমন কি ওমরাহের পদ খোলামকুচির মতো বিলিয়ে দিলেন বাদশাহ্। বলা বাহুল্য জাহান্দার শাহের প্রকৃত হিতৈষীরা লালকুঁয়রের ওপর অত্যন্ত চটে উঠলেন। চুঘতাই বংশের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গেল। নিয়ম ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাদশাহ্ বা শাহ্জাদাদের কোন যোগ থাকবে না। সেই নিয়ম মেনেই বড় হয়েছিলেন জাহান্দার শাহ কিন্তু প্রেম তাঁকে নিয়ে এল অতি অপদার্থ কতকগুলি মানুষের মাঝখানে। শুধুমাত্র লালকুঁয়রের জন্য।

আসলে ভালোমন্দ বিচার করার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না লালকুঁয়রের। তিনি রূপসী, অসাধারণ শিল্পী কিন্তু শিক্ষা ও রুচিবোধের অভাবে ছিল বলে তাঁর প্রেম জাহান্দার শাহকে ক্রমেই বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। জুলফিকর খাঁ ও অন্যান্য আমীর ওমরাহেরা দেখলেন, কিছুমাত্র যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও লালকুঁয়রের ভাই খোশাল খাঁ পেলেন হপ্তাহাজারি মনসবদারের পদ আর অতি অযোগ্য হয়েও লালকুঁয়রের দুধভাই পেলেন আমীরুল ওমরার পদ। এটি সাম্রাজের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদ। লালকুঁয়রকে খুশি করার জন্য বাদশাহ্ প্রতিদিনই তার বেতন ও ক্ষমতা বাড়ালেন। দেখে শুনে গা জ্বলে গেল সকলের। ঔরঙ্গজেবের কন্যা জিন্নতউন্নিসা তখনও জীবিত, অত্যন্ত বিরক্ত হলেন তিনিও। বিশেষ করে জাহান্দার শাহ্ বেশ কয়েকজন ভাই ও তাঁদের পুত্রদের হত্যার আদেশ দিয়ে সিংহাসন নিষ্কন্টক করতে চাওয়ায় অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল। অবশ্য এটি ছিল শাহী দস্তুর।

কিন্তু দস্তুর মেনে তো জাহান্দার শাহ্ চলেননি। এই সব সারেঙ্গিওয়ালা, তবলচি, তানপুরাবাদক, সানাইবাদক, বাঁশিওয়ালাদের যাবতীয় মানসম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালকুঁয়রের আগ্রহে তিনি এদের সঙ্গে পান-ভোজনে যোগ দিতেন। মাত্রা ছাড়িয়ে এই মানুষগুলি নেশার ঘোরে নিজেদের সঙ্গে মারামারি করত তেমনই হাসিঠাট্টার মধ্যে কান মুলে দিত বাদশাহের। জাহান্দার শাহ্ কখনও এসবের প্রতিবাদ করেননি। হয়ত তাঁর ভালোই লাগত এদের সাহচর্য। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা সব দোষটাই চাপিয়ে দিয়েছেন লালকুঁয়র ও তাঁর সঙ্গীদের ওপরে। কিছু কিছু কলকাঠি যে লালকুঁয়র নাড়তেন না তা নয়। তিনি বাদশাহ্কে ক্রমেই তাঁর আত্মীয়দের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন। সব নারীই কি চায় না তার ভালোবাসার মানুষটি একান্তভাবে তারই থাকুক। লালকুঁয়রও চাইতেন। জাহান্দার শাহের পুত্রদের ও পত্নীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন তিনিই। ছেলেরা চিরকালের মতো সরে যান বাদশাহ্ পিতার কাছে থেকে। সবচেয়ে ছোট দুজনকে লালকুঁয়রই পাঠান কারাগারে। অথচ জাহান্দার শাহ্ নাকি তাঁর পুত্রদের ভালোবাসতেন। মা হবার সাধ ছিল লালকুঁয়রেরও। সব কিছু পেয়েছেন একটি সন্তান কি পাবেন না? যে হবে জাহান্দার শাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মনের বাসনা জানান সম্রাটের কানে কানে।

'জাঁহাপনা, আমাকে এবার চিরাগ-এ-দিল্লিতে নিয়ে যাবেন?'

'তুমি তো জানো, তোমাকে আমি কোন কিছু নিষেধ করিনি। হুকুম দিয়েছি তামাম

হিন্দুস্থানের বাদশাহের মতোই তুমি রাজছত্র মাথায় দিয়ে রাজহাতির পিঠে চেপে যেখানে খুশি যেতে পারো।'

কথাটা মিথ্যা নয়। এতদিন এই রাজছত্র মাথায় দিয়ে বেরোতে পারতেন শুধু বাদশাহ। কিন্তু এখন সে গৌরবের অধিকারিণী লালকুঁয়রও। তাঁর ভালোবাসার আবদারে জাহান্দার শাহের স্বর্ণমুদ্রায় ইমতিয়াজ মহলের নাম। কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই তিনি বাদশাহের প্রধানা বেগম।

লালকুঁয়র বললেন, 'না জাঁহাপনা, আপনি আমার কোন অভাবে রেখেছেন তা বলিনি। আমি নাসিরুদ্দিন আউধির দরগায় যেতে চাই আপনার সঙ্গে। আমি মা হতে চাই জাঁহাপনা। আপনার সন্তানের মা হতে চাই আমি। আমরা দুজনে যাব সেই দরগায়। নিয়ে যাবেন তো আমাকে?'

'সন্তান?' জাহান্দার শাহের মনে পড়ে যায় পুত্রদের কথা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায় বুক চিরে। তারা সব কোথায়? সেটুকু নিপুণ হাতে মুছে দিতে চান লালকুঁয়র। তাঁর কথা ছাড়া জাহান্দার শাহ আর কারোর কথা ভাববেন সেটা সহ্য হয় না তাঁর।

জাহান্দার শাহ অবশ্য খুশি মনেই রাজি হলেন। বললেন, 'আমি তোমার দরগায় নিয়ে যাব বেগম। যদি দরবেশের মেহেরবানিতে তোমার সন্তান হয় তাহলে সেই বসবে শাহী তখ্‌তে।' খুশির জোয়ারে ভেসে যান লালকুঁয়র। গরুর গাড়ি সাজাতে বললেন। তিন ক্রোশ পথ। শাহী খানদানের অনেক কিছুই বদলে দিয়েছিলেন লালকুঁয়র। রাজছত্রধর হাতি চড়ার অধিকার পেলেও সাধারণ মানুষের মতো গরুর গাড়ি চড়তে ভালোবাসতেন তিনি। মাঝে মাঝে সম্রাটের সঙ্গে গরুর গাড়ি চেপে বাজার করতেও বেরোতেন। প্রজারা হেসে আকুল হত। হাতি-ঘোড়া-পালকি নালকি ছেড়ে কি না গরুর গাড়ি। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত আমীর ওমরাহদের। তাঁরা শুনেছিলেন সুলতানি আমলে সুলতান কুতুবুদ্দিন শাহ মুবারকের পিয়ারি তওয়ায়েফ তওবার কথা। সে নাকি দরবারে চলে আসত নির্লজ্জের মতো, কোন কোনদিন সামান্য একগাছি সুতোও থাকত না তার দেহে। নানাভাবে অপমান করত ভদ্র ব্যক্তিদের। জাহান্দার শাহ কিংবা লালকুঁয়র সেই পর্যায়ে একদিন চলে যাবেন কি না সে ভয়ও তাঁদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। বিশেষ করে লালকুঁয়রের বন্ধু-বান্ধবেরা প্রচুর অর্থ ও খেতাব পেয়ে শালীনতার সীমা ছাড়াচ্ছিলেন। পানোন্মত্ত মাতালের হাতে বাদশাহের শারীরিক নিগ্রহের কথা শুনেও তাঁরা মর্মাহত হয়েছিলেন। অথচ করবার কিছুই ছিল না।

প্রতি রবিবার চিরাগ-এ-দিল্লিতে যেতেন লালকুঁয়র। নগ্ন হয়ে স্নান করতেন সেখানে, প্রবাদ সেখানে স্নান করলে পুত্রবতী হয় মেয়েরা। একটি দুটি নয়, পরপর চল্লিশটি রবিবার জাহান্দার শাহ লালকুঁয়রকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। হয়ত সুযোগ পেলে আরও অনেকবার নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে লালকুঁয়রের শখ হত মাতাল হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো রাজপথে ঘুরে বেড়াতে। বাদশাহ তাঁর সে ইচ্ছাও পূর্ণ করতেন পায়ে হেঁটে বেরিয়ে। একটা খুশির হিল্লোল বয়ে যেত যেন। তিনি বারবার বলতেন, 'তোমার সঙ্গ পেলে আমি বেহেস্তেও যেতে চাই না পিয়ারি।'

লালকুঁয়র বাদশাহের হাতটা চেপে ধরেন। সুখ। সুখ। সুখের সাগরে ভাসছেন তিনি। কখনও মনে হয় না, এত সুখ সইবে তো? জীবনটা যেভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই গড়েছেন তিনি। এক সাধারণ মেয়ে হয়েও স্বপ্ন দেখেছিলেন অসামান্য জীবনের, সে স্বপ্ন তো সফল হয়েছে। বলেন, 'আমি বেগম হয়েছি জাঁহাপনা। এই শহরই আমার কাছে বেহেস্ত, আপনি আমাকে সব কিছু দিয়েছেন। স-ব কিছু।'

সাধারণ মানুষের মতো শুধু প্রেমের জোয়ারে ভাসলে বাদশাহের জীবন চলে না। বিশেষ করে ওমরাহদের বিরক্তি যখন ধুঁইয়ে ওঠে। লালকুঁয়রের এক অপদার্থ ভাই হয়েছিলেন পাঁচহাজারি মনসবদার। তাঁকে আরও কিছু পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে দেওয়া হল এক বিখ্যাত আমিরের সুবেদারি। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হল নতুন উপায়ে। উজির জানালেন, দফতর খরচ না পেলে তিনি শীলমোহর দিয়ে নতুন আদেশ মঞ্জুর করতে পারবেন না। কত খরচ? পাঁচ হাজার তানপুরা ও সাত হাজার ঢাক। বেশ বোঝা গেল নতুন সুবেদার খোশাল খাঁয়ের পূর্বজীবনকে ব্যঙ্গ করাই এ দাবির উদ্দেশ্য। খোশাল খাঁ নালিশ করলেন বোনকে, তিনি আবার বাদশাহকে। বাদশাহ উজিরকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন, কেন না এই জুলফিকর খাঁয়ের জন্যই তিনি সিংহাসন পেয়েছেন। তাঁকে ডেকে বললেন, 'আপনি এমন অসঙ্গত দফতর খরচ চেয়েছেন শুনলাম। আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করেছেন কিন্তু খোশাল খাঁ খুবই আহত হয়েছেন।'

উজির গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি মোটেই ঠাট্টা করিনি জাঁহাপনা। আপনার গোলাম আমিরেরা পুরুষানুক্রমে বাদশাহের সেবা করে সুবেদার, মনসবদার প্রভৃতি পদ পেয়েছে আর আপনার শাসনকার্যে সহায়তা করেছে। আর নর্তকী ও গায়কদের কাজ ছিল চিত্তবিনোদন করা। তাদের দেওয়ার হত বৃত্তি এবং পারিশ্রমিক। এভাবেই আপনার পূর্বপুরুষের নিয়ম তৈরি করেছিলেন। এখন সে নিয়ম ভেঙে আপনি যদি শাসক-সুবেদারদের পদচ্যুত করে বৃত্তিভোগীদের আমিরের পদ দেন তাহলে আমিরদেরও তো কিছু করতে হবে। তাই তাদের বিলি করবার জন্য এই তানপুরা আর ঢাক চেয়েছি। আপনার পদচ্যুত সেনাপতি, মনসবদার, সুবেদারদেরও তো জীবিকার্জনের অধিকার আছে। তাঁরা আর কোন বৃত্তি গ্রহণ করবেন? যাঁরা ওইসব বৃত্তি ছাড়ছেন, ছেড়ে আমির হচ্ছেন সেইসব বৃত্তিই তো। আমি সেইজন্য এইসব বাদ্যযন্ত্র কিনতে চেয়েছি।'

উজিরের কথা শুনে বাদশাহের মুখটা লজ্জায় নেমে এল বুকের কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের ভুল কোথায়। ব্যাপারটা সেখানেই ভালোভাবে মিটে গেল। খোশাল খাঁ তাঁর বোনকে কি বললেন বা লালকুঁয়র কি বললেন বাদশাহকে কেউ জানে না। ছোটখাটো অশান্তি লেগেই রইল। লালকুঁয়রের আর এক প্রাণের বান্ধবী ছিলেন সবজিওয়ালি জোহরা। অনেক পারিতোষিক পেয়ে সে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন তার সঙ্গে বিরোধ বাধল চিনকিলাজ খাঁয়ের। তাঁর মতো মানী লোক দিল্লিতে বেশি ছিল না। তিনি কখনও দরবারে আসতেন না। এইসব অনাচারের খবর শুনে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিলেন। একদিন পথের ওপর

চিনকিলাজ খাঁ চলেছেন তাঁর অনুচরদের নিয়ে এমন সময়ে সেই পথের বিপরীত দিক থেকে জোহরা এল হাতি চড়ে, লোক লস্কর নিয়ে চিনকিলাজ খান তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের অনুচরদের একপাশে সরে দাঁড়াতে বললেন। কিন্তু জোহরার লোকেরা ভাবল খাঁসাহেব ভয় পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। তারা তাঁর অনুচরদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে শুরু করল। স্বয়ং জোহরা বলে বসল, 'পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন? আপনার বাবাও বোধহয় অন্ধ ছিলেন। তাই এ দশা।'

পথের ওপরে এইরকম গায়ে পড়ে অপমান করায় রেগে আগুন হয়ে চিনকিলাজ খাঁ অনুচরদের আদেশ দিলেন জোহরার দলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জোহরার দল ছত্রভঙ্গ হল আর জোহরাকে হাতির পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হল। উজির চিনকিলাজের পক্ষ নিলেন। লালকুঁয়র জোহরার। কিন্তু জাহান্দার শাহ উজিরের বিরুদ্ধে গেলেন না। লালকুঁয়রের এক ভাই অর্থ ও প্রতিপত্তি পেয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন এক ভদ্রলোকের রূপসী স্ত্রীর দিকে। অনুরোধ ও উপহার পাঠিয়ে কোন ফল হল না দেখে সে বলপ্রয়োগ করার চেষ্টা করল। মহিলাটির স্বামী বাস করতেন উজিরের প্রাসাদের কাছেই। তিনি ছুটে গেলেন সাহায্যের জন্য। জুলফিকর খাঁ তৎক্ষণাৎ সেই দুর্বৃত্তকে বন্দি করে সেলিমগড়ে আটক করলেন। জাহান্দার শাহকে নিরুপায় হয়েই এবারও উজিরের রায় মেনে নিতে হল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সহজ সম্পর্কটুকু আর রইল না। সমকালীন ঐতিহসিকেরা এজন্যে লালকুঁয়রকেই দায়ী করছেন। কিংবা তাঁদের সর্বনাশা প্রেমকে।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, জাহান্দার শাহ অপদার্থ শাসক ছিলেন ঠিকই কিন্তু আমির ওমরাহদের অপ্রিয় ছিলেন না। লালকুঁয়রের বন্ধুবান্ধবদের দরাজ হাতে দান খয়রাত করেই তিনি আমিরদের বিরাগভাজন হন। বলা বাহুল্য এঁদের পক্ষপাতিত্ব আমিরদের প্রতি থাকায় লালকুঁয়রকে সব সময়েই বিকৃতভাবে আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যিই তিনি কতটা ক্ষমতালোভী বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বোঝার উপায় নেই। আবার যুদ্ধ শুরু হল। আগ্রার কাছে সামুরাইয়ের যুদ্ধ। আজিম-উসসানের পুত্র ফারুকশিয়ারের সঙ্গে। কয়েকটা দিন কেটে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। জাহান্দার শাহ লালকুঁয়রকে না দেখে থাকতে পারেন না বলে তিনিও এসেছেন। যদিও যুদ্ধের কদর্য অভিজ্ঞতা লালকুঁয়রকে যুদ্ধ সম্পর্কে ভীত করে তুলেছিল। আসতে তিনি চাননি আবার জাহান্দার শাহকে একা ছেড়ে দিতেও পারেননি। মেনে নিয়েছিলেন বাদশাহের ইচ্ছেকেই।

১৭১৩ সালের দশই জানুয়ারি। যুদ্ধক্ষেত্রে জাহান্দার শাহের অবস্থা খারাপ ছিল না। তিনি হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ হাতিটা আহত হল। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হল। জাহান্দার শাহ তৎক্ষণাৎ একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু ছাউনিতে বসে এই খবর পেয়ে লালকুঁয়র ছুটে এলেন বাদশাহের কাছে। ভয়ে পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন,'জাঁহাপনা, আপনি

আর যুদ্ধে যেতে পারবেন না। হাতির বদলে যদি আপনার গায়ে আঘাত লাগত, কি সর্বনাশ হত তা হলে।'

জাহান্দার শাহ হাসলেন, 'প্রিয়তমা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। তুমিও তা জানো, কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। জুলফিকর খাঁ একা লড়ছেন।'

'তিনি তো সেনাপতি। বড় যোদ্ধা। না জাঁহাপনা, চলুন আমরা পালিয়ে যাই।'

জাহান্দার শাহ জানতেন সম্রাটের জীবনে শুধু ভোগ নয়, যুদ্ধও আছে। তিনিও নন আমজনতার একজন। বললেন, 'পালিয়ে যাব? যুদ্ধ থেকে? আমাকে এখনই পৌঁছোতে হবে জুলফিকার খাঁয়ের কাছে। আমার বড় ছেলেও লড়ছে।'

'কিন্তু আপনাকে আমি যেতে দেব না।'

'হাতির গায়ে চোট না লাগলে এতক্ষণে হয়ত আমরা সুবিধেজনক অবস্থায় পৌঁছে যেতাম বেগম, অবস্থা এখনও হাতের বাইরে যায়নি। আমায় যেতে দাও।'

লালকুঁয়র দেখলেন সুসজ্জিত অশ্বও তৈরি, এখনই বাদশাহকে নিয়ে উড়ে চলে যাবে তাঁর নাগালের বাইরে। হয়ত জুলফিকর খাঁয়ের কাছে। কিন্তু তার আগেই যদি আর একটা গুলি এসে লাগে। শিউরে উঠলেন। মনে পড়ে গেল লাহোরের যুদ্ধের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। বললেন, 'না জাঁহাপনা। আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। গেলে আমি মরে যাব, এই খঞ্জর আমার বুকে বসিয়ে দিন, তারপর যেখানে খুশি যান।' নিটোল মুক্তোর মতো অশ্রু করে পড়ে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ থেকে।

আর সেদিকে চেয়েই বিমনা হয়ে ওঠেন জাহান্দার শাহ, 'তাই হবে পিয়ারি। তুমি যা চাও তাই হবে। কোন দিন তোমার কথা রাখিনি বল?'

চোখের জল মুছে লালকুঁয়র হাসলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। একখানা সাধারণ গরুর গাড়িতে চাপলেন দুজনে। কিছু অনুগত মানুষকে নিয়ে তাঁরা চললেন দিল্লির দিকে। তাঁদের সঙ্গের লোকেরা সাধারণ মানুষ হলেও বাদশাহকে ভালোবাসত। প্রথম রাতটা তাঁরা কাটালেন আকবরাবাদে। সাধারণ মানুষের পোশাক তাঁদের। দিল্লির বাদশাহ কি এভাবে আত্মগোপন করতে পারেন। আভিজাত্য তাঁর রক্তে, দেহসুষমায়। জাহান্দার শাহ অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন।

লালকুঁয়র বললেন, 'জাঁহাপনা, লুকিয়ে পড়ার জন্যে আপনাকে চুল দাড়ি কাটতে হবে। গরিব মানুষের বিশেষ করে হিন্দুদের মতো ছোট করে চুল কাটলে আপনাকে আর কেউ চিনতে পারবে না।'

জাহান্দার শাহের মনে আর কোন উত্তেজনা ছিল না। তিনি নিজেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। অনাগত ভবিষ্যৎ আর অস্পষ্টও নয়। এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন ক্ষৌরকর্মে। একজন অতি সাধারণ হিন্দু দরিদ্রের মতো সাজপোশাক পরে তিনি হেসে লালকুঁয়রকে বললেন, 'পিয়ারি, তুমি কি আমাকে এইভাবেই দেখতে চেয়েছিলে? নাও তোমার সেই ইচ্ছেও পূর্ণ হল।'

অনেকে বলেন, লালকুঁয়র হিন্দু ছিলেন, সম্রাটও তাই হিন্দু সাজলেন। এ কথা ঠিক নয়। লালকুঁয়র হিন্দু ছিলেন এমন কোন প্রমাণ মেলে না। আবার তিনি সত্যিই মিঞা

তানসেনের বংশধর ছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। একটি সাধারণ মেয়ের মতোই তিনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলেন, সম্রাটকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে নতুন করে জীবনে শুরু করার। কতই বা বয়স তাঁর? পঁচিশের আশেপাশে। স্বপ্ন দেখার সাহস তাঁর ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর সত্যের সামনে দাঁড়াবার সাহস তাঁর ছিল না।

'দিল্লিতে না গিয়ে আমরা যদি দূরের কোন গ্রামে চলে যেতে পারতাম।'

'তাহলেও ধরা পড়তাম।'

'কি করে?'

'তোমার ওই রূপ। সবাই চিনে ফেলবে। তোমার পক্ষে দিল্লিই নিরাপদ।'

'আপনার পক্ষে?'

'কোথাও নয়। তবু যদি আসাদ খাঁয়ের কাছে পৌঁছোতে পারি, তিনি আমাকে ফেরাবেন না।' আসাদ খাঁ জুলফিকর খাঁয়ের বৃদ্ধ পিতা।

'আমরা দিল্লিতে কখন পৌঁছোব?'

জাহান্দার শাহ হেসে উঠলেন, 'গরুর গাড়ির গাড়োয়নাকে জিজ্ঞেস কর। হাতি ঘোড়ার চালের আন্দাজ একটা আছে। গরুর গাড়ি কথা বলতে পারি না। দিল্লির গরুর গাড়ির কথা মনে আছে? বেশ দৌড়তো।'

'এতো সাধারণ গরুর গাড়ি। কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি এমন করে দিল্লির কথা বলছেন যেন সে অনেক দিনের পুরনো কথা। অথচ এই সেদিনও আমরা দরগায় গিয়েছি। হাটে গিয়েছি গরুর গাড়ি চেপে...'

মনের দুর্ভাবনা মনে চেপে জাহান্দার শাহ বললেন, 'সব এখন অতীত। তবু আমি পরম সৌভাগ্যবান, এখন তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। জীবনের শেষ পর্যন্ত যেন তোমার সান্নিধ্য পাই।'

দিল্লি ফিরে জাহান্দার শাহ কেল্লায় প্রবেশ করলেন না। লালকুঁয়রকে নিয়ে গেলেন তাঁর পুরনো কোঠায়। বললেন, 'এখানে তুমি নিরাপদ।' কোঠার মানুষেরা সবাই লালকুঁয়রকে ভালোবাসতেন। লালকুঁয়রকে যত্ন করে লুকিয়ে রাখলেন। জাহান্দার শাহ গেলেন আসাদ খাঁর কাছে। তাঁর সেনাপতি জুলফিকর খাঁ তখনও লড়ে যাচ্ছেন। বাদশাহের পুত্র আয়ুজুদ্দিনও আছেন সেখানে। তবু যখন শুনলেন, যার জন্য যুদ্ধ তিনিই নিখোঁজ তখন তাঁকে থামতে হল। অপরদিকে জাহান্দার শাহ আসাদ খাঁর প্রাসাদে আসামাত্রেই তিনি তাঁকে বন্দি করে নতুন বাদশাহের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। জুলফিকর খাঁ চেয়েছিলেন আবার জাহান্দার শাহকে নিয়ে ফারুকশিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আসাদ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তা আর হল না। তাঁর ভুলের মাশুল দিলেন তাঁর পুত্র জীবন দিয়ে। বৃদ্ধ নিজেও হারিয়েছিলেন অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, পুত্র সব কিছু।

জাহান্দার শাহকে নিয়ে যাওয়া হল শাহজাহানাবাদের দুর্গের কয়েদখানায়। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। চমকালেন না ভাগ্যবিপর্যয়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, বন্দিদশায় কী চান তিনি? কতটুকু সাচ্ছন্দ? নিরাভরণ কর্কশ কয়েদখানার শ্রীহীনতা

চোখে পড়ে। জাহান্দার শাহ কিছুই চাইলেন না, শুধু বললেন, 'লালকুঁয়রকে।'

লালকুঁয়রও জাহান্দার শাহকে বন্দি করার খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন। কোথায় সেই দাপুটে বেগম কিংবা ছলাকলা জানা তেজস্বিনী নর্তকী? চোখের জল ফেলে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'আমাকে তাঁর কাছে যেতে দিন। আর কিচ্ছু আমি চাই না।' অনুমতি পেয়েছিলেন লালকুঁয়র। 'বাদশাহের সঙ্গে বন্দিশালায় যদি কাটাতে রাজি থাক তাহলে আপত্তি নেই।'

'রাজি।' লালকুঁয়র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'বহুত মেহেরবানি আপনাদের।' কয়েদখানায় দেখা হয় দুজনের। জাহান্দার শাহ বলেন, 'আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমার শেষদিন পর্যন্ত আমি যেন তোমায় কাছে পাই।'

'জাঁহাপনা, আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি আপনার খাদিমা হয়ে থাকব।'

'তোমার জীবনের অনেক বাকি পিয়ারি।'

'ও কথা বলবেন না জাঁহাপনা। আপনার জীবনই আমার সব।'

গুমোট কয়েকদখানায় সম্রাটের জীবনের শেষ কটা দিন চোখের জলে ধুয়ে সেবায় সাহচর্যে মধুর করে তুললেন লালকুঁয়র। সে আর কটা দিন? প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর ভয়ে ভাবনায় কাটত। হয়ত প্রাণটুকু ভিক্ষা দেবেন নতুন বাদশাহ, তাঁর আপন ভাইপো। লালকুঁয়র বুঝেও বুঝতেন না, সম্রাটের কোন আপনজন থাকে না। জুলফিকর খাঁকে যেদিন হত্যা করা হল সেদিনই শাহজাহানাবাদ দুর্গেও কয়েকজন হত্যাকারী এল। অসময়ে তাদের কয়েদখানায় প্রবেশ করতে দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন লালকুঁয়র। তারা তাঁকে বলল, 'আপনি এখান থেকে চলে যান।'

জাহান্দার শাহ উঠে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে আছেন দেয়ালে ঠেসান দেওয়া লালকুঁয়রের পাথর হয়ে যাওয়া মুর্তিটির দিকে। হয়ত কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু তার আগেই চামড়ার সরু ফালি পিছন থেকে ফাঁসের মতো পরিয়ে দিয়ে হত্যাকারীরা তাঁকে হত্যা করল। তাঁর দেহটা টেনে নিয়ে যায়। সেদিন বিজয় মিছিল বেরোল হাতির পিঠে জাহান্দার শাহের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে, মাথাটি কেটে বর্ষায় গেঁথে আর হাতির লেজের সঙ্গে বাঁধা রইল জুলফিকর খাঁর মৃতদেহ। তার পিছনে পালকিতে বসিয়ে আসাদ খাঁকেও নিয়ে যাওয়া হল। সমস্ত ঘটনার ভয়াবহতায় শিউরে উঠল মানুষেরা।

লালকুঁয়র বা ইমতিয়াজ মহলকে স্বাভাবিকভাবেই আর কেউ মনে রাখেননি। শাহী হারেমের নিয়ম ছিল, বিজয়ী বিজিতের হারেমের অধিকার পায়। দারার হারেম যুক্ত হয়েছিল ঔরঙ্গজেবের হারেমের সঙ্গে, দারার বেগম রানাদিলকে তিনি বেগম করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন, উদয়পুরিকে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটি বেওয়া মহলও ছিল। হারেমের বাইরে। খাওয়াসপুরা। এটিকে কেউ কেউ ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলেন সোহাগপুরা, একদা সোহাগিনীরাই তো সেখানকার বাসিন্দা, কাজেই এ নাম। সম্ভবত এঁরা সম্রাটের হারেমের অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি। সত্যিই যদি তা হয়ে থাকে তাহলে এ নামটি সার্থকও। সম্রাট আকবর নগর নির্মাণের সময় এরকম বহু আবাস তৈরি করিয়েছিলেন। যেমন, অনাথ আশ্রম বা খয়রাতপুরা, সন্ন্যাসীদের জন্য

যোগীপুরা, বারাঙ্গনাদের জন্য শয়তানপুরা প্রভৃতি। হয়ত এদের সঙ্গে মিলিয়েই গড়ে উঠেছিল, সোহাগপুরা বা খাওয়াসপুরা। লালকুঁয়র বেগম হিসেবে সামান্য মাসোহারা পেতেন, খাওয়াসপুরায় বিবর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। উচ্চাকাঙক্ষা, ক্ষমতার লোভ, বিলাসী জীবন, সুখ সাচ্ছন্দ্য কোনটাই সেদিন তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। অথচ তাঁর সবই ছিল। অপরূপ রূপ, অসামান্য নৃত্যকৌশল, সুমধুর কণ্ঠ—-ইচ্ছে করলেই নতুন হারেমের স্থান পেতে পারতেন তিনি। সে পথে না গিয়ে মৃত বাদশাহের স্মৃতি বুকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। অনেকেই ব্যঙ্গ করে বলেন, দ্বিতীয় নুরজাহান হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন লালকুঁয়র। হয়ত দেখেছিলেন। বাস্তব জীবনে তিনি জাহান্দার শাহকেই শুধু চেয়েছিলেন। ঐশ্বর্য নয়, ক্ষমতা নয়, মৃত বাদশাহের স্মৃতির প্রতি আনুগত্যই লালকুঁয়রের শেষকথা। মানুষ হারায়, প্রেম হারায় না। কান পাতলে যমুনার কলতানে, চকের পুরনো মহল্লায় আজও জাহান্দার শাহ ও লালকুঁয়রের ভালোবাসার গল্প শোনা যায়।

বিষ্ণুবর্ধন ও শান্তলাদেবী

ইতিহাসের পাতায় নির্বাসিত হননি হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধন। প্রতিদিনই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিস্মিত পর্যটকদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে, বেলুর ও হ্যালেবিদের অপরূপ দুটি মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। আর একজনের নামও উচ্চারিত হয় সেই সঙ্গে, ইতিহাস যাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। অথচ বিষ্ণুবর্ধনের প্রতি শান্তলাদেবীর ভালোবাসাই বিজয়নারায়ণ ও হোয়সালেশ্বর মন্দিরকে পাষাণের কবিতায় পরিণত করেছে।

হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি? দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাজার জীবনকথাই এমন আবছা। রাজা হওয়ার আগে বিষ্ণুবর্ধন নাকি ছিলেন দস্যু বিট্টিগা অত্যন্ত অসংস্কৃত স্বভাবের দুরন্ত দস্যু। অন্তত বৈষ্ণব ভক্তেরা তাই বলেন। আসলে তিনি ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক সামন্ত রাজা। হোয়সল রাজবংশেরর প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত তাঁর দাদা প্রথম বল্লাল। ১১১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন বিট্টিগা। তাঁর চোখে ছিল রাজা হওয়ার স্বপ্ন। প্রজাশাসনের ভার নিয়েই তিনি নিজের নামটি বদলে ফেললেন। বিট্টিগা হলেন বিট্টিদেব। একদিন বেরিয়ে পড়লেন আশেপাশের গ্রামাঞ্চলকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। অসি হাতে বেরিয়েই মনে হল, একবার শ্রবণবেলগোলার দিকে যাওয়া দরকার, তীর্থস্থানে মাথা ঠেকাতে। বিট্টিদেব জৈন। জৈনধর্মের সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক যতটা নিবিড়, হিংসার সঙ্গে ততটা নয়। তবু ইতিহাসে বিট্টিদেবকে জৈন বলা হয়েছে। পরে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব সাধক রামানুজের সংস্পর্শে এসে তিনি হয়েছিলেন পরম বৈষ্ণব। সে অবশ্য আরও পরের কথা।

সেদিন শ্রবণবেলগোলার পথে বেরিয়ে বিট্টিদেব পৌঁছোলেন তার কাছাকাছি গ্রাম হোরিঙ্গেরে। সন্ধ্যা নেমে আসায় আর না এগিয়ে সেখানেই থাকবেন স্থির করলেন। এই গ্রামে বাস করেন বলদেব, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে বিট্টিদেব তাঁকে চিনতেন। কাজেই স্থির করলেন, সৈন্য সামন্ত দূরে রেখে নিজেই যাবেন বলদেবকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে। গ্রামের বাইরে অন্যদের রেখে সাধারণ পোশাকে বিট্টিদেব উপস্থিত হলেন বলদেবের কাছে। প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে। সহাস্যে বলদেব প্রশ্ন করলেন, 'এস এস। কী খবর বিট্টিগা? সব কুশল তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় জানেন, দাদার সিংহাসন আমিই পেয়েছি।'

'তুমিই তো এখন দেশের রাজা।'

'রাজাদের তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না। আমিও তাই বেরিয়েছি। গোটা দেশটাকে জানতে।'

'বেশ, বেশ।' বলদেব বোঝেন সবই। যুদ্ধযাত্রার কথা বিট্টিগা তাঁকে জানাতে চান না। প্রজার সম্পদ লুঠ করেই তো রাজার ভাণ্ডার ভরে। বিট্টিদেবের শালপ্রাংশু চেহারায় যুদ্ধং দেহি ভাব। সর্বাঙ্গে বলদৃপ্ত পৌরুষ আত্মঘোষণা করছে। ললাটে পরিষ্কার রাজচিহ্ন। ইচ্ছে না করলেও এ বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হবে। প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'আজ এখানেই বিশ্রাম কর। কোথায় চলেছ?'

'আপনার আজ্ঞা পালন করব। আমি প্রত্যুষে যাব গোমতেশ্বর দর্শনে।'

'শুনে ভারী সুখী হলাম।'

গোধুলির রং তখনও মুছে যায়নি। বলদেবের পাঠকক্ষে এসে দাঁড়াল একটি দীপলক্ষ্মী প্রদীপ হাতে। বিট্টিদেবের সে কথাই মনে হল। তিনি রাজা। অন্তঃপুরে কয়েকজন রানি আছেন, রূপসীও দেখেছেন কিন্তু গোধুলির আলোয় এমন অপরূপ নারী তিনি আগে কখনও দেখেননি। মন্দিরে মন্দিরে প্রদীপ হাতে যে সব নারীমূর্তি দেখা যায়, তাদের বলা হয় দীপলক্ষ্মী। এই নারীর পাশে তারাও বুঝি কেউ নয়। নতুন তামার মতো উজ্জ্বল রক্তিম গায়ের রং, চোখদুটি নীলপদ্ম, অপর্যাপ্ত ঘন কালো মসৃণচুলে অপরূপ কবরী বিন্যাস, তীক্ষ্ণ নাক, চিকন ভ্রূযুগল ডানা মেলা পাখির মতো যেন এখনি আকাশে উড়ে যাবে, রক্তিম ওষ্ঠ, কম্বু গ্রীবা, পীন বক্ষ, ক্ষীণ কটি, সর্বাঙ্গ সুন্দরী। অধরা মাধুরী যেন রূপ ধরে বিট্টিদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। সৌজন্য ভুলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন বিট্টিদেব। নীল পদ্মেও যেন চমক লাগল, একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই নত হল কোমল লজ্জায় তারপর হারিয়ে গেল দীর্ঘ পল্লবের ঘন ছায়ায়। সবটাই লক্ষ করছিলেন বলদেব। ত্রিকালদর্শী পুরুষ তিনি। সস্নেহে হেসে বললেন, 'এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শান্তলা। শুধু রূপসী নয় অসামান্য গুণের অধিকারিণী।'

আত্মস্থ হলেন বিট্টিদেব। লজ্জাও পেলেন। তিনি রাজা। অসৌজন্যে শোভা পায় না। সরে দাঁড়ালেন।

শান্তলা প্রদীপটি পিলসুজের ওপর নামিয়ে রেখে বলদেবের দিকে তাকালেন। বলদেব বললেন, 'মা শান্তলা, ইনি আমাদের দেশের রাজা।' নীরবে দুটি মৃণালের মতো হাত মধুরভঙ্গিতে অঞ্জলিবদ্ধ হল।

বিট্টিদেবের মনে হচ্ছিল কোন দেবীকে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। কোন নারী এত সুন্দর হয়? তাঁর অন্তঃপুরে যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ এঁর পাশে দাঁড়াতে পারবেন না। রূপের সঙ্গে বুদ্ধির, রুচির সঙ্গে ভক্তির এমন মিলিতরূপ কামনা জাগায় না, শ্রদ্ধায় অবনত করে। বিট্টিদেব বিনা যুদ্ধেই পরাস্ত হলেন।

আর শান্তলা? শৌর্য বীর্যের প্রতীক বিট্টিদেবকে দেখে তাঁর মনেও আলোড়ন উঠল কিনা মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনি আজ আমাদের অতিথি মহারাজ।'

বলদেব বললেন, 'তুমি বিট্টিগার বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই।'

জৈন পরিবারে সূর্যাস্তের পরে আহার নিষিদ্ধ। বলদেব সে নিয়ম কঠোরভাবে পালন করেন তবে পরিবারের সবাই সে নিয়মে চলেন না। এখন সূর্যাস্ত হয়েছে তবে সন্ধ্যা হয়নি।

বিট্টিদেব অপ্রস্তুত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন সেনাদের সঙ্গেই থাকবেন। দাক্ষিণাত্যের সামন্ত রাজারা বিলাসী নন, কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু শান্তলাকে আর একটু দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে পুলকিত হলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আমি হয়ত আপনাদের বিব্রত করলাম।'

'না বিট্টিগা', বলদব বললেন, 'অতিথিদের জন্য আমরা সব সময়ই প্রস্তুত তবে তোমার মতো রাজ অতিথিকে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারব জানি না। '

'আমাকে রাজা না ভাবলেই আমি স্বস্তি বোধ করব।'

বলদেব শান্তলাকে বললেন, 'শান্তলা, বিট্টিদেব আগামী প্রত্যুষে গোমতেশ্বর দর্শনে যাবেন। ওঁর যেন কোন অসুবিধে না হয়।'

শান্তলা নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিট্টিদেবকে বিশ্রামকক্ষে পথ দেখিয়ে দিতে এগোলেন। বিট্টিদেব দেখলেন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি, আঙিনায় আলপনা। আয়োজন সামান্য কিন্তু সর্বত্র যত্ন ও সুরুচির ছাপ। বিট্টিদেব সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন, 'আপনিও কি জৈন?'

এই প্রশ্নের কারণ হল, দাক্ষিণাত্যে ধর্ম পারিবারিক শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি তখনও। প্রত্যেকেই নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারতেন। বলদেব নিষ্ঠাবান জৈন, শান্তলার পিতা মারুসিংহ কিন্তু শৈব। তাঁর স্ত্রী মাচিকোব্বে শ্বশুরবাড়ির সকলের মতোই জৈন। শান্তলাও মায়ের মতো ভক্তিমতী। জৈন হলেও সব ধর্মের প্রতিই তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। রাজার প্রশ্নে তিনি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। সেই হাসিটি বিট্টিদেবের মনে গাঁথা হয়ে রইল সারা জীবনের মতো। আবার প্রশ্ন করলেন, 'গোমতেশ্বরে নিশ্চয় যান।'

'হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে বেলগোলা।'

বিট্টিদেবের মনে পড়ল গোমতেশ্বরের পথে শ্বেত পুষ্করিণীটির কথা। তাঁদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। যদিও মনে ছিল না বলে মনে মনেই লজ্জা পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, অতি পবিত্রস্থান।'

'আমি সেজন্য বলিনি। আমার ভালো লাগে সেখানকার অনাবিল সৌন্দর্য। সৌন্দর্যেই ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রকাশ।'

মনে মনে বিট্টিদেব বললেন, ঠিক কথা। শান্তলার রূপে সেই ঐশ্বর্যের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। মুখে বললেন, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' বাস্তবে বিট্টিদেব এত নম্র এত ভদ্র নন কিন্তু ভালোবাসা তাঁকে বশ করেছে।

হাত মুখ ধুয়ে বিট্টিদেব আসনে বসতেই শান্তলা নিয়ে এলেন অন্নমণ্ড। সুগন্ধি ভাতের মাড় দিয়ে তৈরি করা। বিট্টিদেব জানেন অন্নমণ্ড পান করলে পথশ্রম দূর হয়। শান্তলা সেই আয়োজনই করেছেন। পান করে তাঁর সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। অন্নমণ্ডের এমন স্বাদ! শান্তলা মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়েছেন হলুদ ও মরিচচূর্ণ, সবশেষে তাতে দিয়েছেন আমলকীর রস। শেষেরটুকু বিট্টিদেব ধরতে পারলেন না কিন্তু তাঁর মন ভরে উঠল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বাকী আহার শেষ করে বললেন, 'রাজভোগেও এত তৃপ্তি নেই।'

প্রশংসা শুনে শান্তলা হাসলেন, 'সামান্য জিনিসই যত্নের সংস্পর্শে অসামান্য হয়ে ওঠে মহারাজ।'

'আপনার প্রতিটি কথাই সত্য। আজকের সন্ধ্যাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

হঠাৎ যেন দুষ্টুমি ভর করল শান্তলাকে। প্রশ্ন করলেন, 'কতক্ষণের জন্য?'

'যতদিন বেঁচে থাকব।'

'একটি রাজ্যের অধীশ্বর আপনি। কত বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে আপনার প্রতিটি দিন কাটবে। তুচ্ছ একটা দিনের কথা আপনার মনে থাকবে কেন মহারাজ?'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শান্তলার দিকে তাকালেন বিট্টিদেব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় স্বরে বললেন, 'আপনি জানেন সে কথা।'

'আমি জানি', বিস্মিত হলেন শান্তলা।

'হ্যাঁ', বিট্টিদেব বললেন, 'আপনি জানেন আমার কাছে একটি সাধারণ সন্ধ্যা কেন অসাধারণ হয়ে উঠল। আপনি শুধু গুণবতী নন, বুদ্ধিমতীও।'

শান্তলা চুপ করে রইলেন, তাঁর উজ্জ্বল কপোলে যেন আবির গুলালের আভাস। প্রদীপের আলোয় দেখা না গেলেও বিট্টিদেবের মনে রং ধরাল।

বিট্টিদেব দেশের রাজা। ইচ্ছে করলে যে কোন সুন্দরী কন্যার পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানাতে পারেন। রাজার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় না কেউ। কিন্তু সে পথে হাঁটবার কথা চিন্তাও করলেন না বিট্টিদেব। তিনি বুঝে গিয়েছেন, শান্তলা নিজে না ধরা দিলে কারোর সাধ্য নেই তাকে অধিকার করে। এই পরিবারের সকলেই সে কথা জানে। পরিবারটিকে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে বিশেষ করে শান্তলার জননী মাচিকোব্বে পরম ভক্তিমতী। তাঁকে দেখে বিট্টিদেবের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। তিনি শান্তলাকেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমি যদি আপনার গুরুজনদের কাছে আপনার পাণি প্রার্থনা করি, আপনি কি অসম্মত হবেন?'

শান্তলা চমকে উঠলেন না। লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন না, আতঙ্কে বিস্ফারিত হলেন না। শুধু বললেন, 'কাল বলব।'

'কোথায় আপনার দেখা পাব?'

'বেলগোলার তীরে গিয়ে।'

বিট্টিদেব চমৎকৃত হলেন। খুশিও। বললেন, 'আপনি সেখানে যাবেন?'

'আমি তো প্রায়ই যাই। পুষ্করিণীটির সৌন্দর্য যে আপনার চোখে পড়েনি, বুঝতে পেরেছি। আমি দেখিয়ে দেব।'

প্রত্যুষে বিট্টিদেব একাই চলে গেলেন শ্রবণবেলগোলায়। ওপরে ওঠার জন্য প্রত্যুষ উপযুক্ত। অনেকটা পথ ওঠার পরে শ্বেত পুষ্করিণী। তিনি তার সোপানের ওপরে বসে পড়লেন। বাস্তবিক অতি রমণীয় স্থান। মন তাঁর ক্রমে শান্ত হয়ে এল আর তখনই দেখতে পেলেন শান্তলাকে। শ্বেত পোশাকে তাঁকে সাধিকার মতো দেখাচ্ছে। পণ্ডিত বলদেব নিজেকে উজাড় করে বিদ্যা দান করেছেন শান্তলাকে। কিন্তু শান্তলার শিল্পানুরাগ তীব্র, তিনি মন্দিরের দেবদাসীর মতো নৃত্যগীত পটিয়সী। শুনে বিস্মিত হন বিট্টিদেব। সাধারণ ঘরের মেয়েরা নৃত্যগীত শেখে না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা কেউ কেউ বীণা বাজায়, হয়ত নৃত্যগীতও শেখে। সমগ্র দক্ষিণে দেবদাসীরাই প্রকৃত নর্তকী। এছাড়া আছে রাজনর্তকীরা।

শান্তলা বলেন, 'আমি নৃত্যের মধ্যে পরম সুন্দরকে দেখতে পাই। তাই নৃত্যচর্চা করি।'

'নৃত্য চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'মহারাজ, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলেও আমার নৃত্যগীতচর্চা অব্যাহত থাকবে তো?

বিট্টিদেব সস্নেহে শান্তলার দিকে তাকালেন। তাঁর মতো কর্কশ যোদ্ধাকেও তাহলে ভালোবেসেছে মেয়েটি। অনির্বচনীয় অনুভূতি গ্রাস করল তাঁকে। বললেন, 'আপনার কোন ইচ্ছায় আমি কখনও বাধা দেব না।'

শান্তলা লাজুক মুখে বললেন, 'কেন?'

'কারণ', বিট্টিদেব একটু থামলেন, নিজের হৃৎস্পন্দন অনুভব করলেন, হয়ত এরই নাম ভালোবাসা, কিন্তু মুখে আনলেন না সে কথা। শুধু বললেন, 'যা সুন্দর নয়, এমন কাজ আপনি কখনও করতে পারবেন না বলে।'

উত্তরটি শান্তলার মনের মতো। বিট্টিদেবের প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেবার কথা কারোরই মনে হল না। কর্ণাটী বীণার মধুর ঝঙ্কারের মধ্যে রাজ্যের সেরা পুষ্পটিকে চয়ন করে বিজয়গর্বে গৃহে ফিরলেন বিট্টিদেব।

হয়ত এরকম অনেক বিয়ের গল্প আছে রাজা মহারাজাদের জীবনে। কিংবা রূপসী মেয়ের রানি হবার কাহিনী। বিট্টিদেব ও শান্তলার প্রেম উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে শুধু। সত্য মিথ্যায় মিশে আজও তাঁরা যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে চলেছেন।

বিট্টিদেব একদিন বিষ্ণুবর্ধন হলেন। দক্ষিণ ভারতে তখন রামানুজ পুজিত হচ্ছেন যতিরাজ হিসাবে। বহু বৌদ্ধ ও জৈনকে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন, বিট্টিদেব তাঁদেরই একজন। বহু বৈষ্ণব উপাখ্যানে দস্যু বিট্টিগার লোমহর্ষক বিবরণ আছে। কেমন করে কষ্টি পাথর রামানুজের স্পর্শে সোনা হলেন আছে সে কথাও। সত্যিই কি বিষ্ণুবর্ধন হবার আগে বিট্টিদেব দানবসদৃশ দস্যু ছিলেন? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। যদি কেউ তাঁর পরিবর্তন ঘটিয়েই থাকেন তবে, তিনি শান্তলা। তাই ধর্মান্তরিত

হওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল হোয়সলরাজের পাশে এমন একটি নারীর উপস্থিতি, যিনি শয়নকক্ষ থেকে মন্ত্রণাকক্ষ পর্যন্ত সর্বত্র রাজার সঙ্গিনী, ঠিক যেন কৃষ্ণের পাশে সত্যভামা। সমকালীন কবিদের রচনায় শান্তলার প্রশস্তি লক্ষ করবার মতো। অথচ কোন বৈষ্ণবগ্রন্থেই শান্তলার নাম নেই, কেন না তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু ধর্মান্তরিত না হয়েও শুধু প্রেম ও সৃষ্টিসুখের উল্লাসে তিনি যা রচনা করেছিলেন সেজন্যও তো বৈষ্ণবসমাজে তাঁর উচ্চ আসন পাবার কথা।

বৈষ্ণব হয়েও বিষ্ণুবর্ধন যুদ্ধ করা বন্ধ করলেন না। রাজাকে যুদ্ধে যেতেই হয়। কখনও চোল, কখনও চালুক্য রাজারা তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। প্রতিবারই জয় হয়। হেসে বলেন, 'জয়লক্ষ্মী আমার গৃহলক্ষ্মী হয়েছেন, আমার কিসের ভয়।' রাজ্যের ভালোমন্দ নিয়ে পরামর্শ করেন শান্তলার সঙ্গে। তিনি একাধারে গৃহিণী, সচিব, সখী....। তাঁর শিল্পচর্চা, নৃত্যচর্চা চরমোৎকর্ষ লাভ করল কি না তার খোঁজ রাখেন না রাজা তবে কোন বাধাও দেন না। অন্তঃপুরের সতীনরা আপত্তি তুলেছিলেন শান্তলার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। সবাইকে দমন করেছেন শান্তলা একাই, সাহায্যের জন্য স্বামীকে ডাকেননি, পারিবারিক কলহে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি বলে রাজা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন শান্তলার প্রতি। আপন গৌরবে, অতি সহজেই শান্তলা এখন পাটরানি। এমনই একটা সময়ে, ১১১৬ সালে তালকাড জয় করে বিষ্ণুবর্ধন ফিরলেন চোখে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। অন্যদের চোখে ধরা না পড়লেও বুদ্ধিমতী শান্তলার চোখে স্বামীর ভাবান্তর ধরা পড়ল। প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাঁর, সেই ভালোবাসার শক্তিতে তিনি বিষ্ণুবর্ধনকে বুঝতে পারতেন সবচেয়ে বেশি। মধুর হেসে যুদ্ধজয়ী বীর স্বামীকে বরণ করে নিলেন। নিভৃত সাক্ষাতে বিষ্ণুবর্ধন প্রথমেই তাঁকে বললেন, 'আমি কি ভাবছি জানো?'

এ তাঁদের পুরনো খেলা। বিষ্ণুবর্ধন বারবার পরাস্ত হয়েছেন শান্তলার কাছে। প্রতিবার তাঁর মনের কথাটি শান্তলা ধরে ফেলেছেন। তিনি যা ভেবেছেন, মুখে আনবার আগেই উচ্চারণ করেছেন শান্তলা। তবে এবার যে পারবেন না তাও রাজা জানেন। কেন না এখন তিনি তাঁর এক পরম অভিলাষের কথা শোনাবেন তাঁর প্রিয়তমা রানিকে।

শান্তলা মৃদু হাসলেন, 'জানি বই কী মহারাজ। আপনি ভাবছেন, জীবন অনিত্য কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। '

বিষ্ণুবর্ধন অভিভূত। বহুবার তিনি শান্তলার বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়েছেন কিন্তু আজকের মতো কখনও হয়নি। যে কথা তিনি বলবেন ভাবছিলেন, মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে পারছিলেন না, ঠিক সেই কথাই বললেন শান্তলা। বিস্ময় গোপন করতে না পেরে বললেন, 'তুমি কি করে বুঝতে পারো আমাকে?'

'প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে আমি সব সময় আমার মনের মধ্যে আপনাকে খুঁজি বলে বুঝতে পারি মহারাজ। কোন জাদু টোনার সাহায্যে নয়। আজকের ঘটনাটি বলি। তালকাডে আপনি জয়ী হয়েছেন। সর্বত্র বিজয় আপনার করতলগত। তবু আপনার চোখে দেখলাম, দিগ্বিজয়ের আনন্দ নয়,তার অতিরিক্ত কোন আকাঙ্ক্ষা। কী হতে পারে আপনার কাম্য, অবশ্যই কীর্তি।'

বিষ্ণুবর্ধন খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি যথার্থ অনুমান করেছ। তালকাডে আমাকে মুগ্ধ করেছে চোল নৃপতিদের মন্দির। কবে তাঁরা গত হয়েছেন, কিন্তু আজও অগণিত ভক্তকে মুগ্ধ করছে তাঁদের মন্দিরের গঠনশৈলী। আমিও একদিন থাকব না। আমাকে কি কেউ মনে রাখবে?'

'নিশ্চয় রাখবে।' দৃঢ় স্বরে বললেন শান্তলা। তাঁর শিল্পী মন তখনই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

'কেন রাখবে? কী রেখে যাব আমি?'

'মহারাজ, আপনিও তো মন্দির নির্মাণ করতে পারেন। আপনার পূর্বপুরুষেরা মন্দির নির্মাণ করেছেন। আপনিও করবেন তবে সে মন্দির হবে চালুক্য রাজাদের মন্দিরের চেয়ে সুন্দর, চোল রাজাদের মন্দিরের চেয়েও সুন্দর। সবার চেয়ে সুন্দর। দূর-দূরান্ত থেকে লোকে আপনার মন্দির দেখতে আসবে। আমরা তখন থাকব না.... সেই সুদূর ভবিষ্যতে মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দূরাগত ভক্তেরা স্মরণ করবে আপনাকে।'

বিষ্ণুবর্ধন মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন শান্তলার দিকে। সে মুখে স্বপ্নের নিবিড় আবেশ। বললেন, 'তুমিও কি এমনই একটি মন্দিরের স্বপ্ন দেখ।'

'দেখি। তবে একটি কেন? চালুক্য রাজারা তো অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আপনিও করবেন।'

'চালুক্য রাজাদের মন্দিরের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু বিশেষ কিছু জানি না। যুদ্ধ করেই কেটে গেল জীবনের অনেকখানি সময়।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

'মন্দির নিয়ে চালুক্য রাজারা প্রচুর ভেবেছিলেন। ভূভারতের মন্দিরের প্রতিকৃতি তৈরি করিয়েছিলেন স্থপতিদের দিয়ে। আইহোলে সেসব মন্দিরের ক্ষুদ্রাকৃতি আদরা আজও বর্তমান। স্থপতিদের পরামর্শ নিয়ে আপনি নতুন মন্দির নির্মাণ করবেন।'

'অনেক কিছু জান তুমি। তবে মন্দির নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আমি করব না। করবে তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, সব ভার আমি তোমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

'আমি কি পারব?' শান্তলা সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি নারী, স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নকে সাকার করা এক নয়।

'তুমি না পারলে কেউ পারবে না।'

'আমি চেষ্টা করব আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে ......কিন্তু....

'কোন কিন্তু নয়. বিষ্ণুবর্ধনকে অমরত্ব দেবে তুমি। কোন প্রশ্ন করব না, যদি অসফল হও। যদিও তার কোন সম্ভাবনাই নেই। সফল হলে পুরস্কার পাবে।'

মুচকি হাসলেন শান্তলা, 'কি পুরস্কার পাব শুনে রাখি।'

'আগে থেকে বলা যাবে না।'

'তাহলে কাজের কথা হোক। কার মন্দির হবে রাজধানীতে?'

'মনে মনে চমকে উঠলেন বিষ্ণুবর্ধন। আসল কথাটাই ভাবা হয়নি এতক্ষণ। তিনি

বৈষ্ণব কিন্তু শান্তলা তো পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করেননি। একটি অপরূপ জৈন বস্তি নির্মাণের সাধ নিশ্চয় আছে শান্তলার। স্বামী বৈষ্ণব হয়েছে বলেই হয়ত সে সাধের কথা মুখে আনেননি কখনও। ওই অপরূপ নারীটিকে সুখী আরও সুখী করতে চান বিষ্ণুবর্ধন। একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার পূর্বপুরুষেরা তো কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ....আনাগদিতে... কুপাট্টুরে....'

'সে তো...' শান্তলা ইতস্তত করে বললেন, 'সবই জৈন বস্তি।'

'হলেই বা ... আর একটি সুন্দর বস্তি নির্মাণে আপত্তি কি?'

বুদ্ধিমতী শান্তলা বুঝে ফেললেন তাঁর স্বামীকে। কিন্তু এবার সে কথা বলে বাহবা কুড়োলেন না। ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'না, প্রথম মন্দিরটি হবে বিজয়নারায়ণের। মহারাজ তালকাড জয় করে ফিরেছেন তাঁর আশীর্বাদে। এই মন্দিরে কেশবের নাম হবে বিজয়নারায়ণ।'

'এ কী তোমার মনের কথা, না, আমার মন রাখতে বলছ?'

'মহারাজ, এ প্রশ্ন আমিও করতে পারি আপনাকে। করব না। কারণ উত্তরটা জানি। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না আমি জৈন হলেও শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্মকেও সমানভাবে শ্রদ্ধা করি।'

বাস্তবিকই শান্তলাদেবীকে সমকালে বলা হত 'চতুর্সাম্য সমুদ্ধরা'। বিষ্ণুবর্ধনের বুকের ভার নেমে গেল। শুধু তাই নয় শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় তঁরা মন ভরে উঠল। বললেন, 'আমি ধন্য। আর একটি পরামর্শ দাও, চোলদের হারাবার জন্যই যখন মন্দির তখন তালকাডে আমি যদি একটি মন্দির তৈরি করি।'

'বেশ তো মহারাজ। সে মন্দিরের দেবতার নাম হবে কীর্তিনারায়ণ।'

'অপূর্ব।'

'তবে সে মন্দিরটির দেখাশোনার ভার অন্য কাউকে দিতে হবে মহারাজ।'

'কেন?'

'দুটি মন্দির একসঙ্গে দেখতে পাব না যে।'

'বেশ। তবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দেবে।'

শান্তলা ডেকে পাঠালেন প্রধান স্থপতিকে। তক্ষণাচার্য তাঁর উপাধি বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। প্রবাদ এই বৃদ্ধ আশ্চর্য প্রতিভাধর শিল্পী। এক সময়ে চালুক্য রাজাদের মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শান্তলা তাঁকে বললেন, 'তক্ষণাচার্য, আমি আপনার দক্ষতার কথা শুনেছি। একটি অসামান্য মন্দিরের পরিকল্পনা করতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। মহারাজের তালকাড বিজয়ের স্মৃতিতে মন্দির। যুদ্ধজয়ের কথা প্রজারা ভুল গেলে সবটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।'

বৃদ্ধ স্থপতি হাসলেন, 'এমন মন্দির তৈরি করব, যার কথা কেউ কখনও ভুলবে না। যে একবার দেখবে তার চিরকাল মনে থাকবে।'

'আমিও তাই চাই।'

'সবটাই আমি একা হাতে করব।'

'বৃদ্ধের কথা শুনে হেসে ফেললেন শান্তলা, 'তাহলে মন্দির শেষ হবে না। আপনি প্রথমে আদরা তৈরি করুন। তারপর বিজয়নারায়ণের মূর্তিটি নির্মাণ করুন। নির্মাণ যেন হয়ে ওঠে সৃষ্টি।'

বৃদ্ধ বহুদিন ধরে এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন, 'যথা আজ্ঞা। কিন্তু বাকি কাজ কারা করবে?'

'অনুসন্ধান করছি। আপনার ছেলে কোথায়? শুনেছি সেও বড় শিল্পী।'

'সে কুলাঙ্গার বাপের কাজে সাহায্য করবে না। একদিন দেখিয়ে দেবে সে নাকি আমার চেয়েও বড় শিল্পী।'

শান্তলা বুঝলেন, এ অভিমান শিল্পীর আত্মসম্মানের। একজন শিল্পী বুঝলেন অপর শিল্পীর মর্মব্যথা। দুটি মরমী হৃদয় কাছাকাছি হওয়ায় কাজ চলল দ্রুত তালে। মন্দিরের ছক তৈরি হয়ে গেল, ভিত গাঁথা হয়ে গেল। পাথরের দেওয়াল উঠল, উঁচু বিশেষ নয়, ছড়ানো অনেকটা পাশার ছকের মতো।

শান্তলা বললেন, 'মন্দিরের সবটাই ঢেকে দিতে হবে কারুকাজে। অলংকরণ আর নয়নাভিরাম মূর্তি দিয়ে।'

স্থপতি আগেই বুদ্ধি করে বালি পাথরের বদলে মন্দির শুরু করেছিলেন কালো পাথর দিয়ে। শান্তলা ভয় পেয়েছিলেন, খরচের বহরের কথা ভেবে। শেষে প্রজাশোষণ করতে হবে না তো? স্থপতি দেখিয়েছিলেন, কাছেই আছে সবজে কালো পাথরের পাহাড়। কেটে আনলে প্রথমদিকে নরম থাকে, পরে কঠিন হয়। এই পাথরের সূক্ষ্ম অলঙ্করণ সম্ভব। খরচও বেশি নয়। সেই থেকে শান্তলা ভাবছেন দেয়ালের নকশার কথা। তাঁর চেষ্টায় একে একে এসেছেন অনেক শিল্পী। বাল্লিগ্রাম থেকে দাসোজা ও তার ছেলে চবন, গোদাঘ থেকে নাগোজা, লাখুন্ডির মাসাজা, এল আরও অনেকে — চাকান্না, মালিয়ান্না, মায়ান্না, মালান্না, মাবা, জকনাচারি, মাসানা—শত শত শিল্পী কাজে লেগে রইলেন। অনেকেই নিয়োজিত ছিলেন অন্যত্র। কর্ণাটকের ভাস্কররা চিরকালই সুদক্ষ। মধ্যযুগে ধনীদের প্রধান ব্যসন মন্দির নির্মাণ। কাজেই শিল্পীর অভাব হল না। ধীরে ধীরে রূপ নেয় বিষ্ণুবর্ধনের স্বপ্ন। শান্তলা নিজের হাতে এঁকে দেন চিত্রশৈলী। প্রথম সারিতে হস্তিযুথ, দ্বিতীয় সারিতে সিংহের মুখ, তৃতীয় সারিতে মিথুন মূর্তিকে ঘিরে আছে একটি কমনীয় লতা, চতুর্থ সারিতে অপরূপা সুরসুন্দরীরা। এত সূক্ষ্ম অলঙ্কার তাদের অঙ্গে, ভঙ্গিতে এত লাবণ্য, পাথর বলে মনেই হয় না। ভাস্করেরা নির্দেশমতো মূর্তি তৈরি করেন কিন্তু কোন প্রতিমূর্তি তাদের সামনে নেই। বারবার ভুল হয়। শান্তলা হাসেন, 'চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে সেই ভঙ্গি পাথরে ফুটিয়ে তুলতে পারবে?'

শিল্পীরা বলেন, 'পারব।'

'বেশ কাল সকাল আবার কাজ শুরু করবে।'

পরদিন শিল্পীরা মন্দিরে এসে অবাক হয়ে দেখলেন, মহারানি স্বয়ং নর্তকীর বেশে সুরসুন্দরীদের ভঙ্গিকে মূর্ত করে তুলছেন। সে কী অপরূপ ভঙ্গি, অনির্বচনীয়

অঙ্গশোভা। সবাই চোখ ভরে দেখলেন। তারপর হাতে তুলে নিলেন যন্ত্রপাতি। পাথরের বুকে ছেনি হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ নয়, যেন তাতে মিশে রইল রাজ্ঞীর নূপুর নিক্কণ।

লাস্য নর্তকীকে পাথরে বন্দি করে নিজেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নাগোজা।

শান্তলা বলেন, 'অপূর্ব হয়েছে শিল্পী, এবার খোদাই করে দাও তোমার নাম।'

চমকে ওঠে নাগোজা, 'আমার নাম?'

'নিশ্চয়। এমন মূর্তি তৈরি করলে তুমি আর তোমার নাম থাকবে না। তা কি হয়? যুগ যুগ ধরে মানুষ আসবে এই মন্দির দেখতে। তখন তো আমরা কেউ থাকব না। তখন কে বলে দেবে তাদের কোনটি তোমার সৃষ্টি আর কোনটি নয়।'

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে নাগোজা। এত আনন্দ, এত সম্মান সে যেন সইতে পারছে না। হয়ত এই তার শেষ মূর্তি গড়া.... হয়ত মন্দির নির্মাণ শেষ হলে রাজা তার হাত কেটে দেবেন...। তবে আজকের শিহরন ভোলবার নয়। ধীরে ধীরে সে মূর্তির পায়ের কাছে নিজের নাম লেখে, গ্রামের নাম লেখে।

একই অনুভূতি নিয়ে দাসোজা লেখে দর্পণধারী প্রসাধিকার পায়ের কাছে নিজের নাম। প্রতিটি ভাস্কর্য তাদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। কেউ কেউ লেখে 'আমি সরস্বতীর পাদপদ্মের মুধলোভী ভ্রমর'—এই সরস্বতীকে তারা প্রত্যক্ষ করছে, তিনি কমলবাসিনী নন, কমললোচনা শান্তলাদেবী। সবারই ইচ্ছে করে তাঁর নামটাও কোথাও লিখে রাখতে। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। তবু এসে যায় তাঁর খোঁপার ঢংটি, কোথাও অলঙ্কার, কোথাও বস্ত্রের নকশাটি। সব সুন্দরীর মুখেই শান্ত ভাব কেন না শান্তলার শান্তভাবটিই বিশেষভাবে পছন্দ।

সব কিছু দেখে শুনে তক্ষণাচার্য বললেন, ' তা হবে না। আপনাকেও থাকতে হবে।'

শান্তলা বললেন, 'আমি তো আছিই, মহারাজার নাম যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব। তাছাড়া এই যে এত সুরসুন্দরী, মন্দিরের মধ্যে চল্লিশজন মদনিকা—সবাই তো আমি।'

'ওভাবে নয়।' বৃদ্ধ প্রবেশপথের ওপরে,সামান্য দক্ষিণে বসালেন একটি রাজসভার চিত্র। মহারাজ বিষ্ণুবর্ধনের রাজসভা। রাজার বামে বসে আছেন মহারানি শান্তলা, তাঁর খোঁপাটি দূর থেকেও চেনা যায়। অন্যপাশে মন্ত্রী পারিষদেরা।

শান্তলা বললেন, 'মহারাজের আরও রানি আছেন।'

তক্ষণাচার্য বললেন, 'তাঁদের কাউকে আমরা দেখিনি। আপনাকে রাজসভায় দেখেছি।'

সম্মতি দিতে হল শান্তলাকে। সত্যিই তিনি বিষ্ণুবর্ধনের অর্ধাঙ্গিনী। সমকালীন কবিরা লিখেছেন, তিনি বিষ্ণুবর্ধনের জয়লক্ষ্মী, সত্যভামার মতো, প্রেয়সী, সীতার মতো সতী।

মাত্র এক বছরে বিজয়নারায়ণের মন্দির তৈরি হয়েছে। এখনও অনেক কিছু বাকি। সকলকে নিয়ে মন্দির পরিদর্শনে এলেন বিষ্ণুবর্ধন। যতই দেখেন ততই অবাক হয়ে যান। এ কোথায় এসেছেন তিনি? এ যে ইন্দ্রসভা। স্বপ্নের অগোচর। সবচেয়ে সুন্দর

বিজয়নারায়ণের মূর্তি। অনবদ্য। পাথরের মুখে ওই হাসিটি ফুটল কি করে কেউই বুঝতে পারলেন না, ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আর তখনই ছন্দপতন ঘটল।

দর্শকের দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটি যুবক। বলল, এই মূর্তিতে খুঁত আছে।

সবাই চমকে উঠলেন। রাজা বললেন, 'কে তুমি?'

'আমি একজন সামান্য তক্ষণশিল্পী।'

'কোন মূর্তিটির কথা বলছ?'

'বিজয়নারায়ণের মূর্তির কথা।'

এবার এগিয়ে এলেন তক্ষণাচার্য। পুত্রের দিকে রুষ্ট চোখে তাকালেন, 'দেখাতে পারো কোথায় খুঁত আছে?'

'পারি।'

'দেখাও এখনই দেখাও। তিল তিল করে আমি আমার জীবনের সেরা মূর্তিটি গড়েছি। খুঁত থাকলে আমার হাত আমি কেটে ফেলব।'

আগন্তুক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা বললেন, 'কোথায় খুঁত আছে দেখাও।'

রাজার আদেশ মানতেই হয়। আগন্তুক বলে, 'দেবমূর্তি নির্মাণের পূর্বে বিশুদ্ধ পাথর নির্বাচন করতে হয়। পাথর হবে বেদাগ। কিন্তু এই পাথরটিতে একটি ব্যাঙ শীলিভূত হয়ে আছে সৃষ্টির সময় থেকে।'

পরীক্ষা করে দেখা গেল যুবকের কথাই সত্যি। বিজয়নারায়ণের নাভির কাছে পাথরের স্তরের মধ্যে বহু বছর আগেকার একটি ব্যাঙের আভাস। মাটি যখন পাথর হয়নি তখনকার কথা। এ পাথরকে নিখুঁত বলা চলে না।

তক্ষণাচার্য উন্মত্তের মতো নিজের ডান হাতটি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঘায়ে কেটে ফেললেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতভম্ব। এতদিন যে হাত তাঁকে দিয়েছিল আচার্যের সম্মান তাকেই বিসর্জন দিলেন বৃদ্ধ। আর্তনাদ করে পুত্র ছুটে এসে পতনোন্মুখ বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল। ছুটে এসেছিলেন শান্তলাও। বৃদ্ধ বললেন, 'আমি হেরে গিয়েছি মহারানি। আমার ছেলে ঠিকই বলেছে, ওই মূর্তিকে পুজো করা চলে না। আপনি আমার ছেলেকে নতুন মূর্তি গড়ার ভার দিন। ও পারবে। আমার চেয়ে বড় শিল্পী হবে।'

যুবক কেঁদে ওঠে, 'আমার ক্ষমা কর। আমি আর মূর্তি গড়ব না। বরং পাথর ভাঙব।'

বৃদ্ধের মুখে অন্তিম মিনতি ফুটে উঠল, 'একটি কাজ কর। ওই মূর্তিটি সবার আগে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে চূর্ণ করে ফেল।'

শান্তলা বললেন, 'না।'

তাঁর ইঙ্গিতে রাজবৈদ্য তখন বৃদ্ধের রক্ত বন্ধ করে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছেন। রাজা এবং তাঁর সভাসদেরা তখনও অপেক্ষা করছেন, শান্তলার কথা শোনার জন্য।

শান্তলা বললেন, 'নবীন তক্ষণাচার্যই বিজয়নারায়ণের মূর্তি নির্মাণ করবে।'

রাজা বললেন, 'আর এই মূর্তিটি?'

শান্তলা বললেন, 'নতুন মূর্তির জন্য যে সময় লাগবে সেই অবসরে এই মন্দির প্রাঙ্গণে আমি যদি আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করি, মহারাজের কি আপত্তি হবে?'

রাজা বললেন, 'আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না।'

'সেই মন্দিরে আমি প্রতিষ্ঠা করব এই মূর্তিকে। ওঁর নাম হবে চেন্নিগরায়। এই মূর্তি তো শুধু তক্ষণাচার্যের সৃষ্টি নয়, আমারও সৃষ্টি। আমি ওঁর পুজো করব।'

রাজা শুধু বললেন, 'মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেই বা কী হত?'

'যেখানে আপনার কল্যাণের প্রশ্ন সেখানে আমি কারোর সঙ্গে আপস করব না।'

রাজা সবাইকে নিয়ে নির্ভার চিত্তে ফিরে গেলেন। অভিভূত পিতা-পুত্রের চোখে শুধু অশ্রু। শান্তলা নতুন তক্ষণাচার্যকে সাবধান করে দিলেন, এবার পাথর নির্বাচনে যেন কোন ভুল না হয়।

যথাসময়ে বিজয়নারায়ণের নিখুঁত মূর্তি নির্মাণ শেষ হল। ততদিনে চেন্নিগরায়ের মন্দিরও শেষ। মন্দিরটি ছোট হলেও সুন্দর, হুবহু প্রধান মন্দিরের প্রতিকৃতি। সেখানেও বিষ্ণুবর্ধন ও শান্তলার যুগল মূর্তি। একই দিনে মন্দিরের দ্বার খোলা হল। বিজয়নারায়ণের অপরূপ মূর্তি দেখে সকলে ধন্য ধন্য করে উঠলেন, 'অনেক কেশব মূর্তি দেখেছি, এমন চেন্না (সুন্দর) কেশব কখনও দেখিনি।' বিজয়নারায়ণ লোকের মুখে মুখে হয়ে গেলেন চেন্নাকেশব। আর চেন্নিগরায়ের নাম মুখে মুখে হয়েগেল কাপ্পে (ব্যাঙ) চেন্নিগরায়। সেই নামই আজও বহাল রয়েছে।

বিষ্ণুবর্ধনের মনে হল, সুখের সীমা নেই। একই বছরে তালকাডের মন্দিরটিও সম্পূর্ণ হল। আরও কতকগুলি মন্দিরের কাজে হাত দিলেন তিনি। স্থির করলেন এবার একেবারে রাজধানীর মধ্যেই একটি মন্দির নির্মাণ করা হবে। বেলাপুরম প্রায় রাজধানী হলেও একটু দূরে। শান্তলা তপস্বিনীর মতো সেখানে বাস করেছেন দীর্ঘ একটি বছর। এবার মন্দির হবে দারসমুদ্রে। যদিও কথাটা শান্তলাদেবীকে এখনও বলা হয়নি। তিনি তো সবই আগাম জানতে পারেন তাই রাজার মনে হল, নতুন পরিকল্পনাটিও হয়ত তিনি আগেই জেনে বসে আছেন। সভাকবি বন্দনা শোনাচ্ছেন। বিষ্ণুবর্ধন বললেন, 'আমার কথা নয়। মহারানির বন্দনা শোনাও কবি। তাঁকে কি মনে হয় তোমার?'

কবি বলেন, 'বিষ্ণুর পাশে তিনি লক্ষ্মী। জ্ঞানে তিনি বৃহস্পতি, তর্কে তিনি বাচস্পতি, সঙ্গীতবাদ্যনিপুণা, বিচিত্র নর্তন প্রবীণা, ভরতসূত্রের প্রবক্তা, জৈনভক্তদের রক্ষয়িত্রী....'

বিষ্ণুবর্ধন বললেন, 'অপূর্ব হয়েছে। তবে ওঁর তেজস্বিনী রূপটি তোমার কবিতায় ফোটেনি। লেখ, উনি ওঁর ঝগড়ুটে সতীনদের মত্তহস্তীর মতো দমন করেন।'

রাজসভাসদেরাও হাসি চাপতে পারলেন না। ছদ্ম কোপে মুখ ভার করলেন, শান্তলা। দুজনে একা হতেই বললেন, 'আমি বাপের বাড়ি যাব।'

রাজা বললেন, 'কোনদিন তো বলনি।'

'বলিনি বলে যে কোনদিন বলব না তাতো নয়।'

'ঠিক কথা।' বিষ্ণুবর্ধন জানেন, মেয়েদের মনের দুর্বল স্থানটির কথা। যদিও রাজরানিরা কেউ বাপের বাড়ি যান না। কিন্তু শান্তলার কথা স্বতন্ত্র। তিনি রাজি হলেন। বললেন, 'ফিরে এসে আর একটা মন্দিরের ভার নিতে হবে তোমায়।'

'আবার মন্দির?'

'হ্যাঁ। এবার দ্বারসমুদ্রে।'

'আমার সতীনদের কাউকে বুঝি সে ভার দেওয়া যায় না?'

'না, যায় না। তোমার সঙ্গে কারোর তুলনা হয় নাকি?'

'সে তো শুনলামই। ঝগড়াতে আমি মত্তহাতির মতো দুর্বার।'

রাজা হাসলেন, 'বুঝেছি বিশেষণটি তোমার ভালো লাগেনি।'

শান্তলা মনে মনে বললেন, আমায় চিনতে এখনও বাকি আছে। মুখে বললেন, 'আমি যে একটি বস্তি নির্মাণের কথা ভাবছিলাম।'

'বেশ তো। কোথায়?'

'শ্রবণবেলগোলায়।'

'তোমার পুরস্কারটি বাকি রইল যে।'

'আমার মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আপনি সেখানে যাবেন। সেই হবে আমার পুরস্কার।'

বিষ্ণুবর্ধনের সম্মতি নিয়ে বিদায় নিলেন শান্তলা। কয়েকটা দিন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চান তিনি। দর্শন করবেন তাঁর গুরুদেব প্রভাচন্দ্রের পাদপদ্ম। শান্তলাকে দেখে তাঁর মা আনন্দে চোখের জল ফললেন। রাজার ঘরণী কন্যাকে চোখে দেখবেন আশা করেননি। শান্তলা তাঁকে জৈন বস্তি নির্মাণের সংকল্প জানালেন। খুশিতে আত্মহারা মাচিকোব্বে মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'মহারাজের সম্মতি আছে তো মা?'

'আছে। আমার কোন কাজেই তিনি বাধা দেন না।'

মাচিকোব্বে জানেন সে কথা। তাঁর মেয়েই বিষ্ণুবর্ধনের প্রিয়তমা পাটরানি। তবে পুত্রবতী নন, সেজন্যই তাঁর ভয়। মায়ের মন। শান্তলার কথায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তুমি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের বস্তি নির্মাণ কর মা। তাঁর কৃপায় তোমাকে পেয়েছি বলেই তোমার নাম রেখেছি তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে।' স্বল্পভাষিণী মাচিকোব্বে অনেক কথাই বলেন, এতদিন শান্তলাও যা জানতেন না।

জৈন মন্দিরটি শেষ হল ১১২৩ সালে। অনুপম লাবণ্যময় শান্তিনাথের মূর্তি। 'শান্তিশ্বর গন্ধবারণ'। মন্দিরটি ছোট হলেও সর্বত্র শান্তলাদেবীর যত্নের ছাপ। তাঁর নিজস্ব অর্থ দিয়ে তিনি বস্তি নির্মাণ করেছেন। দান করলেন গুরু প্রভাচন্দ্রকে। যথাসময়ে বিষ্ণুবর্ধন এলেন। মহারানিকে উপহার দিলেন একটি গ্রাম, গ্রামের নামও শান্তিগ্রাম। তিন শো কুড়ি জন ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রামটি ভাগ করে দেওয়া হল। হোয়সলরাজ্যে বাস করেও এঁরা মহারানির প্রজা। মন্দির দেখে বিষ্ণুবর্ধন বললেন, 'প্রতিষ্ঠাতার নাম কই?'

শান্তলা হেসে বললেন, 'কেন ওই যে গন্ধবারণ। মনে নেই কবিকে দিয়ে আপনি লিখিয়েছিলেন, মুদবৃত্তা সাবতী গন্ধবারণেয়াম।'

বিষ্ণুবর্ধনের মনে পড়ল। হেসে বললেন, 'সেটাই তো তোমার একমাত্র পরিচয় নয়।'

'আপনার দেওয়া একমাত্র পরিচয়।'

'বাকিগুলো তো সবই কবিরা বলেছেন, সর্বগুণান্বিতা...'

'আমি তাঁদের বিশেষণে ভূষিত হতে চাই না মহারাজ। তাই আপনার দেওয়া পরিচয়টিকেই স্থায়িত্ব দিয়েছি। আমার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই।'

'কি বলছ তুমি? তোমাকে বাদ দিলে আমার তো কোন অস্তিত্বই নেই। আমার যুদ্ধযাত্রার স্মৃতি সকলের মন থেকে একদিন মুছে যাবে, বিজয়নারায়ণের মন্দির যে একবার দেখবে সে কখনও ভুলবে না। আমার কীর্তির চেয়ে তোমার কীর্তি অনেক মহৎ।'

'না মহারাজ, বিজয়নারায়ণের মন্দির আমার কীর্তি নয়। আমার প্রেম। আপনার প্রতি আমার ভালোবাসাই পাথরের বুকে রূপ নিয়েছে। ভয় হয় আবার একটি মন্দির কি অনুরূপ লাবণ্যময় হয়ে উঠবে?'

'তোমার স্পর্শে সবই হবে দেবি। তবে এবার একই সঙ্গে হবে যুগল মন্দির। একটি হোয়সলেশ্বর অপরটি শান্তলেশ্বর। দুটির দেবতাই দেবাদিদের মহাদেব। আমি জানি শৈবধর্মে তোমার শ্রদ্ধা আছে। নৃত্যগুরু নটরাজের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য।'

শান্তলার চোখে জল, 'মহারাজ, এত কথা মনে রেখেছেন আপনি?'

'তোমার কোন কথা আমি ভুলিনি শান্তলা।'

'আমি দ্বারসমুদ্রের মন্দিরটিকেও আপনার স্মরণীয় কীর্তি করে তুলব।'

চেন্নাকেশবের মূর্তিনির্মাতা নবীন তক্ষণাচার্যকেই ডেকে পাঠালেন শান্তলা। তাকে বললেন, নতুন মন্দিরটি কীভাবে সাজানো হবে। ডেকে পাঠালেন বিজয়নারায়ণের মন্দিরের কারিগরদের। আর একটি অলংকৃত মন্দির তৈরি হবে শুনে তারা ছুটে এল। অসংখ্য মূর্তি দিয়ে অলংকৃত হবে চারদিক। তবে এবার শান্তলাকে ততটা ভাবতে হবে না। শিল্পীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। নৃত্যেশ্বরের মন্দির তাই নৃত্যের সব কটি ভঙ্গি ফুটে ওঠা চাই।

নবীন তক্ষণাচার্য নকশার কিছু অদলবদল করে। শেষে একদিন বললেন, 'নটীর মূর্তি নির্মাণে শিল্পীরা দক্ষ কিন্তু নৃত্যের অষ্টভঙ্গ মুদ্রা আমিও ফুটিয়ে তুলতে পারব না। কোন মতেই সম্ভব নয়।'

শান্তলা হাসেন, 'অসম্ভব নয়। আমি দেখাব তোমাকে।'

সেই অনবদ্য নৃত্যভঙ্গি দেখে তক্ষণাচার্যের হাত গেল থেমে। সরস্বতী জ্ঞানে দুহাত জুড়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করল তাঁকে। তারপর পাথরের বুকে ফুটে উঠতে লাগল একের পর এক নৃত্যভঙ্গি। দুশো আশিটি মূর্তি আছে মন্দিরে। এত সুন্দর কারুকার্য কেউ কখনও দেখেনি। তবু শান্তলা জানতে চান অন্যান্য লিঙ্গরাজ মন্দিরের খবর। নবীন তক্ষণাচার্য অনেক খবর রাখে। সে বলে, 'রাজরাজেশ্বর মন্দিরের তুলনা নেই রানিমা। চোলরাজারা তৈরি করেছে। শিবগঙ্গার তীরে বিশাল মন্দির।'

শান্তলা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, 'কেন তুলনা নেই। বিশাল বলে? আমি শুনেছি সবাই বলে বৃহদ্বেশ্বরের মন্দির।'

'না শুধু বড় বলে নয়। মন্দিরের ওপরে আছে একটা বিরাট পাথর তার ওপর কলস। কি করে যে ওই ভারি পাথর ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জানি না। মন্দিরের অলংকরণ ছাড়াও হাতে আঁকা ছবি আছে। ওই মন্দিরটি আমার টানে।'

শুনতে শুনতে শান্তলার মনও উন্মনা হয়ে ওঠে। এমন সুন্দর মন্দিরটি তিনি দেখতে পাবেন না? তীর্থে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যদিও অনুপম লাবণ্যে সোনাঝুরি ছায়া পড়েনি তবু কোথায় যেন উদ্যাসী হাওয়ার বিষণ্ণতা। তাছাড়া তাঁকে টানছিল রাজরাজেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকৌশল। এ মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ, ওপরদিকে যদি নতুন কোন রূপ দেওয়া যায়।

মহারাজ্যের কাছে আবেদন জানালেন, 'আমি তীর্থে যাব।'

বিষ্ণুবর্ধন বললেন, 'তুমি যেখানে থাকো সেখানেই তীর্থের পবিত্রতা। কোথায় যাবে? চলো, মারালের দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। তুমি থাকলে সেই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে।' বিষ্ণুবর্ধনের এখন মন্দিরের নেশা। অনেক জায়গায় মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে। দ্বারসমুদ্রেই হচ্ছে পার্শ্বনাথ বস্তি। জৈনবস্তি নির্মাণে তাঁর আপত্তি নেই।

শান্তলা বললেন, 'আমি শিবগঙ্গায় যাব মহারাজ। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের গঠন কৌশল দেখতে। সঙ্গে তক্ষণাচার্যকেও নিয়ে যাব।'

'বেশ তাহলে তুমি শিবগঙ্গায় যাও। কিন্তু ফিরতে দেরি কোরো না। আমি পথ চেয়ে বসে থাকব।'

শান্তলা হাসলেন, 'আপনাকে ছেড়ে আমি কি বেশিদিন থাকতে পারি?'

আরও কয়েক দিন কেটে গেল। তক্ষণাচার্যের হাতের কাজ বুঝিয়ে দিতে। তীর্থযাত্রার আয়োজন করতে। যাবার সময় শান্তলা বললেন, 'চল একবার বিজয়নারায়ণের মন্দিরটি দর্শন করে যাই।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন আবার সব কিছু। চোখের পলক যেন পড়ে না। তক্ষণাচার্য মনে করিয়ে দেয়, 'শিবগঙ্গা অনেক দূরের পথ।'

শান্তলা বললেন, 'আর দেরি করবার সময়ও নেই। কাজ সেরে ফিরতে হবে শীঘ্রই, মহারাজ পথ চেয়ে থাকবেন বলেছেন।'

অন্তরালে বসে এবার বিধাতা হাসলেন। শান্তলাদেবীর আর ফেরা হল না। বৃহদেশ্বরের মন্দির দেখে তিনি নতুন কোন পকিকল্পনা করেছিলেন কি না তাও জানা গেল না। ১১৩১ সালে শিবগঙ্গাতেই শেষনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বিষ্ণুবর্ধনের জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন শান্তলা। কি করলেন তিনি? বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি যেমন শান্তলা সম্পর্কে নীরব, জৈন গ্রন্থগুলি তেমনই বলেনি বিষ্ণুবর্ধনের কথা। অথচ তারা বলেছে মাচিকোব্বের কথা। শ্রবণবেলগোলায় তাঁর আত্মবিসর্জনের কথা। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জন্যই কি?

শান্তলাদেবীর মৃত্যুর পরে বিষ্ণুবর্ধন বেঁচেছিলেন আরও দশ বছর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজাই ছিলেন ধরে নেওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে একটিও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি তিনি। শেষ করেননি হোয়সলেশ্বরের মন্দিরটি। অনবদ্য শিল্পকর্ম ও অসংখ্য দেবমূর্তি সম্বলিত, শুধু কি মূর্তি? রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, দশাবতার, সমাজব্যবস্থা যুদ্ধজয়ের উল্লাস, নৃত্যগীতের ছন্দোময় ভাস্কর্য সবই পড়ে রইল অবহেলায়। কাজ অবশ্য বন্ধ হয়নি, পরবর্তী রাজা বিষ্ণুবর্ধনের পুত্র প্রথম নৃসিংহের সময় মন্দির উদ্বোধন করা হলেও, কাজ চলেছিল আরও আশি বছর। তবু অসমাপ্ত। আজও এখানে সেখানে হঠাৎ থেমে যাওয়া অসম্পূর্ণতার ছাপ। প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার মুহূর্ত। কবে হোয়সল রাজ্য শেষ হয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে বেলাপুরম ও দ্বারসমুদ্র, বেলুর ও হ্যালেবিদের অনুপম মন্দির দুটির প্রতিটি পাথর আজও দেশবিদেশের দর্শককে বিষ্ণুবর্ধনের কীর্তি ও শান্তলাদেবীর ভালোবাসার গল্প শোনায়।

জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ ও ফুলজানি বেগম

ইতিহাসে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ আছেন, তাঁর পূর্বজীবনের কথা আছে, তাঁর বেগমের নাম নেই। রিয়াজ-উস-সালাতিন কিংবা তারিখ-ই-ফিরিস্তায় তাঁর কথা থাকলেও কেউ বেগমের নামটি উল্লেখ করেননি। অজ্ঞাত এক গ্রাম্য কবির পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর নাম ছিল ফুলজানি কিংবা আসমানতারা। সেই ফুলজানিনামা পুঁথিটিও আর নেই। কাজেই কবি কল্পনা কিংবা কিংবদন্তির জগৎ থেকে বেগমের নামটি সংগ্রহ করা হল পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

ইলিয়াসশাহী বংশের আজিম খাঁ বাস করতেন পাণ্ডুয়ায়। এখন তিনি না থাকলে কি হবে আজিমমঞ্জিল আছে, আছে শাহীবংশের আভিজাত্য এবং অন্তঃপুর। তাঁরই মেয়ে ফুলজান, ফুলের মতোই সুন্দর তিনি, ফুলের মতো কোমল তাঁর মন। হঠাৎ একদিন গিয়েছিলেন বড় দরগায় পীর জলালের সমাধিতে ফুল দিতে। ফেরবার সময় নির্জন পথে হঠাৎ শুনলেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। মহানন্দা বয়ে যাচ্ছে কিছু দূরে। আজিমমঞ্জিলও কাছেই। তাই ভয় না পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ফুলজান পালকির পর্দা সামান্য ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করলেন। বিকেল হলেও আকাশ তখন ঘোর কালো মেঘে ঢাকা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অশ্বারোহীও এসে পড়েছে কাছে। আচমকা ঝড়ে একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ল ঘোড়ার সামনে। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠতেই অশ্বারোহী পড়ে গেল মাটিতে। হতভম্ব ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলজান দেখলেন, এক রূপবান যুবক জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। ঝড়বৃষ্টির জন্য তাঁর পালকিও নামিয়ে রেখেছিল বাহকেরা। তারাই ছুটে গেল যুবকটির কাছে। ফুলজান তাদের বললেন, 'ওঁকে আমার পালকিতে নিয়ে এস।'

পালকির মধ্যেই জ্ঞান ফিরল তাঁর। অপলক দৃষ্টিতে ফুলজানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কোথায় যাচ্ছি? আপনি কে?'

দীর্ঘ ঘোমটায় মুখ ঢাকলেন ফুলজান, 'আমি আজিমমঞ্জিলে থাকি। আপনি হঠাৎ ঘোড়া থেকে...'

'মনে পড়েছে, পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।'

'আমি কিছু করিনি। আল্লা মেহেরবান। তিনি দয়া করেছেন। আপনার সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'না, আমি একাই এদিকে আসছিলাম। অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি বিদায় নিতে পারি?'

'আপনার পরিচয় জানাতে আপত্তি আছে?'

'না-না। আমার নাম জিতমল, সবাই আমাকে যদু দত্ত বলেই জানে।'

ফুলজান চমকে উঠলেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু। গৌড়ের ভাবী রাজা। বললেন, 'আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।'

উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠলেন যদু, 'অপরাধের প্রশ্নই ওঠে না। বরং পুরস্কৃত করা উচিত। কিন্তু আমার কাছে কিছুই নেই আপনাকে দেবার মতো।'

'কর্জদার হয়ে থাকাই তো ভালো।' ফুলজানের ঠোঁটের আড়ালে মুক্তোর পাঁতি।

আজিমমঞ্জিলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যদু যখন ফিরে গেলেন, তখন তাঁর মনে হল, কিছু নেই বলে দেওয়া হল না—এ কথাটা সত্য নয়, নিজের মনটিকে তিনি দিয়ে এসেছেন আজিমমঞ্জিলের নাম না জানা সুন্দরীকে।

অপরদিকে ফুলজানেরও মনে হল, তিনি প্রথম দর্শনেই যদুকে ভালোবেসে ফেলেছেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে। যদু যে হিন্দু। এই প্রেম কখনও সফল হবে না। কিন্তু তাঁর পিতা আজিম খান ছিলেন উদারপন্থী মানুষ। তিনি মানুষকেই বড় মনে করতেন, সেজন্যে হিন্দু রাজপুত্রকে ভালোবেসে মনের দিক থেকে ফুলজান একবারও নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারলেন না।

গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে তখন বিচিত্র অভিনয় শুরু হয়েছে। যদু বা জিতমলের বাবা রাজা গণেশ উচ্চাভিলাষী, বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ। ইতিহাসে রাজা গণেশের নাম কোথাও কান্স কোথাও বা দনুজমর্দনদেব। আসলে তিনজনই এক ব্যক্তি, মহানন্দা তীরবর্তী ভাতুড়িয়া গ্রামের ভূস্বামী গণেশ দত্ত। দুর্বল সুলতানকে প্রভাবিত করে তিনিই তখন রাজা। এসময় পাণ্ডুয়ায় বাস করতেন নুর-কুতব-উল আলম, এক প্রতিপত্তিশালী দরবেশ। তিনি গণেশের সিংহাসন অধিকার করার জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে আহ্বান জানালেন। জানালেন, গণেশ ইসলাম ধর্মের বিরোধী এবং তাঁর অত্যাচারে মুসলমানরা জর্জরিত। জৌনপুরের সুলতান ফিরোজপুর পর্যন্ত এলে গণেশ ভীত হয়ে দরবেশের শরণাপন্ন হলেন। দরবেশ বললেন, 'একজন কাফেরের জন্য তো আমি একজন মুসলমান শাসককে বাধা দিতে পারি না।' ইব্রাহিম শর্কী তাঁকে গুরুর মতো মান্য করতেন এবং তাঁর অনুরোধেই এসেছিলেন। নিরুপায় গণেশ বললেন, 'আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তা শুনব।'

দরবেশ এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, 'তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। তাহলে আমি তখ্‌তে বসার জন্য তোমার নাম সুপারিশ করতে পারি।' তাঁর এই কথা থেকে মনে হয়, গণেশ প্রকৃতই অত্যাচারী রাজা ছিলেন না, হলে কি দরবেশ তাঁকে রাজা হিসাবে উৎখাত করতেই চাইতেন না? এখান থেকেই শুরু হয় বহু পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা। কেউ বলেন, এসময় গণেশের পুত্র যদু বা জিৎমল মতান্তরে জাতমল পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সিংহাসনের দাবিদার হওয়ায় গণেশ সরে যেতে বাধ্য হন। অধিকাংশের মত, দরবেশের প্রস্তাবে গণেশ

কেঁপে উঠলেন। কেউই আকস্মিক ধর্ম পরিত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু সামনে বিপদ দেখে প্রায় নিরুপায় হয়েই তিনি বললেন, 'আমি রাজি আছি, তবে তার আগে আমাকে একটু ভাবার সময় দিতে হবে।'

দরবেশ বললেন, 'বেশ তো ভেবে দেখ।'

গণেশ নিজের পরিবারে এসে তাঁর বিপদের কথা জানাতেই তাঁর স্ত্রী তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

গণেশ দরবেশের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কদিনই বা বাঁচব, দয়া করে আমাকে ধর্মচ্যুত করবেন না। আপনি বরং আমার পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে সিংহাসনে বসান। আমি আর রাজত্ব করতে চাই না।'

দরবেশ দেখলেন একজন বৃদ্ধকে ধর্মান্তরিত না করে একজন যুবককে ধর্মান্তরিত করতে পারলে অনেক লাভ। সুতরাং তিনি রাজি হলেন যদুও জালালউদ্দীন হয়ে সিংহাসনে বসলেন। জৌনপুরের সুলতান দরবেশের কথায় ফিরে গেলেন।

জনশ্রুতি, জৌনপুরের সুলতান দেশছাড়া হতেই গণেশ স্বমূর্তি ধরলেন অর্থাৎ যদুকে সরিয়ে আবার সিংহাসনে বসলেন। তারপর যাবতীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে ডেকে এনে জানতে চাইলেন, কিভাবে যদুকে স্বধর্মে ফেরানো যায়? হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিতের স্বধর্মে ফিরে আসার কোন বিধান নেই। কারণ হিন্দুর সন্তান হিন্দু হয়েই জন্মায়, সে অন্যদের মতো শৈশবে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হিন্দু হয় না। তবুও এর প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়েছে। রাজা গণেশের অনুরোধে এবার ব্রাহ্মণেরা জানালেন, সুবর্ণ ধেনু দানের পর যদু আবার স্বধর্মে ফিরে আসতে পারবেন। এর অর্থ হল, বিশাল সোনার গাভী তৈরি করা হবে, তার ভিতরটা ফাঁপা, যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর যদু তার শূন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসবেন, সোনার গাভী দান করা হবে ব্রাহ্মণদের। তাই হল। অনেকগুলি সোনার গাভী তৈরি করে ব্রাহ্মণদের দান করা হল। গণেশ যদুকে নিজের সমাজে ফিরিয়ে আনলেন।

বাইরে যখন এইসব ঘটনা ঘটছিল তখন সবার অলক্ষে যদু নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন ফুলজানের দিকে। ভুল বলা হল। আজিমমঞ্জিলের সেই অপরূপ রূপসী রহস্যময়ীর প্রতি। সেজন্যই কি যদু গণেশের আদেশে অতি সহজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? কেউ বলেন, যদু তখন ছিলেন বারো বছরের কিশোর, ঘটনা পরম্পরায় তা মনে হয় না। কেউ কেউ বলেন, যদু বা জিতমল ছিলেন গণেশের মুসলমানি উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান, গণেশ কৌশলে তাঁকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পুত্র বলে দরবেশকে ঠকিয়েছিলেন। যদুর সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের নিবিড় যোগ কোনকালেই ছিল না। এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হিন্দুধর্মে ফিরে এলেও যদু পীরের দরগায় নিয়মিত যেতেন। এরপর দেখা যেত, আজিমমঞ্জিলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন এক তরুণ ফকির।

আজিম খান অত্যন্ত উদার ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁর প্রাসাদে জ্ঞানী-গুণী-ফকির-দরবেশের আনাগোনা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও এঁদের আনাগোনা বন্ধ হয়নি। এখানেই দেখা গেল নবীন ফকিরকে। অত্যন্ত রূপবান কিন্তু তিনি কোন কথা বলতেন না। শুধু

আসতেন। চলেও যেতেন। বাঁদির মুখে নবীন ফকিরের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে ফুলজান পর্দার আড়াল থেকে তাঁকে দেখলেন এবং চিনতে পারলেন। অন্য কেউ চিনতে না পারলেও তিনি কি করে ভুলবেন সেই পথিককে। নিজের পালকি করে নিজের মঞ্জিলে যাঁকে এনে তুলেছিলেন সেই যদুই তো এখন ফকিরের বেশে। কিন্তু কেন? হারেমে থাকলেও তিনি বাইরের সব খবরই পান বাঁদিদের কাছে। যদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং স্বধর্মে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে যাওয়ার কথাও শুনেছেন ফুলজান। কোন ঘটনাই তাঁর মনে দাগ কাটেনি কেন না তাঁর পিতা আজম খান তাঁকে বলতেন, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়, নিজেও তাই বিশ্বাস করতেন। ফুলজানও মানুষ যদুকে ভালোবেসেছেন। কয়েকদিন ফকিরকে দেখার পর তিনি দাসীকে বললেন ফকিরকে একটি নিভৃত কক্ষে ডেকে আনতে।

দাসীর আহ্বানে ফকির এসে দাঁড়ালেন আজিমমঞ্জিলের একটি ঘরে। ফুলজান তাঁকে দেখে পর্দার আড়াল থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যাতারার মতো দুটি চোখে স্নিগ্ধ লাবণ্য ছড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ফকিরের বেশে এখানে প্রতিদিন আসেন কেন?'

যদু মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর চোখদুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুধু আপনার জন্য। আপনাকে যদি একবার দেখতে পাই এই আশায় এখানে আসি।'

ফুলজানের মুখটি ডালিমফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল। তারপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আপনি হিন্দু। রাজার ছেলে। এদেশের ভাবী রাজা। ইতিমধ্যে অনেক ঝামেলা পুইয়েছেন। এখানে এভাবে আসবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।'

'আমি সব ক্ষতি সহ্য করেও তোমাকে দেখতে আসব, আসমানতারা।'

ফুলজান সচকিত হয়ে বললেন, 'আসমানতারা? কে সে? আমার নাম তো আসমানতারা নয়।'

'আমি জানি তোমার নাম আসমানতারা নয়। আমি তোমার নামও জানি না কিন্তু তোমার কথা না ভেবেও পারি না। তাই তোমার নাম দিয়েছি মনে মনে, আসমানতারা।'

হেসে ফেললেন ফুলজান। গ্রাম্য কবির পুঁথি থেকেই পাওয়া গিয়েছে আসমানতারা নামটি। অন্যত্র না শোনা গেলেও গৌড়ে এ নামটি শোনা যায় পল্লিগীতিকায়। যদু হয়ত সেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রিয়তমার নামটি। ফুলজানের আর নিজের নাম বলা হল না। বললেন, 'বেশ তাহলে আপনি ওই নামেই আমাকে ডাকবেন।'

যদু হেসে বললেন, 'কি করে দেখা করব? বলব, আসমানতারার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'না বলবেন, আজিম সাহেবের মেয়ের সঙ্গে দেখা করব।'

'বহুত খুব।'

'তার জন্যে ফকিরের বেশ ধরতে হবে না।'

'এ বেশ অনেক নিরাপদ।'

'জানাজানি হয়ে গেলে আপনাদের সমাজে ঝড় উঠবে।'

'আপনার কাছে অনেক দরবেশ, ফকির আসেন।'

'আমার বাবার কাছে আসতেন। এখনও আসেন। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও দেখা করেন।'

'ওঁরা বলেন আজিমসাহেবের কন্যা পিতার যোগ্য উত্তরসূরি।'

'আমার অত বিদ্যা নেই।' ফুলজান হাসিমুখে বলেন।

'সেটা আলোচনার পর ফকিরসাহেব বলতে পারবেন।' এবার দুজনেই হেসে ফেললেন।

আজিমমঞ্জিলে তরুণ ফকিরের আসা বন্ধ হল না। লোকে জানল, আজিম খানের কন্যাও পিতার মতোই ধর্মালোচনায় মগ্ন থাকেন। ফুলজান জানেন, তাঁর স্বপ্ন সফল হবে না। যতই উদার হবার ভান করুক, হিন্দু ব্রাহ্মণেরা তাঁকে রাজার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদু বলেন, 'এ তোমার মনের ভুল। আমাদের সমাজ উদার। দেখ না, আমাকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। যদিও আমি বলছি না, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল বলে আমি অনুতপ্ত। কিন্তু কারোকে জোর করে অন্য ধর্মে নিয়ে যাওয়া ভালো নয়।'

'নিশ্চয় নয়। আমার বাবাও তা চাইতেন না।'

'আমাদের ধর্ম উদার। প্রায়শ্চিত্ত করে আমি আমার ধর্মে ফিরে এসেছি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের সমাজে। আমাদের ধর্মে স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম। তুমি হবে আমার সহধর্মিণী।'

ফুলজান হেসে আকুল হন। তাঁর কাছে অনেক কিছুই নতুন মনে হয়। ভালোও লাগে। হেসে বলেন, 'আমি আপনার মতো স্বপ্ন দেখি না। দেখতে ভয় করে।'

'স্বপ্ন দেখতেও ভয়?'

'হ্যাঁ, যাকে ভালোবাসি তাকে যদি না পাই।'

দুজনেই এখন দুজনের মনের কথা জানেন। ধর্মের প্লাবন পেরিয়ে কি করে পরস্পরের কাছাকাছি আসবেন তা জানেন না। যদু স্বপ্ন দেখেন তিনি ফুলজানকে বিয়ে করে স্বধর্মে নিয়ে যাবেন। ফুলজান জানেন, যদুর ধারণা ভ্রান্ত। হিন্দুরাজার মুসলমানি উপপত্নী থাকতে পারে, সহধর্মিণী নয়।

যদু বলেন, 'আমার কথার নড়চড় হবে না, তুমি দেখো।'

'আপনার আসমানতারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে চিরদিন।'

রাজা গণেশের মৃত্যু ঘটে আচমকা। রহস্যজনকভাবে। কেউ কেউ বলেন, সিংহাসনে আবার বসেই তিনি ছেড়ে দেননি সেই দরবেশকে। নিজের ছেলেকে ধর্মচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছিলেন যার কূটকৌশলে। তিনি দরবেশের ছেলে শায়খ আনোয়ারকে হত্যা করেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গণেশেরও মৃত্যু হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের গল্পটা একটু আলাদা।

ইসলাম ধর্মের প্রতি পুত্রের অনুরাগ ক্রমশ বাড়তে দেখে ক্রুদ্ধ রাজা যদুকে কারারুদ্ধ করেন। এর আড়ালে হয়ত বা মূল কারণটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। যদু পিতাকে জানিয়েছিলেন আজিম খানের কন্যাকে তিনি বিয়ে করতে চান। ক্রুদ্ধ হয়ে গণেশ এর পরে যদুকে কারাগারে নিক্ষেপ করে চরম শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন দরবেশ

কুতব-উল-আলমকে। তাঁর মনে হয়েছিল সবটাই দরবেশের কারসাজি। একটু একটু করে তাঁর ছেলে যদুকে কেড়ে নেওয়া। ওদিকে যদুও বসে ছিলেন না। ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি পিতাকে হত্যা করেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনের কথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া গেল না। কারণ কেউই যদুকে পিতৃহন্তা বলে চিহ্নিত করেননি। এমন কি রাজা গণেশের পরে তিনি সিংহাসনেও বসেননি।

পাণ্ডুয়ার আজিমমঞ্জিলে বসে চিন্তায় চিন্তায় পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছিলেন ফুলজান। সেই যে যদু পিতার অনুমতি আনতে গৌড়ে গেলেন আর তো ফিরে এলেন না। কত কথাই তিনি শোনেন. যদু নাকি কারাগারে...রাজা গণেশ হত্যা করেছেন দরবেশের ছেলেকে...তারপর নিজেও...। ফুলজান রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। কই কেউ তো যদুর সিংহাসনে বসার খবরও তাঁকে দেয় না। কেউ কেউ বলল, যদু নাকি তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন।

'কেন?' শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেন ফুলজান।

যে গৌড়ের খবর এনেছিল সে জানাল, উড়ো খবর হল...যদু নাকি পিতাকে ভয় দেখিয়েছিলেন, তিনি ফিরে যাবেন দরবেশের কাছে...ছেলের মুখে এত বড় কথা শুনে চমক লেগেছিল রাজার মনে...তিনি বন্দি করেছিলেন যদুকে...রক্ষী আর ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যদু হত্যা করেছেন রাজাকে। ফুলজান বিশ্বাস করতে পারেন না। কোমলহৃদয় যদু তাঁর পিতাকে হত্যা করতেই পারেন না।

ওদিকে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন মহেন্দ্রদেব। কে তিনি? শোনা গেল, মহেন্দ্র যদু বা জিৎমলের ছোট ভাই। তিনি সিংহাসনে বসলেন কেন? কেউ বললেন, আসলে রাজা গণেশের বৈধ পুত্র মহেন্দ্রদেবই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যদু গণেশের পুত্র হলেও তাঁর মা ছিলেন যদুর উপপত্নী। বিপদের দিনে যদুকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে গণেশ নিজের এবং নিজের পুত্রের জাতধর্ম রক্ষা করেন। যদু মুসলমান হলেন, পরে আবার হিন্দুধর্মে ফিরেও এলেন। হিন্দুধর্মে এ ব্যবস্থা নেই। হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞেরা বললেন, 'রাজা হবেন মহেন্দ্র, হিন্দুরাজার হিন্দু সন্তান সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী।'

যদু বললেন, 'আমিও তো হিন্দু, সুবর্ণধেনু ব্রত করে আপনারাই তো আমাকে হিন্দু করেছিলেন। ধর্মও আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিনি। পিতার আদেশে করেছিলাম।'

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নির্লজ্জের মতো হাসলেন, 'ও তো মহারাজের মন রাখবার জন্যে করা হয়েছিল। সুবর্ণধেনু ব্রত কেন, হীরকধেনু ব্রত করলেও জালালউদ্দীনকে যদু করা যায় না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ধর্মত্যাগ করলে স্বধর্মে ফিরে আসার কোন রাস্তা নেই।'

ব্রাহ্মণদের লুব্ধতায় স্তম্ভিত হলেন যদু। তারপর অনুগত সঙ্গীদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন দরবেশের গৃহে। মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি ফিরে এসেছি দরবেশ। আপনারা কি আমাকে গ্রহণ করবেন?'

'নিশ্চয়। গৌড়ের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী তো আপনিই। সমস্ত মুসলমান আপনার পাশে দাঁড়াবে জালালউদ্দীন।'

খুব সহজেই মহেন্দ্রদেব সিংহাসনচ্যুত হয়ে হারিয়ে গেলেন। ৮২১ হিজরি সনে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা ছাড়া হয় পাণ্ডুয়া ও চট্টগ্রামের টাঁকশাল থেকে। একই বছরে জালালউদ্দীনের মুদ্রাও ছাড়া হয় এবং দুটি মুদ্রাই একরকম দেখতে।

সেজন্যই আর একপক্ষ মনে করেন, জালালউদ্দীন নয়, রাজা দনুজমর্দনদেব গণেশের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসে যদুই মহেন্দ্রদেব নাম গ্রহণ করেছিলেন। মুদ্রা প্রকাশের অনুমতিও দিয়েছিলেন। তারপর শাস্ত্রজ্ঞদের ডেকে বলেছিলেন তাঁর মনোবাসনার কথা। ইলিয়সশাহী বংশের মেয়েকে বিবাহ করতে চান তিনি। সেই কন্যাকে হিন্দু করতে হবে শাস্ত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শাস্ত্রজ্ঞরা সম্মত হলেন না। রাজার যবনী উপপত্নী গ্রহণের কথা তাঁরা শুনেছেন কিন্তু হিন্দু রাজার যবনী রানির কথা তাঁরা শোনেননি। যদু বললেন, 'অন্য ধর্মের মানুষকে যদি হিন্দু করতে না পারেন আমাকে কি করে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনলেন?' পণ্ডিতরা এবার সত্যি কথাই বললেন, 'আপনার পিতার কথায় আমরা যজ্ঞ করেছিলাম কিন্তু আমরা আপনাকে হিন্দু বলে মনে করি না। কোন শাস্ত্রানুষ্ঠান না করে আপনি যদি ওই কন্যাকে বিবাহ করতে চান, আমাদের আপত্তি নেই।'

যদু আবার জালালউদ্দীন হলেন। দরবেশ ও মুসলমান উজিরেরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। মৌলবি বললেন, 'জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ অনায়াসেই ইলিয়সশাহী বংশের কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন। এই দ্বিতীয় কাহিনীটিকে অবশ্য সত্য বলে মনে হয় না। কাজেই ফিরে যাই পূর্বকথায়। ব্রাহ্মণদের ব্যাখ্যা শুনে যদু তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গেলেন দরবেশের কাছে। তিনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। মুসলমান ওমরাহরা তাকে সমর্থন জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলে যদু তাঁদের সাহায্যে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করলেন। তাঁর নাম হল জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ। আজিম খানের কন্যাকে নিয়ে এলেন বেগম করে।

ফুলজান যদুকে জালালউদ্দীন নামে পেয়ে কি বেশি খুশি হলেন? প্রেমের চেয়ে ধর্মকে তিনি বড় করে দেখেননি কোনদিনই। তিনি ভালোবেসে ছিলেন যদুকে, সেই যদুই যখন জালালউদ্দীন তখন দুঃখেরই বা কী আছে? অন্তঃপুরে এসে জালালউদ্দীন বধূর ঘোমটা খুললেন, 'আসমানতারা, মহলেই নিয়ে এলাম তোমায়। এখানেই তোমায় মানায়। আগে যা বলেছি সে কথা ভুলে যাও।'

'তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব। আমি তোমার সহধর্মিনী।'

'তুমি আমার বেগম। একদিন তুমি যাকে চিনতে সে আমি অনেক বদলে গিয়েছি।'

'আমার কাছে তুমি ঠিক তেমনই আছ।'

এর পরের কয়েক বছরের ইতিহাস সবাই জানে। জালালউদ্দীনের মতো হিন্দু বিদ্বেষী রাজা ইতিহাসে কমই পাওয়া গিয়েছে। অথচ তিনি রাজা হিসেবে ভালোই ছিলেন। প্রথমেই তিনি খুঁজে খুঁজে ধরে নিয়ে এলেন সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের, যাঁরা সুবর্ণধেনু ব্রত করিয়ে তাঁকে হিন্দু করেও পরে বলেছিলেন, বিধর্মীকে কোনভাবেই হিন্দু করা যায় না। জালালউদ্দীন অতি নির্মমভাবে তাঁদের গোমাংস খাইয়ে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। আর্তের কান্নায় আকাশ বাতাস ভরে গেল। ফুলজান পর্যন্ত শিউরে

উঠলেন সেই হিংস্র বীভৎস ঘটনার কথা শুনে, 'এ কী করছ তুমি? স্বজাতির ওপরে কেউ এত অত্যাচার করে?'

জালালউদ্দীন বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'কারা আমার স্বজাতি? হিন্দুরা না মুসলমানেরা সে কথা বুঝিয়ে দাও।'

উত্তর দিতে পারেন না ফুলজান। জালালউদ্দীনকে তাঁদের সমাজই বা কতটা গ্রহণ করেছে? তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনি লক্ষ করতেন, প্রতিহিংসা নেওয়া শেষ হলে তাঁর স্বামী অত্যন্ত উদাস হয়ে পূর্বজীবনের কথা ভাবতেন। মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, 'চল আসমানতারা, সব ছেড়ে আমরা কোথাও চলে যাই।'

'কোথায় যাবে?'

'ভাতুড়িয়া গ্রামে আমার পৈত্রিক ভিটেতে।'

'সেখানে গিয়ে আমরা কি করব?'

'নতুন করে জীবন শুরু করব।'

'পারব না সব কিছু ছেড়ে যেতে।'

'তখ্‌তের নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা।' বলে হেসে ওঠেন জালালউদ্দীন।

লজ্জা পান ফুলজান, তিনি তো সিংহাসনে বসা মানুষটিকে ভালোবাসেননি, ভালোবেসেছিলেন এক সহজ সরল রাজপুত্রকে। তাঁকেই তিনি পেয়েছেন স্বামী হিসেবে, এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। বললেন, 'আহমদ তো কোন দোষ করেনি, তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করব কেন?'

'ঠিক। আহমদ আমার ছেলে, তার জন্যে নিষ্কণ্টক সিংহাসন রেখে যাওয়া আমার কর্তব্য। যদিও আমি জানি না সে তাতে সুখে থাকবে কি না।'

'কেন থাকবে না? রাজার ছেলে রাজা হতেই চায়।'

জালালউদ্দীন জানেন, ফুলজান ঠিক কথাই বলছেন, তিনিও তো রাজা হতেই চেয়েছিলেন। রাজা হয়েছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, তাঁদের শাস্তি দিয়েছেন, চরম শাস্তি। তাঁদের হাহাকার এখনও কানে বাজে। কত মন্দির ধ্বংস করেছেন কিন্তু শান্তি পেলেন কোথায়? এখন বুঝতে পারেন, শান্তি আছে মহানন্দার তীরে সামান্য কুটিরে, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায়। যেখানে আর কোনদিনই ফেরা যাবে না। জালালউদ্দীন রাজত্ব করেছিলেন ষোল বছর। এই সময়ে কোন বিদ্রোহ হয়নি, যুদ্ধও না। তাঁর মৃত্যু হয় স্বাভাবিকভাবে, যদিও সময়ের বহু আগে।

জালালউদ্দীন শুধু দেবালয় ভাঙেননি, কয়েকটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। একলাখি ইমারতটি যদিও তাঁর তৈরি করা কি না জানা যায়নি। অনেকের মতে, সেটি নির্মাণ করেন রাজা গণেশ। কিন্তু এই মসজিদ প্রাঙ্গণেই রয়েছে সুলতান জালালউদ্দীনের সমাধি। ইমারতটি তৈরি করতে সেযুগে খরচ হয়েছিল এক লাখ টাকা। যেখানে সুলতানের সমাধি সেখানে প্রবেশ করতে হয় মাথা নিচু করে অর্থাৎ অতি অপ্রশস্ত দরজা দিয়ে। দেয়ালে অনেক মূর্তি, দেখে মনে হয় হিন্দু মন্দির ভেঙে সেগুলি আনা হয়েছে। রাজা গণেশ নিশ্চয় দেবালয় গুঁড়িয়ে মসজিদ করেননি।

জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পরে আহমেদ সিংহাসনে বসলেন। তিনি ছিলেন অতি

অপদার্থ রাজা তাই এগার বছরের মধ্যেই বিদ্রোহী আমিরেরা তাঁকে দরবারের মধ্যেই হত্যা করেন। তাঁরও গতি হল পিতার পাশে। একলাখির সমাধি মন্দিরে পশ্চিমদিকের সর্বোচ্চ কবরটি জালালউদ্দীনের, পুবেরটি তাঁর ছেলের। মধ্যের ফাঁকা জায়গাটি নিজের জন্যে ভিক্ষা চাইলেন ফুলজানি বেগম। তাঁর পুত্রকে যিনি হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁকেই আরজি জানালেন, 'আমি আর কিছুই চাই না। মৃত্যুর পরে যেন স্বামীর পাশে একটু জায়গা পাই।'

তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হল। ইচ্ছে করলে তিনি আজিমমঞ্জিলে ফিরে যেতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। বাকি জীবন সেখানেই কাটাতে পারতেন। কিন্তু ফুলজান ঠিক করলেন, তিনি ভাতুড়িয়ায় যাবেন। স্বামীর ভিটেয়। যেখানে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন যদু বা জালালউদ্দীন। স্থির করলেন, হিন্দু বিধবার মতো জীবন কাটিয়ে তিনি যদুর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। সমস্ত দুঃখ সইবেন গভীর ভালোবাসায়। ধর্মত্যাগ করে যদুর কত কষ্ট হয়েছিল ভালোবাসা দিয়ে সেটুকুই বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর পরে তিনিও সমাহিত হন একলাখিতে, পিতা ও পুত্রের মাঝখানে। আজও রয়েছে তিনটি কবর। রিয়াজ-উস-সালাতিন, তারিখ-ই-ফিরিস্তা, খুরশিদ-ই-জাহাননুমা কোন গ্রন্থেই বেগমের নাম নেই। আছে শুধু তাঁর ভালোবাসার কাহিনী। মহানন্দা নদীরও পাড় ভাঙে গড়ে, তারই মধ্যে সে শোনায় জালালউদ্দীন ও ফুলজানি বেগমের গল্প।

গদাধর সিংহ ও জয়মতী

জয়মতীর নাম ইতিহাসে নেই। আসাম বুরঞ্জি বা কুলপঞ্জিতেও তিনি অনুপস্থিত। অথচ সমস্ত শিবসাগরবাসীর কাছে তিনি স্বকালের সীমা পেরনো চিরকালের মানুষ। ইতিহাসে তাঁর নাম না থাকলেও ঐতিহাসিকেরা তাঁর অস্তিত্বের কথা একবারও অস্বীকার করেননি। বাস্তবে, কল্পনায়, সাহিত্যে, ইতিকথায় মিলে মিশে জয়মতী পূর্বভারতে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর স্বামী স্বর্গদেব গদাধর সিংহ ১৬৮১ সালে যখন গড়গাঁও কারেংঘরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তখন জয়মতী নেই, কিন্তু বেঁচে ছিল তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম।

উজনি অসমের পর্বতশূন্য হরিৎ সমতলভূমিতে স্রোতস্বিনী দিখৌ এবং দিশাং-এর তীরে গড়ে ওঠা সকলের চোখ জুড়নো রংপুরই হচ্ছে আজকের শিবসাগর। জয়মতী এবং গদাধরের সময় এসব কিছুই ছিল না। আহোমরাজ স্বর্গদেব গদাধর সিংহের নাম তখন ছিল গদাপাণি। একজন সুস্থ সবল কৃষক যুবক ছিলেন তিনি আর তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী জয়মতী। ইতিহাসে জয়মতীর নাম না থাকলে কি হবে, সেখানে লেখা আছে, স্বর্গদেব গদাধর সিংহের পত্নীর কথা। রাজার পত্নী হলেও জয়মতী কোনদিন রানি হননি, তাঁর নীরব প্রেম ও অবিস্মরণীয় আত্মাহুতির মূল্যেই গদাধর পেয়েছিলেন আহোম রাজ্য। বুরঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন ২৯তম আহোম রাজা।

গদাপাণি আর জয়মতীর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে রয়েছেন আহোম রাজারা। তাঁদের কথা ভালোভাবে না জানলে সবটাই কেমন যেন অর্থহীন হয়ে পড়বে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যেমন বারবার বিদেশিদের আক্রমণ হয়েছিল তেমনই পুব সীমান্তেও বিদেশিরা এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন শ্যামদেশ বা আধুনিক থাইল্যান্ড থেকে, ব্রহ্মদেশ বা মিয়াম্মা হয়ে। সান বংশীয় চাও সুকাফা ব্রহ্মদেশের মৌলং অঞ্চল থেকে সুযোগ বুঝে এক বোরো রাজাকে আক্রমণ করে হারিয়ে দিয়ে দিখৌ দিশাং তটে আহোম রাজ্যের পত্তন করেন ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে। আহোম শব্দের অর্থ হল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ধরে নিতে পারি, পরবর্তীকালে এই নামটিই প্রথমে আসাম ও পরে অসম হয়েছে। কিন্তু আধুনিক অসমের সঙ্গে আহোম রাজ্যের পুরোপুরি মিল নেই। গোয়ালপাড়া, সিলেট ও কাছাড় কখনও আহোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আহোমরাও শিবসাগর অঞ্চলেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পরে তাঁদের রাজ্যের সীমা লখিমপুর, নওগাঁ

দরং, এবং কামরূপে প্রসারিত হয়। আহোম রাজাদের রাজত্বকাল প্রায় ছশো বছর (১২২৮-১৮২৫)। এঁদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল। এদেশে বসবাস করতে করতে তাঁরা অবশ্য হিন্দুধর্মের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। বাহ্যিক আচার বিচারে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন, প্রথম দিকে সব আহোম রাজার নামের সঙ্গে শুরুতে 'সু' এবং শেষে 'ফা' থাকত। সু হচ্ছে বাঘ আর ফা হচ্ছে স্বর্গ। সব রাজাই ব্যাঘ্রবিক্রম এবং স্বর্গবাসী। ১৪৯৭ সালে সুহুমফা সিংহাসনে বসে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। সপ্তদশ রাজা সুচেংফা সিংহাসনে বসে নতুন নাম গ্রহণ করলেন স্বর্গদেব প্রতাপসিংহ। নামের অর্থ পুরোপুরি বদলাল না, স্বর্গবাসীর বদলে হল স্বর্গদেব আর বাঘের বদলে এল সিংহ। নামটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও বেশ খাপ খেয়ে গেল। হিন্দুধর্মকে রাজধর্ম বলে ঘোষণা করা হল। তবে নিজেদের মধ্যে এঁরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও নিয়ম কানুন নিয়েই রইলেন। সর্বমোট ৩৯জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। প্রতাপসিংহ শুধু নিজের নামই বদলাননি। তাঁদের পুরনো রাজধানী চরাইদেও থেকে চলে এলেন নতুন রাজধানী গড়গাঁওয়ে।

আহোম রাজাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছিল। সেখানে সব সময় শুধু রাজার ছেলে রাজা হত না। রাজবংশের যে কেউ প্রজাদের অনুমোদন পেয়ে সিংহাসনে বসতে পারত। তবে রাজাকে শুধু রাজবংশের ছেলে হতে হত তা নয়, নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হতে হত। দেহ যার বিকৃত মন তার সুস্থ হতে পারে না। রাজসিংহাসনে যে একবার স্বল্প কটি দিনের জন্য বসেছে, পুরুষানুক্রমে তার উত্তরপুরুষেরাও সিংহাসনের দাবিদার হতে পারত। আর এভাবে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধি পেতে থাকায় রাজাদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হত। আহোম রাজাদের জীবনে যুদ্ধ লেগেই থাকত সব সময়। সিংহাসনটি নিষ্কণ্টক ও সুরক্ষিত করার জন্য রাজারা সিংহাসনে বসেই খুঁজে পেতে অন্য উত্তরাধিকারীদের ধরে এনে তার কানটি কেটে ফেলতেন। খুঁত থাকলে রাজা হওয়া যায় না। বুদ্ধিমান রাজারা বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যাও করত। প্রজাদের রাজস্ব দেবার ব্যবস্থাটিও নতুন ধরনের। তারা টাকা না দিয়ে রাজকর দিত বেগার খেটে বা ব্যক্তিগত কাজ করে দিয়ে।

এই পটভূমিতে গদাপাণি ও জয়মতীকে দেখতে হবে। গদাপাণির বাবা কোন এক সময়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আহোম সিংহাসনে বসেছিলেন। কিংবদন্তি বলে তাঁর নাম ছিল গোবর রাজা। আসল নাম কেউ জানে না। গদাপাণি জ্ঞান হয়ে অবধি জেনেছেন তিনি কৃষকের সন্তান। তাতে তাঁর কোন দুঃখ ছিল না। পরম সুন্দর, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী গদাপাণির রাজ্যপাট ছিল শস্যভরা জুমখেত, মৃগয়াভূমি ছিল নাগা পাহাড়ের ঘন অরণ্য। কারেংঘর বা রাজপ্রাসাদ ছিল পাতায় ছাওয়া কুটিরটি। গদাপাণির জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দে যোলোকলায় পূর্ণ হয়ে উঠল, যেদিন মাদুরিবাসী লাইথেপেনা বড় গোহাইয়ের অপরূপ রূপসী মেয়ে জয়মতীর সঙ্গে বিয়ে স্থির হল। বংশাবলীতে আছে লাইথেপেনা বড় গোহাইয়ের তেরটি ভার্যা, চব্বিশটি পুত্র ও তেরটি কন্যা ছিলেন, জয়মতী তাঁদেরই একজন। গানে আছে :

মাদুরি চহরত ডাঙর হৈ আছিলো
বড়গোঁহাইর হৈছিলো জি।
গদাপাণি কোরবে নিয়ে তিংখাঙলৈ
চকলং বিয়া কৈঁ দি।।

সুতরাং গদাপাণি কুমারের সঙ্গে বড়গোঁহাইয়ের ঝি জয়মতীর বিয়ে বুরঞ্জিসম্মত। আহোম রাজাদের নিজস্ব ভাষায় এবং নিজস্ব লিপিতে ভূর্জপত্রে বংশলতিকা বিন্যস্ত হত, তাকেই বলা হত বুরঞ্জি। পরবর্তীকালে এই ভাষা এবং লিপি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বুরঞ্জি অনুসরণ করে জানা যায় প্রথমে এঁরা জাতিভেদ মানতেন না, অসবর্ণ বিয়েতে কোনও বাধা ছিল না। সাধারণত উপজাতির যুবক যুবতীরা নিজেদের জীবনসঙ্গী নিজেরাই খুঁজে নেন কিন্তু বুরঞ্জি গদাপাণির সঙ্গে জয়মতীর প্রাকবিবাহ প্রণয়পর্বের আভাস দেয় না। বরং মনে হয়, মেয়েটি ডাগর হয়েছে দেখে এবং হঠাৎ অতি সুপাত্র গদাপাণি কুমারকে পেয়ে বড় গোঁহাই বিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

পরমা সুন্দরী জয়মতীকে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলেন গদাপাণি, পত্নীভাগ্যে গর্বে তাঁর উঁচু মাথা যেন আরও উঁচু হয়ে গেল। অনুরূপ খুশি হলেন জয়মতীও। বিয়ে যারা দেখল তারাও খুশি হয়ে বলাবলি করল, এ যেন শালগাছের বুকে লতানো সোনাঝুরি। এত সুখ, এত প্রেম যে তাঁদের কপালে ছিল, গদাপাণি ও জয়মতী কল্পনাও করতে পারেননি। চক্রবাক মিথুনের মতো তাঁরা জগত সংসারকে ভুলে নিজেদের নিয়েই কাটান। রাজা আসে, রাজা যায় তাঁদের মনে কোন দাগ পড়ে না। সারাদিন নিজের জুমখেতে কাজ করেন গদাপাণি, যখন দরকার হয়, হাসিমুখে বেগার দিতে যান 'পাইকে'র কাছে। গ্রামের তিন গৃহস্বামী একত্র হয়ে সমাজ পরিচালনা করতেন আহোম রাজাদের সময়ে। এঁরাই হতেন গ্রামের মাথা। সবাই সুন্দর ও সুশীল গদাপাণিকে বলতে, 'একদিন তুই পাইক হবি গদাপাণি, এখন থেকে একটু ভাবনা চিন্তা কর।' গদাপাণি হাসতেন, 'ওসব কাজ আমাদের জন্যে নয় গো। আমি সামান্য মানুষ । বল, তোমার কি কাজ করে দিতে হবে?' সবার সব কাজই তিনি করে দেন হাসিমুখে। কেউ বলেন, 'কি সুন্দর রাজার মতো চেহারা তোর গদাপাণি।' গদাপাণি তাতেও হাসেন, 'রাজাই তো। নিজের ঘর আছে, খেত আছে, গোয়ালে গরু, আঙনে সবজি, গরাইয়ে ধান, বাগানে ফল, বনের মধু, দাওয়ায় তাঁত, মুগাগুটি থেকে সোনার মতো কাপড় বোনে রানির মতো সুন্দরী বউ। রাজার কি এত সুখ আছে?' সবাই হাসে, 'গদাপাণিটা ঠিক বলেছে। এত সুখ রাজারও নেই।'

জয়মতী শুধু তাঁত বুনতেই জানেন না, রান্না করেন, ঝরনা থেকে জল আনেন, গদাপাণির আরাধ্যা দেবীর পুজোর আয়োজন করেন। গদাপাণি ভক্তি করে দেবীর পুজো করেন। কুলদেবীর মূর্তিটি তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া। এই দেবীমূর্তিই হয়ত তাঁর রাজচিহ্নের প্রতীক। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাও যায় না। সন্ধ্যায় নাগা পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের ছায়া পেরিয়ে যেদিন চাঁদ ওঠে সেদিন গদাপাণি বাঁশি বাজান,

তার মধুর সুরে জয়মতীর মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। এক একদিন তাঁরা ঝগড়া করেন। সত্যি ঝগড়া নয়, তার ভান শুধু। গদাপাণি এসে হয়ত বললেন. 'আজ যেখানে ব্যাগার দিতে গেছিলাম তারা কি বলল জানিস?'

জয়মতী বললেন, 'আমি কি করে জানব? আমি কি ব্যাগার দিতে গেছিলাম? নিশ্চয় বলছিল, আমাকে বিয়ে করে তোমার হাড়ির হাল হয়েছে।'

'উলটো কথা। ওরা বলছিল, তোর এমন রানির মতো রূপ, আমার মতো গরিবের হাতে পড়ে জলে গেল।'

জয়মতী চটে আগুন হয়ে বলেন, 'তাতে তাদের কি?' তাঁর চটে উঠে মরালির মতো গলাটি আরও উঁচু করে তেড়ে আসার ভঙ্গিটি গদাপাণির ভারী ভালো লাগে। আহোম সমাজ হিন্দুদের মতো কড়া নয়। জয়মতী যদি তাঁর আধখানা মন হঠাৎ কাউকে দিয়ে বসতেন, আকাশ ভেঙে পড়ত না গদাপাণির মাথায়। কিন্তু এ মেয়ের সঙ্গে কারোর তুলনা চলে না। ভালোবাসা দূরে থাকুক জয়মতী আর কারও মুখের দিকে চেয়েও দেখেন না।

আবার একদিন জয়মতী হয়ত বললেন, 'কাল থেকে আর জল আনতে যাব না।'

'কেন রে? তোর আবার কি হল?' হাতের কাজ থামিয়ে বলেন গদাপাণি বুঝতে পারেন জয়মতীর আজ ঝগড়া করবার শখ হয়েছে।

'কেন আবার? গাঁয়ের মেয়েরা যে তোমার জন্যে পাগল। আমি যেন তাদের পথের কাঁটা। চলে যাব যে দিকে দুচোখ যায়।'

গদাপাণি কখনও বলেন, 'যা তো দেখি? তুই চলে গেলে আমাকে ভাত রেঁধে দেবে কে?'

'কেন? যাকে নতুন করে ঘরে এনে তুলবে, সে-ই রেঁধে দেবে।'

কখনও গদাপাণি বলেন, 'তাও কি হয় নাকি? তোর হাতের রান্না যে খেয়েছে তার মুখে কি আর কিছু রুচবে?' ভারী খুশি হন জয়মতী। আবার মাঝে মাঝে গদাপাণি বলেন, 'যা তাহলে। পাইকের একটা ডাগর মেয়েকে ঘরে এনে তুলব। তাহলে আর এত ব্যাগার দিতে হবে না।'

জয়মতী খেপে উঠে বলেন, 'নিয়ে এস দেখি তাকে। নাক কেটে দেব তার।'

হো হো করে হেসে ওঠেন গদাপাণি, 'বুঁচি বউ নিয়ে ঘর করতে পারব না। তা তুই কোথায় চলে যাবি বললি যে। কার সঙ্গে যাবি?'

রেগে উঠে জয়ামতী তাঁকে মারতে ছুটে এলে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন গদাপাণি। দুজনের ঝগড়া মিটে যায়। গদাপাণি দুহাতে জয়মতীর মুখটি তুলে ধরে ভালো করে নিরীক্ষণ করেন, 'সত্যি রানির মতো রূপ তোর।'

হাত ছাড়িয়ে নেন জয়মতী, 'আবার রানির মতো? কটা রানি দেখেছ তুমি?'

'একটাও না। কোথা থেকে দেখব? আমি গরিব মানুষ। তবে শুনেছি রানিরা রূপসী হয়। কারেংঘরে মাটির নীচে থাকে। তাদের কেউ দেখতে পায় না।'

'ওমা? মাটির নীচে থাকবে কেন? সেখানে আলো নেই, হাওয়া নেই।'

'না থাকুক। রাজার তো কোন অভাব নেই। তারা দিনের বেলা বাতি জ্বালে। লিগড়িরা বাতাস করে। কোন অভাব নেই। তুই রানি হলে তুইও ঘরের মধ্যে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতিস।'

'আমার রানি হয়ে কাজ নেই। আমার মতো সুখে কি রানিরা থাকে?'

'তুই আমার মনের মতো কথা বলেছিস। এত সুখ কি রাজার ভাগ্যে জোটে।' গদাপাণি হয়ত জানতেন তাঁর রক্তেও আছে সিংহাসনের অধিকার। বাল্যকালে পিতার মুখে শুনেছেন তাঁর রাজা হবার গল্প। কোনদিন টান খুঁজে পাননি মনের মধ্যে। রাজা রানির গল্পটা সীমাবদ্ধ থেকেছে তাঁর দাম্পত্য জীবনের পরতে পরতে।

দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে গদাপাণি ও জয়মতীর সুখের সংসার। একে একে এসে গেল তিনটি অতিথি। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। কচি কণ্ঠের কলকাকলিতে ঘর ভরে গেল। দেখতে দেখতে কেটে গেল ষোলোটি বছর।

আহোম রাজ্যে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সুশাসক প্রতাপসিংহের পরে আরও জনা দশেক রাজ এসেছেন, গিয়েছেন। ভালোমানুষ সুদেফা বেশি বয়সেই রাজা হয়েছিলেন। নামেই রাজা আসলে তখন ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে দুই মন্ত্রী বড় গোহাইন ও বুড়া গোহাইনের মধ্যে। একদিকে শত্রুর আক্রমণ অন্যদিকে ঘরোয়া বিবাদের জেরে আহোম রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠলেন লালুকসোলা বড়ফুকন। তিনি সুদেফাকে গুপ্ত হত্যা করে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসালেন চোদ্দ বছরের বালক সুলিকফাকে। সুলিকফা আহোম রাজ্যে লোরা রাজা নামেই পরিচিত। লোরা হচ্ছে খোকা। এঁর পোশাকি ভারতীয় নামও নিশ্চয় একটা ছিল, জানা যায়নি। মন্ত্রী লালুকসোলা নিজের এক পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে সুলিকফার বিয়ে দিয়ে রাজার শ্বশুর হয়ে বসলেন। সম্ভব হলে নিজেই বসতেন কিন্তু আহোম রীতি অনুযায়ী তা সম্ভব ছিল না। রাজার নাম করে তাঁর অভিভাবক সেজে লালুকসোলা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে অত্যাচার শুরু করলেন। জামাই নয়, আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল নিজের একমাত্র ছেলের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা। তবু সুলিকফার সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য তিনি তাঁর নামেই হুকুম জারি করলেন, সিংহাসনের ওপর যার কিছুমাত্র দাবি আছে তাদের ধরে নিয়ে আসবার জন্য। শুরু হল, কুমারমেধ যজ্ঞ, শিশু, বৃদ্ধ যে যেখানে ছিল তাদের ধরে নিয়ে এসে হত্যা করা হল নির্বিচারে। এবার আর অঙ্গহানি নয়, পুরোপুরি হত্যা। লালুকসোলার মনে ভয় ছিল, তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা হয়ত এবার সুলিকফাকে সরাবার জন্য কোন কানকাটা লোক খুঁজে এনে তাকে নিয়ে বিদ্রোহ করবে কিন্তু রাজবংশীয় কেউ কোথাও বেঁচে না থাকলে তারা কিছুতেই লোরা রাজাকে সরাতে পারবে না।

পণ্ডিতরা বসে গেলেন বুরঞ্জি নিয়ে। পূর্ববর্তী সাতাশজন রাজার আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে খুঁজে বার করতে। প্রথমে গদাপাণির নাম তাঁদের কারোর মনেই পড়েনি। তাঁর বাবা কবে, কোনকালে রাজা হয়েছিলেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

গদাপাণি নিজেও থাকতেন দূরে, নাগা পাহাড়ের সানুদেশে এক অখ্যাত গ্রামে। কোনদিন রাজধানী গড়গাঁও কিংবা পুরনো রাজধানী চরাইদেওয়ে আসেননি। একমাত্র জয়মতীর হৃদয় সিংহাসনের অধীশ্বর হয়েই তিনি তৃপ্তি পেতেন। সেই কবে জয়মতীকে ঘরে আনবার সময় যা তিনি গ্রাম থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর লাইথেপেনা বড়গোহাইয়ের পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের কোন যোগ নেই। কিন্তু বুরঞ্জিতে ছিল তাঁর পিতার নাম। খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল গদাপাণি কুমারের নাম। বুরঞ্জি পাঠোদ্ধার শেষ করে পণ্ডিতেরা বললেন, গদাপাণি কুমার নিশ্চয় কোথাও আছেন। লালুকসোলা বললেন, 'যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বার করা চাই। গ্রামে গ্রামে পাইকের কাছে খবর পাঠিয়ে দাও। যারা ব্যাগার দিয়ে রাজকর শোধ করে তাদের বলে দাও, কাজ করতে হবে না, তোমরা গদাপাণির খবর জানো।'

খবর হাওয়ায় ভাসে। গ্রামসুবাদে খবর এল, গদাপাণি কুমার বেঁচে আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অঙ্গের অধিকারী এবং অমিত শক্তিধর। লালুকসোলা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি সর্বনাশ। এখনই তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

দুঃসংবাদ হাওয়ায় ভাসে। গদাপাণিকে খোঁজা হচ্ছে খবরটা নাগা পাহাড়ের কাছাকাছি নিরিবিলি সেই গ্রামটিতেও পৌঁছেছিল। পাইকেরা মনে মনে ভয় পেলেও নিরীহ গদাপাণিকে বড়ফুকনের আদেশ মতো গড়গাঁও পৌঁছে দেবার বিরোধী ছিলেন। কি দরকার? আপনভোলা ছেলেটা কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উপকার ছাড়া অপকার করেনি কোন দিন। তাঁরা গদাপাণিকে অযথা ভয় দেখালেন না। বরং কাজে এলেই পাঠিয়ে দিতেন পাহাড়ে, মধু কিংবা কাঠ সংগ্রহের কাজে। তাই গদাপাণি বুঝতেও পারেননি, কতখানি বিপদ তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসছে। সর্বশেষ খবরটি প্রথম এল জয়মতীর কাছে। ঝরনায় জল আনতে গিয়ে শুনলেন রাজার পিয়াদা আসছে তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যেতে। জলভরা ঘট ঝরনার ধারেই পড়ে রইল, উন্মাদিনীর মতো তিনি ছুটে এলেন তাঁর কুটিরে। দেখা হল বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান বা একজন শুভার্থীর সঙ্গে। তিনি আসছিলেন গদাপাণিকে সাবধান করে দিতে। জয়মতীকে দেখেই তিনি বললেন, 'শিগগির ঘরে গিয়ে গদাপাণিকে বল এখান থেকে পালিয়ে যেতে। বড়ফুকনের পিয়াদা আসছে। এতদিন আমরা ঠেকিয়ে রেখেছি আর তো পারব না মা।'

জয়মতী এক ছুটে ঘরে ফিরলেন কিন্তু কোথায় গদাপাণি? আর কেউ না জানুক জয়মতী জানেন। গদাপাণির আরাধ্য দেবীর মূর্তিটি বুকে তুলে নিয়ে কিছু খাবার নিয়ে একটি পুঁটলি বেঁধে তিনি ছুটলেন জুমখেত পেরিয়ে ওপারের বড় গাছগুলোর দিকে। ফসলকাটা কর্কশ মাটিতে তাঁর পাদুটি রক্তাক্ত হল। বসন্ত আসছে। শীতের পাতাঝরা অরণ্যে কচি পাতার উঁকিঝুঁকি, অন্য সময় হলে জয়মতী মুগ্ধ হয়ে খুঁজতেন মৌ ফুলের সুঘ্রাণের উৎস। এখন ত্রস্ত হরিণীর মতো তিনি ব্যাকুল হয়ে খোঁজেন গদাপাণিকে। দেখা হতেই জয়মতী ছুটে এলেন গদাপাণির কাছে। চমকে ওঠেন গদাপাণি, 'কি হয়েছে তোর? এমন করে ছুটে এলি কেন?'

জয়মতী বলেন, 'তুমি পালাও। রাজার পিয়াদা আসছে তোমার ধরতে।'

'আমাকে ধরতে আসছে কেন? আমি তো কিছু করিনি। তবে বোধহয় রাজা করবে আমাকে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠেন গদাপাণি।

জ্বলে ওঠেন জয়মতী, 'রাজা করবে না তোমার কান কেটে নেবে আমি তা জানি না। মাদুরিতে থাকতে শুনেছিলাম, যার গায়ে রাজরক্ত থাকে রাজা তার কান কেটে নেয়। রাজা তো মরেনি যে তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে রাজা করবে। তাছাড়া পাইকেদের একজন বলে গেছেন আমাকে, তোমার নাকি বড় বিপদ।' কেঁদে ফেলেন জয়মতী। আর তেজস্বিনী, রজনীগন্ধার মতো সবুজ, সতেজ জয়মতীকে কাঁদতে দেখে ভয় পেয়ে যান গদাপাণিও।

'কি হবে তাহলে?' ভয়ে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

জয়মতী নিজেকে সামলে নেন। খালি হাতে ভালুক মারার মতো সাহস দেখালে কি হবে আসলে তো গদাপাণি সরল মানুষ। তিনি চোখ মুছে বললেন, 'তুমি পালাও। নাগা পাহাড়ে পালিয়ে যাও। কেউ ওখানে তোমাকে খুঁজে আনতে পারবে না।'

নাগা পর্বতের অরণ্যও শ্বাপদসঙ্কুল, পদে পদে ভয়, একটু অসতর্ক হলে নাগা পুরুষেরা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে হত্যা করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তো অনিশ্চিত বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াই ভালো। গদাপাণি সেই পথই বেছে নিলেন। শুধু বললেন, 'তোরা কোথায় যাবি?'

চোখ মুছে জয়মতী বললেন, 'ছেলেদুটোকে কোথাও পাঠিয়ে দেব। রাজা তো জানে না তোমার ছেলেদের কথা। বুরঞ্জিতে তাদের নামও নেই। আমি মেয়েকে নিয়ে ঘরেই থাকব।' জোর করে হাসি টেনে বলেন, 'আমাদের নিয়ে গিয়ে তো আর রাজা করবে না। নিশ্চিন্ত মনে যাও তুমি।'

গদাপাণি তাই করলেন। খাবারের পুঁটলিটি পিঠে ফেলে হারিয়ে গেলেন বনের মধ্যে। আরাধ্যা দেবী রইলেন সঙ্গে। প্রিয়তমা স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, নিশ্চিন্ত আশ্রয় পড়ে রইল অনেক দূরে। জয়মতী নীরবে বাড়ি ফিরে এলেন। কিশোর পুত্রদুটিকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। চোখের জল মুছে তাদের বললেন, 'পরের দুয়ারে খেটে খাবি বাবা আর কখনও কাউকে বলিসনি তোরা আমাদের ছেলে। তাহলে তোদেরও মেরে ফেলবে।' মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক সবাই বোঝে। জয়মতীর বড় ছেলে তখন কিশোর, চোদ্দ বছর বয়স, পালিয়ে গিয়েও তিনি দূর থেকে নিজেদের পরিবারটিকে ভুলে গেলেন না। ছোট ছেলেটি মিশে গেল জনারণ্যে, গ্রামান্তরে।

স্বামী পুত্রদের বিদায় দিয়ে জয়মতী সাহসে বুক বেধে তাঁর নির্জন কুটিরে পড়ে রইলেন একা, পাঁচ বছরের মেয়েটি রইল সঙ্গে। মাদুরি যেতে পারতেন। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বাবা বা ভাইদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। আবার সেখানে গেলে তাদেরও তো বিপদ। তাছাড়া, মনে ক্ষীণ আশা গদাপাণি যদি কোনভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কোন সাহায্য চান, ঘর ছেড়ে গেলে কার কাছে তিনি আসবেন?

বড়ফুকনের পিয়াদা এল দুচার দিনের মধ্যেই। জয়মতী নিপাট মুখে বললেন, 'তাকে আমিও তো খুঁজছি সকাল থেকে। রাতে শুয়েছিল। ভোর না হতেই না জানি কোথায় কোথায় গেল।' কয়েকদিন আসা যাওয়া করল তারা। জয়মতী চোখের জল ফেলে বললেন, 'নিশ্চয় কোন ডাগর মেয়েকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে। একা আমি এই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাব কি করে? 'রাজার চরেরা নতুন করে খোঁজ খবর শুরু করল। শুনল, গদাপাণি আর জয়মতীর দাম্পত্যপ্রেমের গল্প। তাদের সন্দেহ হল, গদাপাণি কুমার সবার অলক্ষ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন কোথাও। খবর গেল লালুকসোলার কাছে। ক্রোধে-ভয়ে জ্বলে উঠলেন লালুকসোলা 'এ তো আরও ভয়ের কথা। এতদিন কেউ জানত না। হয়ত গদাপাণি নিজেও রাজা হবার কথা ভাবত না। কিন্তু এখন অনেকেই জেনে গেছে তার কথা। যেমন করে পারো তাকে ধরে নিয়ে এসো। সে বাড়িতে নেই তো কি হয়েছে তার পরিবারের সবাইকে ধরে আনো।'

আহোম রাজার সেনাপতি এসে আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে যাওয়া গৃহবধূটিকে ধরে নিয়ে গেল রংপুরে। কোলের মেয়েটিকেও ছেড়ে দিল না। জয়মতীর সাধের সংসার সাজানো পড়ে রইল অবহেলায়। গ্রামের মানুষ নীরবে পিছু নিল তাদের। ভয়ে ভয়ে একটা কথাও বলতে পারল না। প্রথমে জয়মতীকে বোঝাতে বসল লিগড়ি দাসীরা। লোভ দেখাল। ভয় দেখাল। কিন্তু জয়মতী কোন কথাই বলেন না। তাঁর একটাই কথা। প্রথম থেকে বলে আসছেন, তাঁর স্বামী কোথায় তিনি জানেন না। লিগড়িরা এরপর হিংস্র হয়ে উঠল। কোড়া বা চাবুক নিয়ে এল, 'বল্ তোকে বলতেই হবে।' প্রথমে জয়মতী অনুনয় বিনয় করেছিলেন, 'সত্যিই আমি জানি না কোন কথা... ও দিদি আমাদের কিছু বোলো না...পায়ে পড়ি তোমাদের ...আমি কিছু জানি না।' কিন্তু চোখের সামনেই যখন তিন দিন অনাহারে থেকে অবিশ্রান্ত মার খেয়ে পাঁচ বছরের মেয়েটি তার সব চঞ্চলতা হারিয়ে নিথর হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল তখন সরলা কৃষকবধূটিও পাথর হয়ে গেল। লিগড়িরা হার মানল।

সেনাপতি বলল, 'লিগড়িদের দিয়ে কাজ হবে না। জল্লাদকে ডেকে আনো।' জয়মতীর দৈহিক নিপীড়নের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। মানুষ যখন পশু হয়ে ওঠে বনের পশুও তখন লজ্জা পায়। কিংবদন্তি বলে, জয়মতীর জন্য পশুপাখিও কেঁদেছিল। আর মানুষ? তারা ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল অন্তরে অন্তরে। কারান্তরালে লোভীদের হাতে ক্ষতবিক্ষত হবার পরে জয়মতীকে নিয়ে আসা হল জারেঙ্গা পোথারে। ধু-ধু রোদে মাটি ফাটা নিস্তরু বিশাল মাঠে খুঁটি পুঁতে তাতে বেঁধে রাখা হল জয়মতীকে। তাঁকে কোড়া মারতে শুরু করল জল্লাদ। মারল, যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়ে কোড়া ফেলে জল খেতে গেল। জয়মতীকে দেওয়া হল না এক গণ্ডুষ তৃষ্ণার জল। যারা দেখল, তারা শিউরে উঠল আতঙ্কে, যন্ত্রণায়।

অসমের পদ্য বুরঞ্জি'তে এ সংবাদ আছে। লোকমুখে জয়মতীর খবর যখন দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল, শুনতে পেলেন গদাপাণিও। প্রাণভয়ে নাগা পর্বতে পালিয়ে গেলেও

তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন অবিশ্বাস্যভাবে। তাঁর দীর্ঘ, সুঠাম শরীর দেখে নাগারা বুঝতেই পারেননি তিনি কে। আসলে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন এক নাগা যুবতীর। সেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। কাজেই তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বাধীনতা দুই-ই ছিল। এই রূপসী নাগা যুবতীর নাম বুরঞ্জিতে নেই কিন্তু পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তাঁকে ডেকেছেন জিনু বলে আর লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়া তাঁর নাটকে নাম দিয়েছেন ডালিমি। নামদুটি কাল্পনিক, চরিত্রটি নয়। এই নাগা যুবতী গদাপাণিকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আরও মুগ্ধ হলেন তাঁর অকপট সারল্য দেখে। গদাপাণি চেয়েছিলেন সাময়িক একটি আশ্রয়। নাগা যুবতী তাঁকে সবই দিয়েছিলেন এবং গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললেন এই ভাগ্যহত মানুষটিকে। প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে উঠে গদাপাণি নিজের সুখের সংসারটির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নাগা যুবতী তাঁকে ফিরতে দিলেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, আহোম রাজ্যে ফিরলেই গদাপাণি বিপদে পড়বেন। তিনি অন্যদের সাহায্যে জয়মতীর খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। জয়মতীর নাম তখন সবার মুখে। তাঁর অত্যাচারের কথা শুনে কেঁদে ফেললেন গদাপাণি। বললেন, 'আমি যাব সেখানে। তাতে আমার যা হয় হোক।' তাঁর অবস্থা দেখে মেয়েটিও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চল, আমি তোমায় নিয়ে যাব রংপুরে। পথ আমি চিনি। তোমাকে নিয়ে যাব নাগা পুরুষের বেশে। কেউ যাতে চিনতে না পারে।'

গদাপাণি বললেন, 'না, আমার যা হয় হোক। তুমি আমার পরম উপকার করেছ। খেতে দিয়েছ। আশ্রয় দিয়েছ। তোমাকে আমি বিপদের মধ্যে নিয়ে যাব না।'

নাগা যুবতী শুনলেন না, জোর করে নাগা দম্পতির বেশে চললেন জারেঙ্গা পোথারো গদাপাণি আবার দেশে ফিরলেন। দুঃসময়ের আশ্রয়দাত্রীকে বিপদের মধ্যে ফেলতে তাঁর মন সায় না দিলেও নাগা যুবতীর কথামতোই এলেন নাগা পুরুষের বেশে। খুঁজে খুঁজে পৌঁছোলেন জারেঙ্গা পোথারে। সেখানে তখন মৌন মানুষের ভীড় কেবলই বাড়ছে। অসহায় মানুষেরা আসছে পতিব্রতা জয়মতীকে একবার চোখের দেখা দেখতে। তাঁর কষ্ট লাঘব করতে পারছে না কিন্তু দুঃখের শরিক হচ্ছে। এমনই আগন্তুক দলের সঙ্গে মিশে গেলেন গদাপাণি ও তাঁর সঙ্গিনী। কিছুক্ষণ অপরিচিত মানষের মতোই দূরে দাড়িয়ে রইলেন গদাপাণি। এ কোন জয়মতীকে দেখছেন তিনি? সেই সুন্দর সতেজ শুচিস্মিত লাবণ্যে পরিপূর্ণ ঋজু অনাবিল দীপশিখার সঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়া কষাঘাতে জর্জরিত দেহটির কোন মিলই নেই। এই কি তাঁর প্রিয়তমা জয়মতী? গদাপাণির বুক ফেটে যেতে চাইলেও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি অচেনা পুরুষের মতোই ডেকে বললেন, 'শুধু শুধু কেন কষ্ট পাচ্ছিস বল তো? তোর স্বামী কোন লোকটা দেখিয়ে দে না।'

দেখাই দিক স্বামী তোর বিলম্ব না করি।

গদাপাণি এমন কথা কেন বললেন কে জানে? তিনি কি জয়মতীকে চিনতে পারেননি? না, সেই মুহূর্তে তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিল, জয়মতীর মনের ইচ্ছাটা কি?

জয়মতী গলার স্বর শুনেই গদাপাণিকে চিনতে পেরেছিলেন। পড়ন্ত বিকেলের

আলো নাগা পুরুষটির গায়ে। রুক্ষ চুলের রাশ নেমে এসেছে মুখের ওপর, নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, চোখদুটিতে মৃত্যুর ছায়া, সেই ম্লান চোখদুটিই যেন মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠে আছড়ে পড়ল নাগা দম্পতির গায়ে। মুহূর্তের জন্যই। যন্ত্রণাকাতর ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল একবার। তারপরই দ্বিধা কাটিয়ে তীব্র স্বরে বলে উঠলেন. 'কে তুই? কোত্থেকে এলি, আমি মরি বাঁচি তোর তাতে কি?' তৃষ্ণায় জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে তবু কণ্ঠে যতটা পারা যায় বিষ ঢেলে বললেন, 'চিনি না শুনি না, মরতে বসেছি আর কোথাকার এক পরপুরুষ এল রসের কথা শোনাতে। বেঁচে থেকে আমি আর করবই বা কি? আমার আর কিই বা আছে? প্রাণটুকু যেতেই যা বাকি। যদি আমার স্বামী সত্যি কোথাও থাকে তবে সেই এর প্রতিকার করবে।'

জীবন্ত থাকিয়া মই কি করিব আর।
যদি স্বামী থাকে করিবেক প্রতিকার।।

জয়মতীর মনের কথা বুঝতে পারলেন গদাপাণি। জয়মতী তাঁর প্রাণ বাঁচালেন নিজের প্রাণের বিনিময়ে। শেষ ইচ্ছাও জানালেন স্বামীকে, তিনি এর প্রতিকার চান। কপর্দকহীন, প্রাণভয়ে পলাতক স্বামী তাঁর তবু তাঁকেই পরম ভরসা জয়মতীর। নিজের পরিচয় দেওয়া আর হল না। ধীরে ধীরে আবার অরণ্যে মিশে গেলেন গদাপাণি। তাঁর কানে বিঁধে রইল জয়মতীর শেষ কথাটি, একটি করুণ মর্মভেদী স্বর, যদি স্বামী থাকে...। ফেরার পথে পড়ে কাকগোঁসানি। গদাপণি সেখানে দেবীডোলে গিয়ে নামিয়ে রাখলেন তাঁর ইষ্টদেবীকে। নাগা যুবতী নীরবে তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। বললেন, 'এ কি? তোমার ইষ্টদেবী। তাঁকে এখানে রাখলে কেন?'

গদাপাণি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যদি কোন দিন জয়মতীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি তবেই আবার ওঁর পুজো করব।'

নাগা পর্বতে আবার দুজনে ফিরে গেলেন। কিন্তু যুবতী অনুভব করলেন, যিনি তাঁর সঙ্গে রংপুরে গিয়েছিলেন আর যিনি তাঁর সঙ্গে ফিরে এলেন তাঁরা দুজনে এক মানুষ নন। সহজ, সরল মানুষটির মৃত্যু হয়েছে জয়মতীর জীবদ্দশাতেই। পরম ভালোবাসায় তিনি গদাপাণির হাত ধরেন, 'প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে। আমি আমরা তোমাকে সাহায্য করব। একা তুমি কিছু করতে পারবে না।'

জয়মতীর কায়িক মৃত্যু ঘটেছিল ১৬০১ শকের (১৬৭৯ খ্রি) ১৩ চৈত্র, শুক্লা ত্রয়োদশী, বৃহস্পতিবার। জারেঙ্গা পোথারে চোদ্দ দিন অকথ্য অত্যাচার দিন রাত্রি সহ্য করেছিলেন তিনি। দারুণ গরমে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটেছিল, কেউ এক ফোঁটা জল দিতে দেয়নি তাঁর মুখে। শেষে মৃত্যু সন্নিকট দেখে জল্লাদই গলা টিপে ধরে :

গলে চেপিলেক দূত মরি গৈলা প্রাণ।
রাখিলা স্বামীরে আপুনার দিয়া জান।।

হার মানলেন জয়মতী মৃত্যুর কাছে, কিন্তু প্রেমের পরীক্ষায় তিনি বিজয়িনী। তাঁর ভালোবাসাই বদলে দিল গদাপাণিকে। আহোম রাজ্যের সাধারণ মানুষকে।

গদাপাণি জয়মতীর মৃত্যুসংবাদও পেলেন। এ তো তাঁর জানাই ছিল। ভেঙে

পড়লেন না। চোখের জলও ফেললেন না। সর্বক্ষণের সঙ্গিনী পর্যন্ত ভয় পেলেন, 'কি ভাবছ তুমি গদাপাণি?' গদাপাণি বললেন, ' যে সিংহাসনের জন্যে আমার সব গেল, সেই সিংহাসন আমার চাই। লালুকসোলাকে যোগ্য জবাব আমি দেবই।' সহায় সম্বলহীন গদাপাণির প্রতিজ্ঞা শুনে চমকে উঠলেন তাঁর সঙ্গিনী। এই গদাপাণিই না তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে এসে বারবার বলেছেন, 'রাজ্যপাট আমি চাই না। রাজা হয়ে আমি কি করব।' আজ কত বদলে গিয়েছেন তিনি।

মাত্র দুটি বছর, ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র দুটি বছরের অমানুষিক চেষ্টায় গদাপাণি সফল হলেন। নাগাদের সাহায্য কিছু পেয়েছিলেন। শিখেছিলেন তাদের রণনীতি, যুদ্ধকৌশল। সাহায্য পেয়েছিলেন দুঃসময়ের বান্ধবীর কাছ থেকে। বারবার গদাপাণি ছদ্মবেশে ফিরে এসেছেন আহোম রাজ্যে। সাধারণ মানুষের মন জয় করেছেন মধুর ব্যবহারে। আত্মপরিচয় দিয়ে সাহায্য চেয়েছেন আহোম যুবকদের কাছে। মনে মনে তো সবাই গদাপাণির পক্ষে, কেন না, নিরপরাধিনী জয়মতীর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দগদগে স্মৃতি পোড়া কয়লার মতো সবার মনেই জ্বালা ধরায়। তাতে মিশে থাকে একটা গোপন অপরাধবোধ, হত্যাকারীর হাত চেপে ধরতে না পারার গ্লানি। কাজেই গদাপাণির চেষ্টা ক্রমেই একটা রূপ নিতে থাকে। লালুকসোলার সতর্ক অনুচরদের চোখ এড়িয়ে যুবকদের শেখালেন যুদ্ধকৌশল। তারপর একদিন তাদের নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন গড়গাঁও কারেং। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত গদাপাণিকে এখন দেখলে বোধহয় স্বয়ং জয়মতীও চিনতে পারতেন না।

দু'বছর পরে একই পটভূমিতে ভিন্ন নাটকের অভিনয়। লোরা রাজা আর লালুকসোলা দুজনকেই তাঁদের নিরাপদ বাসস্থান থেকে টেনে নামালেন গদাপাণি আর তাঁর সেনারা। লোরা রাজা খুন হলেন। আর লালুকসোলা? তিনি তখনও প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজের ছেলেকে বাঁচাবার। কিন্তু পেরেছিলেন কি? কিংবদন্তি বলে, মন্ত্রীকে ছেড়ে দেননি গদাপাণি। লালুকসোলা নাকি তাঁর পায়ে পড়েছিলেন কিন্তু কে শুনবে তাঁর কথা? কিছু খেতে না দিয়ে বন্দি করে রাখলেন তাকে। 'উপোস করে থাকো তুমি, দেখো না খেতে পেয়ে কেমন লাগে।' কেউ কেউ বলেন, গদাপাণি লালুকসোলার ছেলেকেই শুধু হত্যা করেননি, তার মাংস লালুকসোলাকে খেতে বাধ্য করেছিলেন। অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়ে। সকলকে হত্যা করে রক্তস্নাত গদাপাণি বসলেন আহোম সিংহাসনে ১৬৮১ সালে। ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্গদেব গদাধর সিংহ। আহোম রাজ্যের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। রাজ্যের সীমা তিনি অনেক বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মানাস পর্যন্ত। প্রকাশ্যে জয়মতীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার মতো তিনি কিছু করেননি। কাকগোঁসানি থেকে ইষ্টদেবীকে তুলে এনে কোন দেবডোল প্রতিষ্ঠাও করেননি। তাঁর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছর। শ্রান্ত ক্লান্ত গদাপাণির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন তাঁর বড় ছেলে। জয়মতীর সেই কিশোর পুত্র তখন যুবক, বাবার মতোই বীর। কিশোর পুত্রের মনে মায়ের করুণ মৃত্যু গভীর দাগ কেটেছিল। তাঁর ছোট ভাইয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ নাম নিয়ে জয়মতীর ছেলে সিংহাসনে বসলেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আহোম রাজা। বহু পুরনো রীতির অবসান ঘটিয়ে তিনি রাজধানী তুলে আনেন রংপুরে। তবে সবার আগে তিনি একটি বিশাল জলাশয় খননের আদেশ দেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনে ৩১৮ একর পরিধির জলাশয়টির কাজ শেষ হয়। এর নাম রাখা হয় জয়সাগর। এর তীরে আজও রয়েছে শিবডোল, জয়ডোল, দেবীডোল প্রভৃতি। জয়ডোল আসলে বিষ্ণুমন্দির কিন্তু স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে তা পরিণত হয়েছে জয়ডোলে। জলের অভাবে আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে মরেছিলেন জয়মতী, তার স্মৃতি ছিল কিশোর পুত্রের মনে, তাই তিনি জানতেন মন্দির নয়, বিজয়স্তম্ভ নয়, একমাত্র জলাশয়ই রক্ষা করতে পারে জয়মতীর স্মৃতি। আর জয়সাগরের বুকে যখন ঢেউ ওঠে তাতে শোনা যায় স্বর্গদেব গদাধর সিংহ ও জয়মতীর অবিস্মরণীয় প্রেমের কথা।

সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফউন্নিসা

ইতিহাসে বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা স্থান পেয়েছেন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী নবাব-জীবন ও নিষ্ঠুর মৃত্যু বাঙালিকে আপ্লুত করেছে। উদ্বুদ্ধ করেছে কবিতা, উপন্যাস ও নাটক রচনায়। যদিও প্রজারা কোনদিনই তাঁকে ভালোবাসেনি। আমির ওমরাহরা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরাও পাশে এসে দাঁড়াননি। কিন্তু সিরাজের জীবন ধূসর মরুর মতো ছিল না, তাঁর জীবনে ছিলেন লুৎফউন্নিসা। ইতিহাস লুৎফউন্নিসাকে যথাযথভাবে মনে রাখতে পারেনি, প্রেম তাঁকে অমর করেছে।

সিরাজ ছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের অতি আদরের দৌহিত্র। কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের বড় ছেলে। পুত্রহীন নবাব সিরাজের জন্মের পরেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক নিয়েছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার দেবেন বলে। সিরাজের দুর্ভাগ্যের সূচনা সেখান থেকেই। অনেকেরই ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। বিশেষ করে সিরাজের মাসি গহসেটি বেগম, তিনি আবার ঢাকার নাবব-নাজিম নওয়াজিম মুহম্মদ খাঁর বেগম ছিলেন, প্রথম থেকেই সিরাজের বড় মাপের শত্রু হয়ে উঠেছিলেন।

অপর দিকে অতি আদরে সিরাজ হয়ে উঠলেন অতি উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া ধরনের দুর্বৃত্ত। মুর্শিদাবাদের সকলেই নবাবের অতি প্রিয় কিশোর নাতিটির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ধনী-দরিদ্র-হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সিরাজ নানাভাবে অপমান করেছেন। পথে-ঘাটে সুন্দরী মেয়েরা সেকালে বেরোতেন না কিন্তু হিন্দু মেয়েরা গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন, সিরাজ সেখান থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে আনতেন পাইক পাঠিয়ে। মাঝে মাঝে ঢাকা পালকিও আটক করতেন। রানি ভবানীর বিধবা মেয়ে তারার দিকেও তিনি লোভীর হাত বাড়িয়েছিলেন তবে সফল হননি। সত্য মিথ্যা এরকম অনেক কাহিনী সিরাজকে ঘিরে আছে। ফলে আর যাই হোক, তাঁকে প্রেমিক ভাবা যায় না। তবু অঘটন ঘটে গেল একদিন। নবাবমহলে নিজের ঘরেই তাঁর চোখ পড়ল একটি মেয়ের দিকে। সদ্য কৈশোর অতিক্রম করেছে সে। অন্দর-মহলের খাসদাসীও নয়, সামান্য জারিয়া বা ক্রীতদাসী, নিয়মমাফিক এসেছিল তাঁর জুতো খুলে দিতে। অন্য দিন হয়ত সে আসে না কিংবা আসে, সিরাজ তাকে লক্ষ্য করেননি। নেশায় টইটুম্বুর হয়ে থাকেন বেশির ভাগ রাতেই। সেদিনটা ছিল অন্যরকম। সিরাজ হঠাৎ

দেখলেন, মেয়েটির হাত কাঁপছে। অনভ্যস্ত হাত? কি মনে হল, তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটি তুলে ধরলেন। নতুন মেয়ে।

'কে তুমি?'

অবান্তর প্রশ্ন। মেয়েটি যে জারিয়া তা তার পোশাকই বলে দিচ্ছে। সব জারিয়া সাদামাঠা পোশাকই পরে। কিন্তু মেয়েটির মুখখানি আধফোটা গোলাপের মতো সুন্দর, তার চেয়েও বড়, মূর্তিমতী সারল্য ও পবিত্রতা। হারেমে যা দুর্লভ। যা দেখবার জন্য সিরাজ লুঠ করে আনেন মেয়েদের। প্রতিবারেই হতাশ হতে হয় তাঁকে। জোর করে ধরে আনা মেয়েদের সবটুকু গ্রাস করে নেয় ভয় আর ঘৃণা। অতৃপ্তি থেকেই যায়। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বেগম হয়ে এসেছেন উমেদউন্নিসা। খানদানি আভিজাত্য তাঁর রক্তে। তিনি যত বড় রূপসী তার চেয়েও বেশি বংশ গৌরবে গরবিনী। কোনদিনই তাঁদের মনের মিল হয়নি।

ভয়ে ভয়ে মেয়েটি সিরাজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমি জারিয়া। আমার তো নাম নেই।'

সত্যই কি নাম ছিল না? হারেমের জারিয়াদেরও নাম থাকে। কেই বা তা মনে রাখে? আসলে এই মেয়েটিও অনামিকা নয়। সে জারিয়া ঠিকই, তার মা সিরাজজননী আমিনা বেগমের দাসী। রাজস্থান না কাশ্মীর কোথাকার গ্রাম থেকে তারা এসেছিল কেউ জানে না। তবে কোল জুড়ে যখন চাঁদের টুকরোর মতো মেয়েটি জন্মালো তখন আর পাঁচজন সাধারণ মায়ের মতো ক্রীতদাসী মাও মেয়ের নাম রেখেছিল রাজ কানোয়ার বা রাজকুমারী। সেই রাজ এখন পঞ্চদশী। নবাবী হারেমের মধ্যে থেকেও সে আশ্চর্য রকমের সাবলীল, সহজ, সুন্দর। কোন মালিন্য যেন তাকে স্পর্শ করে না।

মা তাকে হারেমের রীতিনীতি শেখাবার চেষ্টা করেছে। কিভাবে নবাবজাদার চোখে পড়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারে রাজ। এত রূপ তার, এই তো সময়। অথচ রাজ কিছুই শোনে না। শুধু অপরূপ সুন্দর নবাবজাদা তাকে টানে। খামখেয়ালি যুবকটির প্রতি একটা চোরাটান অনুভব করে। তার কিশোরী হৃদয়ও হয়ত স্বপ্ন দেখে। যদিও সে স্বপ্নের হদিশ কেউ পায় না।

সিরাজ বলে ওঠেন, 'সে কি? তোমার নাম নেই? নাম না থাকলে আমি তোমাকে ডাকব কি করে?'

নেশায় কি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন নবাবজাদা। এসব ক্ষেত্রে জারিয়াদের কথা বলতে নেই। যাই ঘটুক না কেন চুপ করে থাকাই দস্তুর। কিন্তু রাজ চুপ করে থাকতে না পেরে বলে বসল, 'আমাকে ডাকার দরকার কি হুজুর, আমি তো আপনার কাছেই রয়েছি।'

সিরাজের কানে রাজের কথাগুলো ভারি মিষ্টি শোনাল। কদিন ধরেই তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কেবলই মনে হচ্ছে, তিনি বড় একা, তাঁকে কেউ ভালোবাসে না। মসনদের ভাবী উত্তরাধিকরী বলে তাঁর মন যুগিয়ে তোয়াজ করে চলে।

'সব সময় থাকবে তো?'

ভীত সন্ত্রস্ত রাজ কি উত্তর দেবে? নবাবদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য তালিম দেওয়া হয় হারেমবাসিনীদের। জারিয়া তাদের মধ্যে পড়ে না। তাই তারও তালিম হয়নি। রাজ

কোন কিছু না ভেবেই বলে বসল, 'আপনি যদি চান সব সময় থাকব।'

'মনে থাকে যেন তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।'

'থাকবে।'

'কাল যেন আবার তোমায় এই সময় এই জায়গাটিতে দেখতে পাই।' ক্লান্ত সিরাজ ঘুমিয়ে পড়েন।

রাজ ফিরে আসেন নিজের ঘরে। মনে তার পরিতৃপ্তির জোয়ার। সিরাজ তার সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রতিদিন তাঁর ঘরে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। হোক না সে শুধু জুতো খুলে দেবার জন্য। এতেই রাজ খুশি। এই তার পরম পাওয়া। এর নাম ভালোবাসা।

রাজের মা শুনে খুশি হয়, 'ছলা কলায় ওঁকে বাঁধতে পারবি তো রাজ।'

রাজ বলে, 'আমি তো তাঁকে বাঁধতে চাই না মা।'

মা বিরক্ত হয়, 'তবে তুই কি চাস? নিজের ভালো চাস না? সোনা-দানা, মোহর, মোতির মালা কিছুই দেয়নি তোকে?'

'না মা ওসব আমি চাই না। আমি ওঁর বিশ্বাস চাই। আমি ওঁর ভালোবাসা চাই।'

'চুপ কর। বাঁদির আবার ভালোবাসা। দুদিন পরে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেবে তখন কি হবে?'

'কি আবার হবে? আমি জারিয়া আছি, জারিয়াই থাকব।'

'বোকা মেয়ে। নবাবজাদা যখন খুশি থাকবেন, মোহর, মোতির মালা নিজে থেকে চেয়ে নিবি।'

'না মা। ওসব আমি চাই না।'

বিরক্ত হয়ে ওঠে রাজের মা, 'তবে কি বেগম হতে চাস?'

'না মা, আমি তা-ও চাই না।'

রাজের মা আশা ছাড়ে না। সে তার জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, ভালোবাসার দাম কানাকড়িও নয়। হিরে মোতির কাছে প্রেমের কোন মূল্য নেই। কিন্তু তার মেয়েটা যে অন্যরকম। সংসারের সবচেয়ে অসার বস্তুর ওপর তার যত টান।

রাজ নিয়ম করেই অপেক্ষা করে সিরাজের জন্য। নিজের শয়নকক্ষে এসে সিরাজ প্রতি রাত্রেই দেখতে পান সন্ধ্যাতারার মতো রাজের নীরব উপস্থিতি। কোনদিন দু একটা কথা বলেন, কোনদিন চিনতেও পারেন না। রাজের আচরণে কোন তারতম্য দেখা যায় না। সে নবাবজাদার জুতো খুলে দেয়। কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। এক আশ্চর্য সহমর্মিতা গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে। একজন সবে আঠারো পেরিয়েছেন, অন্যজন হয়ত বা পনেরো। সিরাজের বিবাহিতা পত্নী উমেদউন্নিসারও বয়স এদের কাছাকাছি। কিন্তু নবাবজাদার সঙ্গে বহুবেগমের মনের মিল কোনদিন হয়নি।

একদিন সিরাজ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কথায় ও কাজে কোন ভুল হয় না তো।'

'আমি যে জারিয়া, হুজুর। আমাদের ভুল করতে নেই।'

'সে তোমার নিজের কাজ। আমার কথায় এই যে রোজ এখানে হাজির থাকো, সেটা তো তোমার কাজের মধ্যে পড়ে না।'

'আপনার হুকুম তামিল করাও তো আমার কাজ।'

'তুমি তো আমার কাছে কোনদিন কিছু চাও না। অন্যরা সবাই চায়। যারা আমার সঙ্গে ওঠে বসে, নাচ দেখায়, গান শোনায়, ইয়ার বন্ধু সবাই কিছু না কিছু চায়।'

'আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই আমি খুশি।'

'আমি? আমি তোমায় কি দিয়েছি? মনে পড়ছে না তো।'

'আপনার সেবা করবার অধিকার। রোজ এখানে হাজির থাকবার হুকুম।'

সিরাজ অবাক হন। অন্যান্য দিনের মতো এদিন তিনি সুরায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন না। রাজের কথাগুলো তাঁর মনের গভীরে প্রবেশ করল। এমন মেয়ের দেখা তিনি আগে কোনদিন পাননি। হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমায় ভালোবাস?'

'আমাকে মাফ করবেন হুজুর।'

'কেন? তুমি তো কোন দোষ করনি।'

'আমি নিজের মনকে বশে রাখতে পারিনি।' রাজের মাথা নত হয়ে আসে।

সিরাজ হঠাৎ তাকে কাছে টেনে এনে একেবারে পাশে বসান। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন অপরূপ মুখখানির দিকে। ভালোবাসা কাকে বলে তিনিই কি তা জানেন? ভালোবাসার কোন রূপ নেই। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা অন্যরকম। হয়ত এই মেয়েটির মতো। মনটা ভরে ওঠে অকারণ পুলকে।

'কতদিন ভালোবাসবে?'

'আমি যতদিন বাঁচব।'

'মনে থাকবে এ কথা?'

'থাকবে।'

'তাহলে আমি মরার আগে তুমি মোরো না।'

'ও কথা কেন বলছেন?'

'আমায় কেউ ভালোবাসে না, বুঝলে। 'সিরাজ যেন ভেবেচিন্তে বলেন, 'তুমি মরে গেলে আমাকে কে ভালোবাসবে বলো?'

রাজের চোখ ছাপিয়ে জল উছলে পড়ে, 'আপনার অনেক দয়া।'

'দয়া, মায়া, করুণা...' হেসে ওঠেন সিরাজ, 'তুমি কিছুই জানো না। এসবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। লোকে আমাকে কি ভাবে তুমি জানো না। তুমি আমাকে ভালোবাস বলেই...আসলে মূর্তিমতী করুণা তুমি...পরম দয়াময়ী...তোমার নাম হওয়া উচিত...কি যেন নাম তোমার?'

'আমার নাম নেই নবাবজাদা।'

'কেন? নাম নেই কেন?'

'আমি জারিয়া।'

'কে বলেছে তুমি জারিয়া? আজ থেকে তুমি আমার বেগম।'

রাজ কেঁপে ওঠে ভয়ে। বেগমসাহেবা কীভাবে রেগে যাবেন কে জানে? আবার ভয় ছাপিয়ে মন দুলে ওঠে আনন্দে। শুধু বলে, 'আপনার অনেক দয়া।'

'দয়া মায়া আমার নেই, দয়া হচ্ছ তুমি...আমি তোমাকে একটা নাম দেব?'

'দিন নবাবজাদা, সেই হবে আমার পরিচয়।'

'আমি তোমার নাম দিলাম লুৎফা...লুৎফউন্নিসা বেগম। কেমন? পছন্দ হয়?'

চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তবু উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে অভিবাদন জানাতে গেলেন লুৎফউন্নিসা। সিরাজ তাঁর হাত ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আলিবর্দি খাঁর বেগমের কানে সব কথাই পৌঁছোয়। তাঁর আদরের নাতিটি যে একটি জারিয়াকে নিয়ে মেতে আছে তাও শোনেন। খুশিই হন। ভালোই হয়েছে। নতুন খেলনা পেয়ে সিরাজ যদি কিছুদিন ভুলে থাকেন সে তো ভালোই। দাসীদের কাজই তো প্রভুকে প্রসন্ন রাখা। কত উপপত্নী, কত নর্তকী সিরাজকে সুখে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে, তার মধ্যে সামান্য এক জারিয়া...। হারেমে কোন তরঙ্গ উঠল না। লুৎফউন্নিসাও কোনদিন চাননি বিবাহিতা বেগমের অধিকার।

নবাব আলিবর্দি খাঁ পাটনার শাসনকর্তা হিসাবে সিরাজের নাম ঘোষণা করলেও অল্পবয়সী অপরিণামদর্শী নাতিটিকে নিজের কাছে মুর্শিদাবাদে রেখেছিলেন। যাতে তিনি সুবে বাংলার মসনদে সহজে আসীন হতে পারেন। আমির ওমরাহদের কাজকর্মের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারেন। কিন্তু হঠকারিতা সিরাজের জীবনের অঙ্গ। মাত্র কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই তাঁর মনে হতে লাগল, সবাই তাঁকে যথেষ্ট বড় ভাবছেন না। ঠিক করলেন, নবাবের সাময়িক অনুপস্থিতিতে তিনি পালিয়ে যাবেন পাটনায়। পাটনার শাসক তিনিই অথচ নবাবের নির্দেশে সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছেন জানকীরাম। বন্ধু মেহেদি নিশার খাঁ সিরাজকে উৎসাহ দেন পাটনা আক্রমণ করবার জন্য। অতর্কিতে হানা দিতে হবে সেখানে, তার আগে মুর্শিদাবাদ থেকে পালানো চাই।

মেহেদি নিশার বললেন, 'সেই ভালো।'

কয়েকটা ভালো গরুর গাড়ি সাজান হল। বলদগুলি প্রচণ্ড ছুটতে পারে। সঙ্গে যাবে বিশ্বস্ত সেনারা আর লুৎফউন্নিসা। হারেমে এখনও তাঁর পরিচয় সামান্য খাদিমার। সিরাজ বললেন, 'তুমি পারবে তো আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে?'

'পালাতে হবে কেন?'

'আমিও যে পালাচ্ছি। তবে তোমার কষ্ট হবে। গরুর গাড়ি করে যেতে হবে অনেক পথ।'

'আপনিও তো যাবেন। আপনার কষ্ট হবে না।'

'আমার কষ্ট হবে না। আমরা বিলাসী নবাব বলে সবাই ভুল ভাবে, আসলে আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারি।'

'আমার কষ্ট হবে না। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'জারিয়া পালিয়ে গেলে তাকে ধরে এনে কয়েদ করা হয়।'

গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন সিরাজ, দুহাতে জড়িয়ে ধরেন লুৎফাকে, 'তোমাকে তো কয়েদ করে ফেলেছি। কি করে পালাবে দেখি।'

'পালাতে চাই না নবাবজাদা। সারাজীবন কয়েদি হয়েই থাকতে চাই।' হেসে বলেন লুৎফা। তারপর ভেবে বলেন, 'আমার মাকে সঙ্গে নিলে বোধহয় কোন ঝামেলা হবে না।'

'তোমার মা?'

'আমিনা বেগমের খাদিমা।'

'ওঃ তাহলে তো ভালোই হল। মাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। তাঁর খাদিমা মেয়েকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতেই পারে। এর পর থেকে তোমার একটাই পরিচয় হবে, তুমি আমার বেগম।'

সিরাজ পাটনা যাত্রা করলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে গরুরগাড়িতে ঝড়ের বেগে যাত্রা। পথশ্রমে তাঁরা যত না ক্লান্ত হলেন তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেলেন পরস্পরের সান্নিধ্যে। এই সময়টাই সিরাজ ও লুৎফার জীবনে সবচেয়ে সুসময়। নবাবের নির্দেশে পাটনায় যুদ্ধ হল না, শুধু মারা গেলেন মেহেদি নিশার। জানকীরাম সসম্মানে সিরাজকে অভ্যর্থনা জানালেন। আবার তাঁকে ফিরে আসতে হল মুর্শিদাবাদে। বেগম মহলে পাকা আসন পেলেন লুৎফউন্নিসা। বিয়ের কোন অনুষ্ঠান অবশ্য হয়নি। বড়বেগম উমেদউন্নিসাই রইলেন। সে শুধু নামে। লুৎফউন্নিসাই হলেন সিরাজের প্রকৃত বেগম। কয়েক বছর পরে সিরাজের একমাত্র সন্তান মোহরার মা হলেন তিনি। মসলিনের পোশাক, হিরে মোতির গয়না লুৎফউন্নিসাকে আরও রূপসী করে তুলল কি না জানা নেই তবে ভালোবাসায়, মানসিক ঔদার্যে তিনি সিরাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হিসাবে সবার নজর কেড়েছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই।

মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজ স্থির করলেন, পুরনো নবাব মহলে তিনি থাকবেন না। মনে মনে তিনি হয়ত মতিঝিলের কথা ভাবছিলেন। ঝিলের মধ্যে সুন্দর বাড়িটি। কিন্তু সিরাজ কিছু বলার আগেই গহসেটি বেগম মতিঝিল চেয়ে নিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। সিরাজকেও হতাশ করলেন না নবাব। বললেন, 'তুমিও তোমার পছন্দমতো মহল তৈরি করো।'

সিরাজ তৈরি করলেন হিরাঝিল, মতিঝিলের চেয়ে অনেক সুন্দর হিরাঝিল। সিরাজ বললেন, 'আমি আর নবাব মহলে থাকব না। হিরাঝিলে গিয়ে থাকব।'

লুৎফা চমকে ওঠেন, 'সে কি?'

'হ্যাঁ, লুৎফা ওই বাড়িটা শুধু প্রমোদ ভবন নয়, আমার নিজস্ব মহল। তুমি আমার বেগম তাই তুমিও চেহেল সুতুনে থাকবে না। হিরাঝিলে থাকবে।'

নবাব খুশি হয়ে হিরাঝিলের খরচ চালাবার জন্য নজরানা দিলেন তার চার পাশের গঞ্জগুলি। তাদের নামই হয়ে গেল মনসুরগঞ্জ। কিন্তু মাতামহের শাসনের গণ্ডি পেরিয়েই সিরাজ আবার উদ্দাম হয়ে উঠলেন। নর্তকীর নূপুর ঝংকারে ভরে উঠল হিরাঝিলের রংমহল। দূর দূর থেকে এলেন রূপসী বাইজিরা। যাদের মধ্যে ফৈজির নাম বারবার শোনা গিয়েছে। তাকে পেয়ে সিরাজ নাকি লুৎফাকে ভুলেছিলেন, আবার তার বিশ্বাসঘাতকতায় জ্বলে উঠে তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন হিরাঝিলের এক গোপন কক্ষে। অনেকের মতে, ফৈজি সিরাজের পরম সুহৃদ এবং মন্ত্রী মোহনলালের বোন, শৈশবে বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইজি হয়েছিল। আবার ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ফৈজি নয় লুৎফউন্নিসাই মোহনলালের বোন। হয়ত কোনটাই সত্য নয়। ফৈজির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। লুৎফা বা রাজ কানোয়ারকেও মোহনলালের

বোন ভাবার পক্ষে তথ্যের বড় অভাব। শুধু এটুকু বলা যায়, একটা গুজব নিশ্চয় ছিল, যা ঐতিহাসিকরা উপেক্ষা করতে পারেননি। গোলাম হোসেন খানের সিয়ারে মুতাখখিরীনের ইংরেজি অনুবাদের পাদটীকায় হাজি মুস্তফা এমনই একটি প্রসঙ্গের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মোহনলালের বোনের নাম কোথাও নেই। মোহনলাল নিজের বোনকে উপহার দিয়ে নিজের পদোন্নতি ঘটিয়েছিলেন। গ্রাম্য কবির গানেও শোনা গিয়েছে,

'নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতি।
কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।।'

এই কটি কথা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ফৈজিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হলে তার পক্ষে কলকাতায় বসে কাঁদা সম্ভব ছিল না।

এই সব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজ বসলেন মসনদে। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে। তার পরের কথা তো ইতিহাসেই আছে। বহু ষড়যন্ত্র ও পলাশীর যুদ্ধ। প্রতীক্ষা করা ছাড়া লুৎফউন্নিসার আর করার কি-ই বা ছিল। প্রতীক্ষার অবসান হল ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। সিরাজ পালিয়ে এলেন পলাশী থেকে, এক দ্রুতগামী উটের পিঠে চেপে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আমির-ওমরাহ্-ধনী ব্যক্তিদের কাছে দীনভাবে সাহায্য চাইলেন। যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আর একবার ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ রাজি হল না। তাঁর শ্বশুরও নিঃস্ব জামাইয়ের পাশে না দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলালেন। নবাব মহলে সবাই মুখ ফেরালেন। হতাশ হয়ে সিরাজ গভীর রাত্রে এলেন হিরাঝিলে। তিনি তখন মনস্থির করে ফেলেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে পালাবেন পাটনার দিকে। আর একবার। সেখানে মঁসিয়ে ল এবং জানকী রাম রয়েছেন। অনুগত কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে যাবেন। শেষবারের মতো দেখা করতে এলেন লুৎফা ও মেয়ের সঙ্গে। তাঁর পোশাক ছিন্নভিন্ন, ধূলিমলিন। শিউরে উঠলেন লুৎফউন্নিসা।

'নবাব।'

'আমি হেরে গিয়েছি লুৎফা। আমাকে পালাতে হবে পাটনায়। তোমাকে শুধু দেখে যাবার জন্য এসেছি। পারো তো তুমিও কোন জারিয়ার ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদের বাইরে কোন গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থেকো।'

লুৎফউন্নিসা শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তা হবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

চমকে উঠলেন সিরাজ, 'তা কি করে হয়? অনিশ্চিত কষ্টের জীবন। কোথায় যাবে তুমি?'

'আমি তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী। কষ্টের দিনে একলা ছেড়ে দিতে পারব না, আমি যাবই।

'আমি আবার ফিরে আসব লুৎফা। পাটনায় আমি সব পাব। সৈন্যদের নিয়েই ফিরে আসব।'

'ওসব আমি জানি না। তোমাকে ছেড়ে আর আমি উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে পারব না।'

'এই কষ্টের পথ...তোমরা পারবে? অন্য বেগমরা তো আমাকে তাদের মহলে ঢুকতে দিতে চায় না। আর তুমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়াতে চাও?'

'হ্যাঁ। অন্য বেগমদের সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? আমি জারিয়া ছিলাম। সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারব। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

গুছিয়ে নেবার বিশেষ কিছু ছিল না। লুৎফউন্নিসা তাঁর গয়নাগুলি নিলেন দুঃসময়ে কাজে লাগতে পারে ভেবে। দুটি হাতির পিঠে জিনিসপত্র নিয়ে তাঁরা মনসুরগঞ্জ ছাড়লেন। ভগবানগোলায় এসে তাঁরা নৌকোয় চাপলেন। মীরজাফরের চরেরা তাঁদের পাগলের মতো খুঁজছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মীরন ও মীরকাশিম। তবু ছদ্মবেশে অনেকটা পথ পেরোলেন তাঁরা। মূর্তিমতী করুণার মতো লুৎফা রুমাল দিয়ে সিরাজকে হাওয়া দেন একটু স্বস্তি দেবার আশায়। তীব্র গরমে আর ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে তাঁদের থামতেই হল। সিরাজ ভেবেছিলেন কোথাও থামবেন না, রাজমহলের কাছে বাহরাল নামে ছোট্ট একটা গ্রামে থামলেন তাঁরা। ফকির দানশা শেখ সেখানে বাস করেন। সাগ্রহে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁদের। ছদ্মবেশী সিরাজকে চিনতে তাঁর দেরি হয়নি। একটু খাবার ও তৃষ্ণা মেটাবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাঁদের বসিয়ে রেখে খবর পাঠালেন মীরনকে। ফকির অর্থের লোভে ক্ষুধার্ত অতিথিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন সে কথা সিরাজ বোধহয় কল্পনাও করেননি। মীরকাশিমের হাতে বন্দি হলেন তিনি। অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেলেন সিরাজ। আর তাঁর কোন চিন্তা নেই। স্তব্ধ হয়ে গেলেন লুৎফউন্নিসা, তাঁরও আর করবার কিছু নেই।

তবু মীরকাশিম একবার চেষ্টা করলেন, তাঁর গয়নাগুলো সংগ্রহ করবার। লোভ তাঁরও প্রচণ্ড। কিন্তু শত্রুর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দেবার মেয়ে লুৎফা নন। নিজের জন্য তিনি কিছুই ভাবেন না কিন্তু তাঁর কন্যার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে পাথর হয়ে থাকেন। মীরকাশিম জানতেন লুৎফার দুর্বলতার কথা। শুধু তিনি কেন, সবাই জানতেন, স্বামীর জীবনের চেয়ে আর কিছু লুৎফার কাছে মূল্যবান নয়। সেই লোভই দেখালেন বন্দিনীকে, 'এই হিরে মোতিগুলো চাইছি নবাবকে বাঁচাবার জন্যেই।'

এ কথা শোনামাত্রই লুৎফউন্নিসা সমস্ত গয়না মীরকাশিমের হাতে তুলে দিলেন। মীরকাশিম সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বেছে নিজের কাছে রেখে দিয়ে বাকিগুলি দিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুর মীরজাফরকে। তিনি আবার কতক রেখে কতক দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা উপপত্নী মনিবেগমকে। এসব পরের কথা। সর্বস্ব দিয়েও লুৎফা তাঁর সিরাজকে বাঁচাতে পারেননি। বন্দি করে তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসার পরেই মীরনের নির্দেশে মহম্মদ বেগ তাঁকে হত্যা করে।

সিরাজের মৃত্যুর সময় লুৎফউন্নিসার বয়স কতই বা হবে? হয়ত পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ। অপরূপ রূপসী তিনি। মীরন নাকি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন নতুন করে জীবন শুরু করবার জন্য। তার প্রস্তাবে চমকে উঠেছিলেন লুৎফা। তিনি না সিরাজকে কথা দিয়েছেন যতদিন বাঁচবেন সিরাজকেই ভালোবাসবেন। মীরন ছাড়াও আরও কেউ কেউ ছিলেন পাণিপ্রার্থী। লুৎফা বলেছিলেন, 'হাতির পিঠে চড়ার পর কেউ কি গাধার পিঠে চাপে?' হতাশ হয়ে মীরন লুৎফাকে হারেমে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

আলিবর্দি পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। প্রায় বন্দিনী অবস্থায় কাটে কয়েকটা বছর, অতি সামান্য মাসোহারা কখনও আসে, কখনও আসে না। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে তাঁর। আবার কি ফিরে যাবেন জারিয়ার ভূমিকায়? লুৎফউন্নিসা জানেন, আর তা সম্ভব নয়। সিরাজ নেই বলেই তাঁর ভালোবাসায় ছেদ পড়বে, এ হতে পারে না।

আলিবর্দি খাঁর বেগমের আবেদনে রবার্ট ক্লাইভ বেগমদের বিশেষ করে লুৎফউন্নিসা ও সিরাজের কন্যার জন্য কিছু ব্যবস্থা করেন। লুৎফাকে দেওয়া হয় খোশবাগের দেখাশোনা করার ভার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালিকা কন্যার হাত ধরে লুৎফা ফিরে আসেন তাঁর পুরনো বাসস্থান হিরাঝিলে। মধ্যে আটটা বছর কেটে গিয়েছে। হিরাঝিল এখন ভাগীরথীর গর্ভে চলে গিয়েছে কিন্তু পূর্বগৌরব হারিয়ে তখনও কোনমতে খাড়া ছিল। কাছেই খোশবাগ, সেখানে শুয়ে আছেন আলিবর্দি খাঁ এবং তাঁর আদরের নাতি সিরাজ। এরই দেখাশোনা করতে হবে লুৎফাকে। সেখানে এসে তাঁর মনে হল, তিনি যেন তাঁর প্রিয়তমের কাছে ফিরে এলেন। প্রতিদিন সকালে ফুল ছড়িয়ে দিতেন কবরের ওপর। প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসতেন স্বামীর সমাধিতে। একদিন দুদিন নয় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে পরম নিষ্ঠায় তিনি এই কাজটি করেছেন। ইতিমধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তার চারটি সন্তান হয়েছে, জামাতার মৃত্যু হয়েছে। সামান্য কটি টাকায় এতগুলি মুখে অন্ন যোগাতে হিমশিম খেতে খেতে তাঁর দিন কেটেছে। কিন্তু সিরাজের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রেমে কোন ঘাটতি দেখা যায়নি। শেষে ভাগ্য প্রসন্ন হল। পাটনায় সিরাজের বাবা যে মসজিদ, মাদ্রাসা ও বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন সেগুলির উত্তরাধিকার পেলেন লুৎফা। সেই টাকায় তিনি তাঁর চারটি নাতনির বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর অন্নাভাবের সমস্যাও মিটে যায়। সিরাজের মৃত্যুর চৌত্রিশ বছর পরে লুৎফা একদিন সিরাজের কবরে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে তারই ওপর লুটিয়ে পড়েন। পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের সময়ও সিরাজই তাঁর শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠেন। খোশবাগ আজও আছে। সিরাজের পাশেই স্থান পেয়েছেন তাঁর বেগম। যে আসে ক্ষণিকের জন্য তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে হতভাগ্য নবাব ও তাঁর প্রিয়তমার জন্য। ভাগীরথী তাদের কানে কানে সেই সব পুরনো দিনের গল্প শোনায়।

রণজিৎ সিংহ ও বিবি মোরান

ইতিহাস পড়লে একটা মজার ব্যাপার চোখে না পড়ে পারে না। বহু পাষণ্ডহৃদয়, নিষ্ঠুর রাজা মাথা উঁচু করে দেশ শাসন করে গিয়েছেন কিন্তু প্রজারা তাঁদের দিকে আঙুল না তুলে সর্বদা দোষী করেছে আদর্শ রাজার দিকে। রামচন্দ্রের নিন্দে শোনা গিয়েছে, দুর্যোধনের কদাপি নয়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের কথাই ধরা যাক না, পাছে অহঙ্কার হয় বলে যিনি কখনও মুকুট পরে সিংহাসনে বসতেন না সেই ধর্মপ্রাণ, ন্যায়বিচারক রাজার দিকেও প্রজারা আঙুল তুলেছিল। অভিযোগ? পঞ্জাবকেশরী ভালোবেসেছেন তুচ্ছ এক নর্তকীকে। ইতিহাসে হয়ত মোরান কোমের নাম আছে কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন লোকশ্রুতিতে। আরও একজন সাক্ষী আছে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির সংলগ্ন বিশাল তেঁতুলগাছটি। সেও জানে রণজিৎ সিংহের প্রেমিক হৃদয়ের কথা।

নিতান্ত বালক বয়সে রণজিৎ সিংহ রাজা হয়েছিলেন। ছোট রাজ্য সুকারচুরিয়া মিশ্‌ল। সেখান থেকে জীবন শুরু করে রণজিৎ হয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ জাতির একমাত্র নেতা। বিদেশিদের কেউ তাঁকে বলতেন ভারতের নেপোলিয়ন, কেউ বলতেন আদর্শ রাজা। শুধু অত্যধিক আসক্তি ছিল সুন্দরী নর্তকীদের প্রতি। সমসাময়িক রীতি অনুযায়ী হারেমে অনেক নারী ছিল। তাঁর এক পুত্র দলীপ সিংহ ফরাসি সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দেবার সময় নাকি বলেছিলেন, 'আমি আমার বাবার ছেচল্লিশজন পত্নীর একজনের সন্তান।' ইতিহাসে অবশ্য রণজিতের এত বেশি 'চাদর আন্দাজি' বা বৈধ বিবাহের উল্লেখ নেই, তবে তাঁর হারেম বা জেনানা ভরে উঠেছিল রূপসীদের ভিড়ে। সুশাসক রাজার এই বিলাসিতাটুকু প্রজারা ক্ষমার চোখেই দেখত। হয়ত কোনদিনই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাত না, যদি না পঞ্জাবকেশরী মোরানের প্রেমে পড়তেন।

রণজিৎ সিংহ রাজা হয়েছিলেন বারো বছর বয়সে, ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল মহতাব কাউর ও রাজ কাউরের সঙ্গে। রাজ কাউরই কুমার খড়ক সিংহের জন্ম দেন ১৮০২ সালে। এর তিন বছর পরে শিশু খড়কের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কিমল সিংহের মেয়ে চাঁদ কাউরের সঙ্গে। বিরাট ধুমধাম হল সেই 'সাগাই' বা পাকা দেখা উপলক্ষে। আর এই উৎসবের সময় একটা নাচের দলের সঙ্গে অতি সামান্যা নর্তকীদের একজন হয়ে নাচতে এলেন মোরান কোম। তখনও রণজিৎ তাঁর নাম জানেন না। শুনলেন নাচের দলে একটি খুবসুরৎ নর্তকী এসেছে, যে ময়ূরের মতো নাচে। শুনে হাসলেন, 'তাই নাকি? তাহলে তো তার নাচ দেখতেই হয়।'

'দেখার মতোই নাচে মেয়েটি। যারা দেখেছে তারাই বলেছে।'

'আমি বলিনি।' রণজিৎ বয়স্যদের বলেন, 'কারণ আমি দেখিনি। তা মেয়েটি কি কুটুমবাড়ির নাচের দলের সঙ্গে এসেছে? এখানকার সব মেয়ের নাচই তো আমি দেখেছি। ময়ূরীনৃত্যের কথা তো শুনিনি।'

'পঞ্জাবেরই মেয়ে। একটা নাচের দলে আছে।'

রাজা যার নাচ দেখতে চেয়েছেন তাকে খুঁজে বার করা শক্ত নয়। দেখা গেল বিয়ের দলের একটা ঝাঁকিতে উদ্দাম ময়ূরী নৃত্য। অনিন্দ্যসুন্দরী একটি তরুণী নাচছে। যতক্ষণ নাচ চলল, চোখের পলক পড়ল না রণজিৎ সিংহের। বন্য ময়ূরীর মতো এমন মেয়ে সত্যিই তাঁর চোখে পড়েনি এর আগে। বললেন, 'ওই মেয়েটির নাচ আবার দেখতে চাই।'

খিলখিল করে কাচভাঙা হাসি ছড়িয়ে মোরান বললেন, 'নাচ দেখাব কিন্তু মহারাজা যদি খুশি হন তাহলে কি আমার প্রশ্নের জবাব পাব?'

'নিশ্চয় পাবে।' মুগ্ধ রণজিতের উত্তর, মেয়েটিকে তাঁর ভালো লাগতে শুরু করছে। অন্য রকমের ভালোলাগা। নেশার মতো ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের শিরা-উপশিরায়।

মোরান নেচে চলেছেন উন্মত্তের মতো, অবিশ্রান্ত চরণপাতে মনে হচ্ছে বুঝি ঘন মেঘ দেখে পেখম তুলে নাচছে, একটা, দুটো, না অজস্র ময়ূর, এমন নাচতে জানে বলেই ওঁর নাম মোহরান তাই থেকে মোরান। কোথায় শিখেছেন এমন নাচ, কাদের ঘর থেকে এসেছেন, কেউ জানে না। হয়ত বাঁদিবাজার থেকে তাঁকে কিনে এনে তৈরি করেছিলেন কেউ। তারপর ফুলের সুরভির মতো যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন তখনই সুযোগ এল রাজপুত্রের পাকাদেখার উৎসবে নাচবার। তারই জের টেনে আজ তিনি রাজার সামনে।

'শাবাশ' বলে উঠলেন রণজিৎ, 'এমন নাচ কখনও দেখিনি। তোমার নাম কি?'

মোরান আবার হেসে উঠলেন, মাতাল করা হাসি। জেনানাহারেমের মাপা হাসি নয়, যেন বন্যগোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ল হাসিতে। সেই মুহূর্তে রণজিতের মনে হল, এই মেয়েটির জন্যই তিনি সারাজীবন অপেক্ষা করে আছেন। মেয়েটিকে তাঁর চাই। যে কোন মূল্যে।

মোরান কণ্ঠে সুরের জলতরঙ্গ ছড়িয়ে উত্তর দিলেন, 'আমার নাম মোহরান, সবাই তাই বলে।'

'তোমার আপনজন কেউ নেই।'

ভারি মজার কথা শুনেছে যেন, হেসে গড়িয়ে পড়েন মোরান, 'আমার তো সবাই আপনজন।' তারপর আশ্চর্য ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, 'যে আপন করে নেয় আমি তারই।'

সে কথা রণজিৎ নিজেও জানেন। পথে পথে নর্তকীর জীবন এভাবেই গড়িয়ে চলে কিন্তু মুগ্ধ হন মোরানের অকপট ভাষণের জন্য। বলেন, 'নাচ দেখাবার আগে কি যেন প্রশ্ন ছিল তোমার?'

আবার একচোট হাসি, 'যদি অভয় দেন তো বলি।'

'বেশ তো এতক্ষণ নির্ভয়ে কথা বলছিলে এখন আবার ভয়ের কথা কেন?'

'কারণ আছে বলেই বলছি। কুটুমবাড়িতে নাচ দেখাতে এসে কত রকম মানুষ দেখলাম, কিন্তু আপনার মতো একজনকেও দেখলাম না।'

রণজিৎ শুনে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।

মোরান কিন্তু থামলেন না, ঝরনা একবার নামতে শুরু করলে আর বেগ সামলাতে পারে কি? মোরানও পারলেন না। আসলে কি যে তিনি জিজ্ঞেস করতে চান তা মনেই ছিল না, বলেছিলেন শুধু কথার কথা, পথনায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা ছল মাত্র।

'মহারাজ, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, ঈশ্বর যখন সবাইকে রূপ বিলি করছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

কুৎসিত দর্শন রণজিৎকে মুখের ওপর এ কথা বলার স্পর্ধা যে কারও থাকতে পারে তা কেউ জানত না। রণজিৎ একেবারেই চটলেন না। হাসি মুখে বললেন, 'আমি তখন চেষ্টা করছিলাম বাহুবলে রাজ্য জয় করবার কপাল হাসিল করতে।'

লজ্জায় মোরান মাথা নত করলেন। রণজিতের কাছে তাঁর প্রথম পরাজয়। রূপের আড়ালে রাজার সুরসিক ও বুদ্ধিমান মনটিকে দেখতে পেলেন মোরান। তীব্র এক আকর্ষণ বোধ করলেন তিনিও। আর মোরানের এই দুঃসাহসও রণজিতের ভালো লাগল। বললেন, 'আবার দেখব তোমার নাচ। পালিয়ে যেও না যেন আমার রাজ্য থেকে, না বলে।

'পালাব কেন?' মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হন মোরান, 'আপনার পিঁজরায় তো পাখি নিজেই এসে ঢুকেছে।'

রণজিৎ হেসে বলেন, 'মনে থাকবে তোমার কথাটা।'

উৎসব কেটে গেল। রণজিতের মন থেকে উৎসবের রেশ কাটল না। রূপ তাঁর নেই, রূপসীরা তাঁকে চুম্বকের মতো টানে। কিন্তু মোরান যেন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। এক আশ্চর্য টান তার মধ্যে, তার চোখে, তার মুখে, তার সর্ব অবয়বে। শয়নে স্বপনে রণজিৎ মোরানের ময়ূরী নৃত্যের কথা ভাবেন, জেনানামহলের রূপসী রমণীদের পানসে মনে হয়। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে মোরানকে।

মোরানও রয়ে গিয়েছেন অমৃতসরে। স্বর্ণমন্দিরকে নতুন করে রূপ দিতে ব্যস্ত মহারাজা রণজিৎ সিংহ। ধর্মপ্রাণ রাজা তিনি। তামার পাতে দশ মণেরও বেশি, এখনকার হিসেবে চারশ কে জি সোনা মিশিয়ে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে গম্বুজটি। মন্দিরের সংস্কারও হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষটি বিলাসিতায় ডুবে থাকলেও কর্তব্য ভোলেন না। যুদ্ধ ও প্রজাপালন দুই-ই যেন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তেমনই নিয়মবাঁধা তাঁর দিনের কাজকর্ম। এরই ফাঁকফোকর দিয়ে মোরান যেন তাঁর মনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মোরান যেখানে বাসা বেঁধেছেন, রণজিৎ সেখানে মাঝে মাঝে যান। খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন মোরান। অবিশ্রাম নাচ আর সুরার নেশায় রণজিতের সময়টা কোথা দিয়ে যে কেটে যায়, তিনি বুঝতেও পারেন না। বলেন, 'মোরান, তোমার মধ্যে জাদু আছে। তোমাকে যখন দেখতে পাই না তখনও আমি তোমার কথা ভাবি।'

মোরান বলেন, 'আমি তো দিন রাতের সব সময়েই আপনার কথা ভাবি।'

রণজিৎ জানেন, এ কথা সব নর্তকীরাই বলে, বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষক যদি রাজা

হন তবু মোরানের কথা অবিশ্বাস করতে পারেন না। মনে হয় মোরান তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে, নিজের বুকের মধ্যেও খুঁজে পান নতুন অনুভূতি।

মাঝে মাঝের বদলে এবার রণজিৎ প্রতিরাতেই মোরানের সান্ধ্য অতিথি। এক আশ্চর্য প্রাণের হিল্লোল বয়ে যায় মোরানকে ঘিরে। ময়ূরের মতোই নেচে ওঠেন বাগানে ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির ছন্দ মিলিয়ে। ফোয়ারার জলের মধ্যে। ঘরে বসে নয়, মোরান রাজাকে শেখালেন ভালোবাসতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে। হেসে বলেন, 'দুনিয়ার কোন প্রাণী ঘরের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে? আমি সারা জগতের সামনে আপনাকে ভালোবাসতে চাই।'

'সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে?'

'আমি কি ভাবছি জান?'

'না বললে জানব কি করে?'

'আমি তোমাকে একেবারে নিজের করে পেতে চাই।'

'পেয়েছেনই তো। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা? বলেছি না পাখি স্বেচ্ছায় আপনার পিঁজরায় এসে ঢুকেছে।'

রণজিৎ হেসে বললেন, 'সেইটাই পাকাপোক্ত করতে চাই। তোমাকে আমার জেনানায় বন্দি করে রাখব। বিয়ে করে নিয়ে যাব তোমায়। সকলের সামনে।'

সব চঞ্চলতা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। মোরান অবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নিজের কানে শুনছেন তো? মহারাজা বলছেন এ কথা?

অনেকক্ষণ পরে এক চিলতে দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল মোরানের মুখে। বললেন, 'তা তো হতে পারে না মহারাজ।'

'কেন?' রণজিৎ সিংহ বিস্মিত হন।

'আমি যে মুসলমান আর আপনি ধর্মপ্রাণ...'

'শিখ', মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রণজিৎ বলেন, 'তাতে কি হল? শিখদের তো মুসলমানকে বিয়ে করতে বাধা নেই।'

মুখে আগের রং ফিরে আসে মোরানের। ধর্মাধর্ম নিয়ে বিবাদে তাঁর বড় ভয়। ধর্মে তাঁর আসক্তি নেই। কোন শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়েছেন মনেও নেই। পথে পথে যে ঘুরে বেড়ায় তার আবার জাত-ধর্ম। কিন্তু রাজার বেলা তো সে কথা খাটে না। সবাই বলে তিনি ধার্মিক। রানি হবার শখ নেই মোরানের। রণজিৎকে পেতে চান কাছে। পেয়েছেনও। রণজিতের কজন রানি এভাবে পেয়েছেন? হেসে বললেন, 'আমি জেনানায় গিয়ে ঘোমটা টেনে ঘরবন্দি হতে পারব না। তার চেয়ে এই বেশ আছি। সকাল-সন্ধ্যায় আপনার দেখা পাচ্ছি।'

'সন্ধ্যায় না হয় হল, সকালে তুমি আমার দেখা পেলে কবে?'

'সকালে আপনি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে পথে বেরোন, আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখি যে, আপনি কি জানেন, তখন আপনাকে কী সুন্দর দেখায়?'

রণজিৎ হেসে ফেললেন। সবার সঙ্গে তিনি নিজেও ভালো করে জানেন তিনি অতি

সাধারণ দেখতে। তাঁর রূপহীনতাকে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারেননি প্রথম স্ত্রী মহ্‌তাব কাউর। এই মোরানই একদিন তাঁর রূপ নিয়ে উপহাস করেছিল জলসায়, সকলের সামনে। বললেন, 'দারুণ খবর শোনালে তুমি।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি। ঘোড়ার পিঠে আপনাকে মানায়।'

রণজিতের মন রাখার জন্য কথাটা নয়, ঘোড়ার প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল রণজিতের। ঘোড়ার পিঠে চাপলে তাঁর শরীরের যাবতীয় ত্রুটি যেন ঢাকা পড়ে যেত। প্রতিদিন সকালে এক চক্কর ঘোড়ায় চেপে ঘুরে আসা ছিল রণজিতের প্রিয় ব্যায়াম।

সেদিন কথাটা চাপা পড়ে গেলেও রণজিৎ সেটা চাপা পড়তে দিলেন না। মোরান তাঁকে পাগল করে দিয়েছেন। প্রতিদিন এই নাচের মেহ্‌ফিলে একটু একটু করে পাওয়ায় মন ওঠে না তাঁর। আবার বললেন, 'আমি তোমাকে রানি করে নিয়ে যাব মোরান।'

'কেন মহারাজ?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না যে।'

মোরান হেসে হেসে কুরনিশ করেন, 'বাঁদির পরম ভাগ্য। কোনদিন রানি হতে পারব সে তো স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে তবু আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয় বল তো?' কৌতূহল প্রকাশ করেন রণজিৎ।

'লোকে আপনার নিন্দে করবে।'

'পাগল তুমি। প্রজারা আমাকে ভালোবাসে। আমিও তাদের সুখদুঃখের খবর রাখি। তারা সুখে আছে।'

রণজিৎ রাজা হলেও মোরানের চেয়ে তাঁর প্রজাদের কমই চিনতেন। একটু একটু করে তাদের মনে যে ক্ষোভ জমছিল সে কথা তাঁর জানাই ছিল না। মোরানের প্রতি তাঁর আসক্তি ইতিমধ্যেই প্রজাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন গুজব বা গুঞ্জনকে কানে তোলার মানুষ তিনি নন। যে কাজটা সূর্য ওঠার আগে ভেবে রাখেন সেটা সূর্যাস্তের আগেই শেষ করেন।

রণজিৎ সিংহের জেনানায় পাকাপাকিভাবে আশ্রয় পেলেন মোরান। তিনি মহারাজা রণজিৎ সিংহের তৃতীয় রানি, যেহেতু মুসলমান তাই তিনি পরিচিত হন বিবি মোরান নামে। বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়নি কারও কাছে, বিয়ে অবশ্য হয়েছিল সাধারণের চোখের আড়ালে। হয়ত সেজন্যই ইংরেজদের বর্ণনায় মোরান বিবি রক্ষিতা রূপেই পরিচিত। চার্লস মেটকাফে এসেছিলেন রণজিতের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য। ১৮০৮ সালে তিনি দেখা করেন মহারাণার সঙ্গে। আলোচনা করছিলেন চুক্তি সম্পর্কে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। শতদ্রুর পূর্বদিকে রণজিৎ রাজ্যবিস্তার করতে পারবেন না, প্রতিদানে কোম্পানি হাত বাড়াবেন না রণজিতের রাজ্যের দিকে। উপরন্তু বন্ধু হয়ে তাঁর পাশে থাকবে ইংরেজ। সম্মত হয়েছিলেন রণজিৎ। এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল অমৃতসরে ১৮০৯ সালে, ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তার মেয়াদ। মেটকাফে লক্ষ করেছিলেন মহারাজার অমৃতসরে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ততা। বলছিলেন, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে ফিরতে হবে।'

'মহারাজের কি জরুরি কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেল?'

'কাজ? ওঃ না কাজ নয়, তার চেয়েও জরুরি। মোরানবিবিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।' হেসে উত্তর দিয়ে উঠে পড়েছিলেন রণজিৎ।

মেটকাফে যা বোঝার বুঝলেন। ধরেই নিলেন রণজিৎ সিংহের উদগ্র বাসনা দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রিয়তমা সঙ্গিনী মোরানের জন্য।

বাস্তবিকই রণজিৎ মোরানকে না দেখে থাকতে পারতেন না। দীর্ঘ অদর্শনের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে মোরানও বেরিয়ে পড়তেন মহারাজার সঙ্গে। অন্য রানিদের মতো পর্দানশিন তিনি হতে পারেননি। হলেই বা রানি, এতদিন তো পথে পথেই কেটেছে। অনেকের চোখেই অবজ্ঞা ফুটে উঠত। মান-সম্মান কিছুই আর যেন রইল না। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে রণজিৎ সামান্যা মেয়েটিকে বসালেন একেবারে নিজের পাশে। তাও হোলির দিন। পঞ্জাবে হোলি মহোৎসব। আড়ম্বরপ্রিয় রণজিৎ মেতে উঠতেন হোলির দিন। তিরিশ চল্লিশটি সুন্দরী তরুণী তাঁকে ঘিরে থাকত, আবির-গুলালে রাঙিয়ে দিত সবাইকে। মোরান হিন্দু না হয়েও অনায়াসে যোগ দিতে পারতেন এদের সঙ্গে। তাঁর ভালোই লাগত রঙ খেলা। সব শেষে হাতির পিঠে রণজিতের সঙ্গে উঠে বসতেন মোরান, তাতে রঙে-রসে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠত রণজিতের। লক্ষ করতেন না প্রজাদের চোখে খুশির বদলে বিরক্তি ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

ধর্মের ব্যাপারে আশ্চর্য উদারতা ছিল রণজিতের। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—তিন ধর্মকেই যথেষ্ট সম্মান দিতেন। কোন রানিকেই তাঁর নিজের ধর্ম ত্যাগ করে শিখ হতে বলেননি। মোরানকেও ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। অথচ রাজার সঙ্গে হরিদ্বার গিয়েছেন সানন্দে। রণজিৎ যখন তীর্থযাত্রার কথা জানালেন, বিষণ্ণ মোরান শুধু বলেছিলেন, 'অত দূরে তীর্থ করতে যাবেন আপনি। আমি এখানে বসে থেকে কি করব?'

অম্লান মুখে রণজিৎ বলেছিলেন, 'তুমি থাকবে কেন? তুমিও যাবে।'

'সেখানে কি করে যাব? সে তো হিন্দুদের তীর্থস্থান। আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?'

'দেবে না কেন? হরিদ্বারে কি অন্যজাতের কেউ যায় না? আমিও তো হিন্দু নই, শিখ। আমাকে ঢুকতে দেবে না?'

'আপনি যে রাজা।'

'আর তুমি হচ্ছ রানি।'

হার মানলেন মোরান। রাজা বললেন, 'তোমাকে না দেখলে আমি একটা দিনও যে থাকতে পারি না।

'আমিই কি পারি?' সুখের আবেগে জড়িয়ে, দুচোখে মাদকতা মিশিয়ে মোরান বলেন, 'লোকে আপনার নিন্দে করবে যে।'

'নিন্দে করুক, প্রশংসা করুক আমার কিছু যায় আসে না।'

মোরানকে নিয়েই রণজিৎ ঘুরে এলেন হরিদ্বার। মোরান বললেন, 'পবিত্র কাবা দর্শন করতে যাবেন না মহারাজ?' রণজিৎ বললেন, 'নিশ্চয় যাব।' ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। সত্যিই নাকি মক্কায় গিয়েছিলেন একবার, ঐতিহাসিক প্রমাণ

বিশেষ নেই। মন্দির-মসজিদ ও গুরুদ্বারা সবই তাঁকে সমানভাবে টানত। ব্যাপারটা ক্রমেই খারাপ লাগছিল শিখদের। মুঘল সম্রাটেরা তাঁদের গুরুদের ওপর কম অত্যাচার করেননি। শিখ হয়ে রণজিৎ কথাটা ভুলে গিয়েছেন কি করে? তবে কি এ সবই সেই মায়াবিনী যবনীর ইঙ্গিতে হচ্ছে? ইতিমধ্যে আরও একটা ঘটনায় তাঁরা শঙ্কিত হলেন। রণজিতের নতুন মুদ্রা বেরোল। সিক্কা। সবাই দেখলেন তাতে রয়েছে একটি পেখম তোলা ময়ূরের ছবি। মোরানকে একেবারে চমকে দিতে চেয়েছিলেন রণজিৎ, তাই কাউকে কিছু না বলে গোপন নির্দেশ দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন মুদ্রাটি। বাজারে এ মুদ্রার নাম হয়েছিল আরশিওয়ালা সিক্কা।

সেদিনও ময়ূরী নৃত্য করেছিলেন মোরান। অপরূপ দেহভঙ্গির প্রতি বিভঙ্গে যেন খুশি উপচে পড়ছিল। নাচ শেষ হলে রণজিৎ তাঁকে উপহার দিলেন আরশিওয়ালা সিক্কা, তাতে নৃত্যরত ময়ূর, বলেন, 'মোরান, সকলের সামনে ভালোবাসতে চেয়েছিলে তাই সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম আমার প্রেমের স্বীকৃতি। আমার মোরানকে সবাই চিনবে। জানবে আমি তোমার কত ভালোবাসি।'

প্রেমের ধর্মই নিজেকে প্রকাশ করা। রণজিতেরও তাই হল। বিবি মোরানকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু সে কথা কি শুধু প্রিয়তমা মোরানই জানবেন? সংসারকে জানাতে হবে না? তাঁর মুদ্রায় রইল ময়ূর ছাপ, মোরানের প্রতীক হয়ে। দেশের মানুষের কাছে মোরান বুঝি আরও অপ্রিয় হয়ে উঠলেন, ইন্ধন যোগাতে লাগলেন তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা। গোপনে। সন্তর্পণে। তাঁদের মনে হল, মোরানের প্রেমের ফাঁদ আর কিছু নয়, মরণফাঁদ। এ কেমন মোহিনী, যার মোহ কাটে না? বিবি মোরানের পুত্র নেই কিন্তু যদি কোনদিন তিনি মা হন, রাজা কি তাঁর ছেলেকেই সিংহাসনে বসাবেন না? আবার বিধর্মীরাজ?

এদিকে সুখের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে রণজিৎ আর এক কাণ্ড করে বসলেন। সেদিন স্থির করলেন, তাঁর আদরের ঘোড়া দুলুর পিঠে মোরানকেও সওয়ার করবেন। আনন্দে খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে উঠলেন মোরান। কী মজা! হাতির হাওদায় বসেছেন রাজার সঙ্গে, শিকারের সময় সঙ্গী হয়ে রাজার সঙ্গে তাঁবুতে থেকেছেন, হরিদ্বারে তীর্থভ্রমণেও গিয়েছেন কিন্তু রাজপথে রাজার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া? তরল আগুন কণ্ঠে ঢেলে মোরানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠলেন রণজিৎ, ঠিক এভাবেই তো জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু হাতির পিঠে চাপা আর দুলুর পিঠে চড়া তো এক কথা নয়। শিক্ষিত ঘোড়া প্রভুর ইঙ্গিতে উল্কার মতো ছুটতে শুরু করে। ভয়ে-বিস্ময়ে, হর্ষে-উল্লাসে চিৎকার করে উঠে রণজিৎকে জড়িয়ে ধরেন মোরান। প্রাণভয়ে আঁকড়ে ধরা। রণজিৎ উচ্চস্বরে হাসেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এমনি করে ধরে থাক আমায়। কোন ভয় নেই তোমার।' রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে যায় ঘোড়া। স্তম্ভিত হয়ে কাজকর্ম ফেলে পথের দুপাশের সবাই তাকিয়ে রইল তাঁদের দিকে। একে মুসলমান নর্তকী, তাকে বিয়ে করে জেনানায় নিয়ে গিয়েও শখ মেটেনি রাজার, রাজপথে সকলের চোখের সামনে লজ্জাহীন আশ্লেষমত্ত ভ্রমণ? শিখসমাজ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লোকাচারে যাই থাক না কেন, যবনী

তাঁদের কাছে ঘৃণার পাত্রী। তাছাড়া প্রকাশ্যে এ হেন আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ। ইন্ধন যোগাবার নেতারা তো ছিলেনই। প্রজারা রণজিতের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন স্বর্ণমন্দিরে।

বিচারে বসলেন পুরোহিতেরা। একাংশের মন তো অনেক দিন ধরেই তিক্ত হয়েছিল, বাকিরা প্রজাদের দাবিকেই বড় করে দেখতে চাইলেন। এঁদের সঙ্গে জনসমর্থন কতজনের ছিল, ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। বিচার বিবেচনার পর তাঁরা ঘোষণা করলেন, মহারাজা রণজিৎ সিংহকে 'তনখাইয়া' করা হল। রাজা হলেও এখন তিনি একা কেন না সমাজচ্যুত।

চমকে উঠলেন রণজিৎ সিংহ। কেন? কোন অপরাধ তো তিনি করেননি। আজও গ্রন্থসাহেবের অর্চনা করে তিনি দিন শুরু করেন। প্রজারা সুখে আছে। শত্রু দেশ আক্রমণ করেনি। ছুটে এলেন স্বর্ণমন্দিরে, যে আধুনিক মন্দিরের রূপকার তিনি, সেই মন্দিরে। জানতে চাইলেন, কেন তাঁকে তনখাইয়া করা হল? কী তাঁর অপরাধ? অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হোক একবার। হল। কৈফিয়ত তলব করা হল, কেন তিনি যবনীকে বিবাহ করেছেন?

রণজিৎ সিংহ বললেন, 'আমি রাজা। আমার রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই সমান, তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখি না। আমার কথায় ও কাজে সমতা রাখবার জন্যই আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে বিবাহ করেছি। কোন অন্যায় তো করিনি বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।' রাজার কূটকৌশলে পরাস্ত হয়েও মন্দিরের পুরোহিতেরা হার স্বীকার করলেন না। বললেন, 'আপনি রাজা বলেই আপনি প্রজাদের আদর্শ। অন্যায় করলে তারা উদাহরণ হিসাবে আপনাকে দেখাবে। আপনি অপরাধী এবং আপনাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

রণজিৎ সিংহ বললেন, 'বেশ শাস্তি দিন। আমি কথা দিলাম, মাথা পেতে নেব সেই শাস্তি।'

পুরোহিতেরা অনেক বিচার করে রায় দিলেন, স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গণে যে তেঁতুলগাছটা রয়েছে সেই গাছে রণজিৎকে বেঁধে রাখা হবে। পরদিন সকালে প্রথম যে দর্শক আসবে মন্দিরে, সে একশ ঘা চাবুক মারবে। রণজিৎ আগে থেকেই বাঁধা থাকবেন আর বাঁধা থাকবেন সাধারণ মানুষের পোশাক পরে। ফলে যে মারবে সে জানতে পারবে না, কাকে সে চাবুক মারছে। স্বর্ণমন্দিরে এমন শাস্তি অনেকেরই হত আর যে মারত, সে সামাজিক কর্তব্যপালন করছে মনে করে বেশ খুশি হয়েই কাজটা করত। সব সময়ে অবশ্য অজ্ঞাত ব্যক্তি অপরিচিতের হাতে মার খেত তা নয়। যে অভিযোগ করত সেই এসে চাবুক মারত। এ ক্ষেত্রে পুরোহিতেরা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। রণজিৎ সিংহ শুধু দেশের শাসক নন, অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন স্বর্ণমন্দিরের জন্য। উৎসবের সময় দুহাতে বিলিয়ে দেন অজস্র মুদ্রা দীন দুঃখীদের হাতে। রণজিৎ অবশ্য খুশিই হলেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ রাজা, একশ ঘা চাবুক খেলে যদি তাঁর আরোপিত পাপস্খলন হয় তো হোক। তিনি রাজি।

স্বর্ণমন্দির সংলগ্ন তেঁতুলগাছে রণজিৎকে শক্ত করে বাঁধা হল। গাছটি এখনও আছে। দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের জন্য 'তনখাইয়া' হওয়া রাজার বিচার নিজের চোখে

দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে। রণজিৎ প্রতীক্ষায় রইলেন। বুকে তাঁর মোরান বিবির জন্য অফুরান ভালোবাসা। মনে, কৌতূহল প্রজারা কি সত্যিই তাঁকে অপরাধী ভাবে? প্রথম যে ব্যক্তিটি মন্দিরে এল সে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাকে বলা হল, 'তনখাইয়া' লোকটিকে একশ ঘা চাবুক কষাতে। সে বিনা দ্বিধায় চাবুক তুলে নিল। এটা তার নৈতিক কর্তব্য। রণজিৎ তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে, নির্ভয়ে। তাঁর একটি চোখ দৃষ্টিহীন হলেও অন্যটি অন্তর্ভেদী। এই সামান্য লোকটি অন্য সময় হলে তাঁর মুখের দিকেও চাইতে সাহস পাবে না।

রণজিৎ যা ভাবুন না কেন, সাধারণ মানুষ অত বোকা হয় না। এই মানুষটি চাবুক হাতে নিয়ে কয়েক পা এগিয়েই বুঝতে পারল, যাকে সে চাবকাতে চলেছে সে একেবারে অন্যরকম। সে ভাবতে চেষ্টা করল, কে হতে পারে এই মানুষটি? কাকে সে চাবুক মারতে চলেছে? তার মনে পড়ল একটা ধর্মীয় মিছিলের কথা। এই মন্দির প্রাঙ্গণেই তো। আবার মনে পড়ল, সেদিন সে ছিল প্রার্থী আর...আর এই লোকটিই ছিল দাতার ভূমিকায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে চিনতে পারল মহারাজা রণজিৎ সিংহকে। চাবুক মারার জন্য হাত তুলেছিল সে, চমকে উঠে চাবুক ছুঁড়ে ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল সে। পারবে না। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে, তাদের দেশের রাজাকে সে চাবুক মারতে পারবে না। মৃদু হাসি ফুটে উঠল রণজিতের মুখেও। দেশের মানুষ তাহলে তাঁকে অপরাধী ভেবে শাস্তি দিতে এগিয়ে আসেননি। মুষ্টিমেয় মানুষের খেয়ালখুশিই দশের কথা হয়ে উঠেছে। অপমানে বিচারকদের মুখ কালো হয়ে উঠল। রণজিৎ বললেন, 'আমার প্রজা তো আমাকে চাবুক মারতে পারল না। এবার আপনাদের বিধান কি?'

আবার নতুন করে বিচার শুরু হল। রাজা যদি অপরাধ করেন তাহলে তিনি শাস্তি পাবেন না, তা কি হয়? শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। রণজিতের দুর্বলতা যদি প্রেম হয়, তাহলে ধর্ম তাঁর শক্তি। অবিচারের আশঙ্কা থাকলেও তিনি পুরোহিতদের সুবিচারের আশা নিয়ে বসে রইলেন। পুরোহিতরা রায় দিলেন, বিবি মোরানকে ত্যাগ করতে হবে চিরদিনের মতো। তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে পাঠানকোটে অর্থাৎ শতদ্রুর পূর্বপারে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি অনুসারে, যেখানে রণজিৎ যেতে পারবেন না, সেইখানে।

'সে কি?' চমকে ওঠেন রণজিৎ সিংহ, 'বিবি মোরান তো আপনাদের কাছে কোন অপরাধ করেনি। তাছাড়া সে আমার স্ত্রী। তাকে ত্যাগ করতে হবে কেন?'

রণজিৎ যতই যুক্তি দিন, পুরোহিতেরা আপন সিদ্ধান্তে অবিচল। এবার তাঁদের ভুল হয়নি, বিবি মোরানের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদই রণজিতের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। আর অপরাধ? প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র নিরপরাধিনী স্ত্রীকে বিসর্জন দেননি? ধন দৌলত যা খুশি তিনি বিবি মোরানকে দিন না, তাতে তো আপত্তি নেই, একজন রানির মতোই জীবন কাটান তিনি পাঠানকোটে। শুধু রণজিৎ তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারবেন না।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রণজিৎ। তাঁর আবেদন নিবেদন সবই অরণ্যে রোদনের মতো নিষ্ফল হল। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। আগেই তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন

যে শাস্তিই দেওয়া হোক তিনি মাথা পেতে নেবেন। কাজেই মেনে নিতে হল পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিধান। এর পরে কি হল? রণজিৎ কি করে মোরানকে এই দুঃসংবাদ দিলেন, কত অশ্রু বিসর্জন করে মোরান হারিয়ে গেলেন পঞ্জাবকেশরীর জীবন থেকে, কেউ জানে না। পাঠানকোটে রণজিৎ আর কোনদিন যাননি। যারা ভেবেছিল রণজিৎ যোদ্ধা শিখদের যূথবদ্ধ করে মারাঠা শক্তির মতো শিখদের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে মাতিয়ে তুলবেন তাঁদের হতাশ করে দিয়ে রণজিৎ বাকি জীবনটা কাটালেন বিলাসিতার মধ্যে। তাঁর জেনানা ভরে উঠল রানিদের নিয়ে। অমৃতসরের নর্তকী গুলবাহারকে বেশ ঘটা করে লোক দেখিয়ে বিয়ে করলেন, তারপর স্বর্ণমন্দিরে ক্ষমাপ্রার্থনাও করলেন। বেগম হয়েও গুলবাহার তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে শুরু করলেন। এলেন আরও কয়েকজন, জিন্দ কালান, তাবু, জিনৎ বিবি, গোবি—সকলেই রণজিতের মুসলমান রানি। এছাড়াও এলেন রানি জিন্দন, নর্দমা পরিষ্কার করার মতো সামান্য কাজ করতেন তাঁর বাবা মানা সিংহ, কিন্তু জিন্দ কাউরের নাচ তাঁকে প্রবেশাধিকার দিল অন্দরমহলে। দলীপ সিংহ এঁরই ছেলে, যিনি নিজেকে রণজিতের ছেচল্লিশজন পত্নীর একজনের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এত রানি এত লোক দেখানো আড়ম্বর, এ সবের পিছনে কি সত্যিই কোন কারণ ছিল না? উত্থানপর্বের সেই মানুষটাই যেন বদলে গেলেন। রণজিৎ সিংহ কোনদিনই সরাসরিভাবে শিখদের নিয়ে বিশাল রাজ্য সৃষ্টি করেননি, এবার হিন্দু-মুসলমান-শিখ নির্বিশেষে প্রজাদের সুখ দুঃখের শরিক হলেন। রাজধানী আগেই সরে গিয়েছিল লাহোরে। কোন কারণ ছাড়া স্বর্ণমন্দিরে আসাও ছেড়ে দিলেন তিনি। একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হওয়াও হয়ত এর একটা বড় কারণ। এই পরিস্থিতিতে সবাই যখন আশা করেছিল, চুক্তির মেয়াদ আর না বাড়িয়ে রণজিৎ ঝাঁপিয়ে পড়বেন শতদ্রুর পূর্বপারে, সমগ্র শিখশক্তিকে একত্র করে দিল্লিজয়ের স্বপ্ন দেখাবেন তখন রণজিৎ সেই পুরনো চুক্তির জের স্বীকার করে কেন যে আর পাঠানকোটের দিকে কোনদিনই এগোলেন না ইতিহাস তার উত্তর দিতে পারেনি। ভুলে যাওয়া বিবি মোরানের স্মৃতিই কি এর কারণ? মানুষ হারায়, প্রেম হারায় না। শতদ্রু আজও রণজিৎ সিংহ ও বিবি মোরানের কথা বলে। অনেক ঘটনার সাক্ষী তেঁতুল গাছটাও ঝিরঝিরে পাতা নেড়ে সেদিনের কথা মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে।
